মেয়েদের নিজস্ব পত্রিকা

সুকন্যা

১ – ১৫ জুলাই ১৯৮৫



কৃষ্ণাঙ্গ গায়ক
মাইকেল জ্যাকসন

ইতিহাসের পর্দায় নারী

মহাশ্বেতা দেবীর চোখে নারী



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ নিলয় হাজরা

স্ক্যান ঃ দেব কুমার দেব

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com


আমাদের কোচ বলেছেন
দম বাড়াবার জন্য পুষ্টি দরকার।
দুধ, মল্টেড বার্লি-এইসব। তাই উনি
রোজ প্র্যাকটিসের আগে নিজের
হাতে আমাদের হরলিক্‌স খাওয়ান।
হরলিক্‌স ঘন দুধ, মল্টেড বার্লি
আর সোনালী গমের দানার পুষ্টিগুণে
ভরা একটি সুস্বাদু পানীয়।
১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে,
পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি পরিবারে
পুষ্টি যুগিয়ে আসছে।
Horlicks
The Great Nourisher
নতুন যুগের
নতুন রূপে
পুষ্টি যোগাতে অদ্বিতীয়



উষা ঘরে আনে আশা ও ভালবাসার উপহার!

আপনার সুন্দর পরিবারে সকলকে আপন করে নিতে উষা সেলাই মেশিনের জুড়ি নেই। কারণ নামে, গুণে আর কাজে উষা মেশিনই ভারতের সেরা। তাই মনের মানুষকে মনের মত উপহার দিতে হলেই মনে আসে শুধু একটি নাম—উষা।

উষা

কেনা ভাল সবার ভাল

সুকন্যা

বর্ষ ২ সংখ্যা ২/১ – ১৫ জুলাই ১৯৮৫/১৬ – ৩০ আষাঢ় ১৩৯২

সম্পাদকীয়

'সুকন্যা'র বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যেসব সচেতন, আত্মস্থ পাঠক-পাঠিকা অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন, তাঁদের হিতৈষিতা আমাদের অভিভূত, আপ্লুত করেছে। কারণ, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, যুক্তিবোধ্য যে কোনো প্রকার মতামতকে আমরা সর্বাবস্থায় স্বাগত জানাই। মূল্যবান, সদভিপ্রায়সংগত পরামর্শ চলার গতিকে করে সুপরিণত এবং সুসম্পন্ন। একটি সমৃদ্ধ, সুসভ্য, বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভরশীল সমাজের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় তার সংবাদপত্র-পত্রিকা এবং সাহিত্যকৃতিতে। কারণ সাহিত্য ও সংবাদ হচ্ছে সমাজের দর্পণ। একটি জাতির চরিত্র গঠন করতে সংবাদপত্র, পত্রিকার ভূমিকা অপরিসীম। সমাজের সুস্থ, সুরুচিশোভন পরিমন্ডল তৈরি করার প্রধান দায়িত্বই এসে পড়ে গণমাধ্যমগুলির উপরে। সুতরাং এই মাধ্যমগুলি যদি তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্বসমূহ সঠিকভাবে পালন করতে না পারে তাহলে তারাও অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। সুখের কথা 'সুকন্যা' এই এক বছরে নিজ সংকল্পে স্থির থেকে পাঠকসাধারণকে একটি মনস্ক, অভিজাত, রুচিসম্পন্ন পত্রিকা উপহার দিতে সমর্থ হয়েছে। পাঠক-পাঠিকার বিভিন্ন দাবিকে এই পত্রিকা সব সময়েই গুরুত্ব দিয়ে একদিকে নিজেকে যেমন যোগ্যতম করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে তেমনি পাশাপাশি নতুন নতুন বিভাগ সংযোজন করে আরও আকর্ষণীয় হতে প্রয়াসী হয়েছে। আগামী কয়েকটি সংখ্যার মধ্যেই শুরু হচ্ছে আরো কিছু প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক বিভাগ। ওই বিভাগগুলির ব্যাপারে আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তরে প্রস্তুতি চলছে।

'সুকন্যা'র পাতায় পুরুষ লেখক প্রসঙ্গে বিভিন্ন পাঠিকা কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের জানাই যে, আমরা মেয়েদের আলাদা গোষ্ঠীভুক্ত করে পুরুষসমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে উৎসাহিত করতে চাই না। আমরা চাই এই পত্রিকায় মেয়েদের পাশাপাশি পুরুষেরাও লিখুন – তাঁরা এই পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন। কারণ ঘরে-বাইরে মেয়েদের যে সকল সমস্যা রয়েছে তা পুরুষদের জানা দরকার, সমাজের কোনো গভীর সমস্যাই একা পুরুষ বা নারীর পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়।

অনেক পাঠক-পাঠিকা দেরিতে পত্রিকা প্রকাশের জন্য উদ্বিগ্ন হচ্ছেন, ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। তাঁদের উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক, অসন্তোষ প্রকাশ যুক্তিপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে জানাই, কয়েকটি অনিবার্য কারণে পত্রিকা প্রকাশে দেরি হচ্ছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আপনারা সহানুভূতির সঙ্গে দেখবেন।

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ পরিচিতি : দেবযানী চ্যাটার্জি ॥ ফটো : নিমাই ঘোষ

সম্পাদিকা : গীতা চৌধুরী
শিল্প-উপদেষ্টা : নিতাই ঘোষ

প্রতি সংখ্যা তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা
বিমান মাশুল পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা, ভারতের অন্যান্য স্থানে ৪০ পয়সা

সম্পাদকীয় দপ্তর ও রেজিঃ অফিস : ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড
৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২
চিফ এগজিকিউটিভ, বিপণন, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ : সি. এইচ. বসু

দিল্লি অফিস : জোনাল ম্যানেজার, নর্দার্ন জোন : ওয়াই. এ. শেঠি
জনসংযোগ : শ্রীমতী গায়ত্রী রায়, সূর্যকিরণ বিল্ডিংস, ফ্ল্যাট ১২১২,
১৯ কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি ১১০০০১, ফোন : ৩৩১-৭০২৪

বোম্বাই প্রতিনিধি : ভি সত্যমূর্তি, ফ্ল্যাট নং ১, বিল্ডিং নং ৪, টুইংকল স্টার কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, ঘাটলা, চেম্বুর, বোম্বাই ৪০০০৭১
ফোন : ৫৫১ ৬২৬২, ৫৫১ ০৫৯২

মুসলিম মেয়েরা অনেক স্বাধীন নন

অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে ১৬ এপ্রিল সংখ্যা 'সুকন্যা' পড়লাম। 'মুসলিম মেয়েরা অনেক স্বাধীন' শীর্ষক শিরোনামটি দেখেই সংখ্যাটির প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গেল। তারপর সম্পাদকীয় মতামত পড়েই বুঝতে পারলাম, প্রবন্ধ লেখিকার বক্তব্য আপনারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে ফেলেছেন। প্রবন্ধের লেখিকা একটু বেশি মাত্রায় ইসলাম পছন্দ করেন এবং মুসলিম নারীদের মঙ্গলের চেয়ে ইসলামের মহিমা প্রচার করাই যে তাঁর কাম্য, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ তিনি নিজে একজন মুসলিম মেয়ে হয়েও কোরান হাদিসের নাগপাশে অবরুদ্ধ মুসলিম মেয়েদের মুক্তিসংগ্রামের শরিক হতে পারেননি। কোরান হাদিসে নারীদের পক্ষে অকল্যাণকর, অবমাননাকর ধারাগুলির বিরুদ্ধে তিনি টুঁ শব্দটি করেননি। বরং সেগুলিকে সুকৌশলে আড়ালে রেখে এমনভাবে প্রবন্ধটি পরিবেশন করেছেন, যা পড়ে স্বভাবতই মনে হয়, সত্য-সত্যই মুসলিম মেয়েরা স্বাধীন এবং তাঁদের কোনো সমস্যাই নেই। বস্তুত এই প্রবন্ধ ইসলামী আইনের নির্মম কশাঘাতে জর্জরিতা শাহনাজ শেখদের কাছে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত।

কেন আমি এরকম অভিযোগ করছি, তা একে একে আলোচনা করছি। তার আগে বলে রাখি, আমি একজন হিন্দু এবং একজন পুরুষ মানুষ। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আমি সবকিছু জেনে ফেলেছি এই দাবি করছি না। তবে এক খানা বাংলা কোরান পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তার থেকে কিছু কিছু জেনেছি।

সংক্ষিপ্তভাবে এটুকু বলা যেতে পারে, ইসলাম ধর্মে নারীকে মোটেই উচ্চে স্থান দেওয়া হয়নি। বরং বলা সংগত হবে, পৃথিবীতে আর কোনো ধর্মে এত নগ্নভাষায় নারীর অমর্যাদা করা হয়নি। পর্দা প্রথা, তালাক প্রথা, পুরুষের একাধিক বিবাহের অধিকার এসব সমস্যার কথা ছেড়ে দিলাম। আমি বিশ্বাস করি কোরান হাদিসের কিছু কিছু বাণীর বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের মুসলিম মেয়েরা একদিন রুখে দাঁড়াবেন। যেমন লেখিকা নারীর মর্যাদা এবং অধিকার সম্বন্ধে কোরানের একটি বাণী উল্লেখ করেছেন, 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের অঙ্গাবরণ এবং তোমরা তাদের অঙ্গাবরণ' [২ : ১৮৭]

আমি এর পাশাপাশি আর একটি বাণী তুলে ধরছি, 'নারীরা তোমাদেরই ক্ষেতের মত, তাহলে যাও তোমাদের ইচ্ছে মত তোমাদের ক্ষেতে (ভোগ দখল করতে)' [২ : ২২৩]

প্রবন্ধ-লেখিকার কাছে জিজ্ঞাসা করি, এটা কী ধরনের কথা হল? অঙ্গাবরণদের প্রতি এমন পাশবিক ব্যবহারের নির্দেশ কেন কোরানে দেওয়া হল? এই বাণী কি মেয়েদের সম্মান বৃদ্ধি করে? শস্যক্ষেত্রের সঙ্গে নারীদের তুলনা করা সাঙ্ঘাতিক অপমানকর নয় কি?

আর এক জায়গায় লেখিকা আল হাদিসের একটি বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চেয়েছেন, নারীকে মুসলিম ধর্মে কত উঁচুতে স্থান দেওয়া হয়েছিল, এটি তার প্রমাণ। আমি ওই বাণীটির পাশাপাশি এখানে আল কোরানের কয়েকটি বাণী তুলে ধরছি।

১। 'স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে যেসব অধিকার প্রয়োগ করা হয়, তারা ন্যায়সংগতভাবে অনুরূপ অধিকার ভোগ করবে, যদিও পুরুষদের মর্যাদা নারীদের উপরে থাকবে।' [২ : ২২৮]

২। 'নারীদের উপর পুরুষদের অধিকার আছে, কারণ আল্লাহ নারীদের চেয়ে পুরুষদের উন্নত করে তৈরি করেছেন এবং যেহেতু ওদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পুরুষরা নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে, ভাল স্ত্রীলোকেরা অনুগত হয়। তাদের গোপন অঙ্গগুলি তারা পাহারা দেয়, কারণ আল্লাহ সেগুলিকে পাহারা দিয়েছেন। যাদের কাছে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাদের ভর্ৎসনা কর এবং বিছানায় পাঠিয়ে দাও এবং তাদের প্রহার কর।' [সুরা ৪ : আয়াত ৩৪]

নীনা আতাহার এবং সম্পাদকীয় বক্তব্যের কাছে আমার প্রশ্ন, এসবের মানে কী? এই যে আল্লাহ নারীদের চেয়ে পুরুষদের উন্নত করে তৈরি করেছেন, এ কথাও আমাদের মেনে নিতে হবে? তাহলে আর নারীর মর্যাদা রইল কোথায়? এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, একজন পুরুষের সাক্ষীর সমান দুইজন নারী সাক্ষী – আল কোরানেই এরকম নির্দেশ আছে এবং শরিয়তী আইনশাসিত দেশগুলিতে এই নির্দেশ মেনে চলা হয়। কিন্তু এটা কি যুক্তিসংগত? একজন পুরুষের সমান দুইজন মেয়েমানুষ এটাও কি অঙ্গাবরণের নমুনা কিংবা নারীকে উঁচু স্থানে তুলে ধরার প্রমাণ?

কোরানের আরও বাণীর উল্লেখ করছি।

'যদি তোমার কোনো মেয়েমানুষ ব্যভিচার করে, তাহলে ওদের বিরুদ্ধে তোমার নিজের চারজন সাক্ষী ডাক; যদি ওরা তাদের অপরাধ সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে ওদের গৃহের মধ্যে বন্দী করে রাখ, যতদিন না মৃত্যু তাদের টেনে নেয়।' [সু-৪ : ১৫]

'যারা ধার্মিক প্রকৃতির তাদের অবশ্যই জয় হবে এবং তাঁদের জন্য থাকবে বাগান ও দ্রাক্ষাকুঞ্জ এবং উন্নত বক্ষ যুক্ত কুমারীরা থাকবে তাদের সঙ্গিনী রূপে, তাদের পাত্র থাকবে প্রকৃতই পরিপূর্ণ।' [সু : ৭৮; ৩১ – ৩৪]

কোরান-হাদিসের এইসব বাণী বিশ্লেষণ করলে বিশ্বাস করা যায় কি, মুসলিম মেয়েরা অনেক স্বাধীন? বিশ্বাস করা যায় কি পয়গম্বরের কথা – শুধু মুসলিম সমাজ নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীকেও সুস্থ ও সুখী হতে সাহায্য করবে?

অমলেন্দু বিশ্বাস
নন্দনপল্লী, বড়িশা , কলকাতা – ৮

।। ২ ।।

'মুসলিম মেয়েরা অনেক স্বাধীন' নিবন্ধে লেখিকা নীনা আতাহারের দাবি, মুসলিম ধর্মে নারীর অনেক বেশি অধিকার আছে যা অন্য ধর্মে নেই।

আল কোরানই যে পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন একথা একজন ধর্মপ্রাণা মুসলিম মহিলা হয়ে লেখিকা চেপে গেলেন কি করে? পবিত্র কোরান বলেন, 'পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লা তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তা শ্রেষ্ঠত্ব এ জন্য যে, পুরুষ (তাদের জন্য) ধন ব্যয় করে।' [৪ : ৩৪]

ইসলামের আইন অনুযায়ী একজন নারী একজন পুরুষের অর্ধেক মূল্য বা মর্যাদাসম্পন্না। ইসলামের আদালতে একজন পুরুষের সাক্ষ্য, দুই জন নারীর সাক্ষ্যের সমান। পাকিস্তান, ইরান ও সৌদি আরবের মত ইসলামিক রাষ্ট্রেও এই বিধি বিদ্যমান।

ক্রীতদাসীর মত সম্ভ্রান্ত স্ত্রীকে প্রহার নিষিদ্ধ হলেও স্ত্রীকে সংযতভাবে প্রহার করা কোরান তথা ইসলাম-স্বীকৃত। 'স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতা আশংকাকর, তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদেরকে সংযতভাবে প্রহার কর।' [৪ : ৩৪]

পুরুষদের জন্য কিছু ভোগের উপকরণ থাকার আশ্বাস দেওয়া হলেও, মুসলিম নারীরা বেহেশতে গেলে কি কি পাবেন তার কিন্তু কোনো আশ্বাস নেই আল কোরানে।

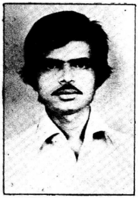
তিনবার 'তালাক' বলাটাকে লেখিকা 'ফর্মালিটি মাত্র' বলে দাবি করেছেন। কিন্তু এই ফর্মালিটির কৃপাতেই হাজার হাজার মুসলিম মেয়ের কপাল পোড়ে।

সাময়িক ভুল-বোঝাবুঝির জন্য স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীও যদি স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায় তথাপি সে তা পারে না, যদি না সে অপর একজনকে স্বামীত্বে বরণ করে এবং সেই স্বামী তাকে তালাক দেয়। [২ : ২৩০]

লেখিকার কাছে প্রশ্ন, অন্য ধর্মের নারীদের চাইতে মুসলিম নারীদের অধিকতর অধিকারের এই কি উদাহরণ?

লেখিকা কি জানেন যে, ইসলামে 'মুতা' বিবাহ নামে স্বল্পমেয়াদী বিবাহের বিধি আছে? অভিযোগ – এই প্রথার সুযোগ নিয়ে, তৈলসমৃদ্ধ আরবের ধনাঢ্য শেখেরা ভারতে এসে থাকাকালীন

আমরা মর্মাহিত



কিছু কিছু মৃত্যুঘটনা এতই আকস্মিক ও নৃশংস, যা আমাদের জীবনের সমস্ত মাধুর্য ও নিরাপত্তাবোধকে মুহূর্তে বিপন্ন করে দেয়। এমনই এক হানাদার মৃত্যুর হাতে ছিনতাই হয়ে গেছে আমাদের 'সুকন্যা' দপ্তরের সহকর্মী উত্তম চক্রবর্তীর জীবন। গত ১৬ জুন প্রায় মধ্যরাতে বিচিত্রানুষ্ঠান দেখে বাড়ি ফেরার পথে কে বা কারা এই যুবককে নৃশংসভাবে খুন করেছে। খুনের রহস্য এই প্রতিবেদন লেখার সময় পর্যন্ত অনুদ্‌ঘাটিতই আছে।

নিহত উত্তম চক্রবর্তী ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড-এ কর্মী হিসাবে যোগ দেন বছর চারেক আগে। পলতার পূর্বাচল পল্লীর বাসিন্দা ছিলেন তিনি। বৃদ্ধ বাবা, মা, ছোট বোন ও বেকার দাদা-বউদির সংসারে প্রয়াত চক্রবর্তী ছিলেন প্রধান আর্থিক অবলম্বন। সহকর্মীদের সঙ্গে বিনীত নম্র ব্যবহার ও সৌজন্যমূলক আচরণের জন্যে প্রয়াত উত্তম চক্রবর্তী এই প্রতিষ্ঠানের অনেকের মত 'সুকন্যা' দপ্তরের সবার প্রিয়ভাজন ছিলেন।

এই আকস্মিক নৃশংস মৃত্যুতে আমরা 'সুকন্যা' দপ্তরের সকল সহকর্মী গভীরভাবে মর্মাহিত। প্রয়াত উত্তম চক্রবর্তীর আত্মার শান্তি কামনা করি। পুলিশ-প্রশাসনের কাছে নিবেদন, তাঁরা যেন এই যুবকের মৃত্যুরহস্য উদ্‌ঘাটন করেন।

প্রতিবেদন : 'সুকন্যা' সম্পাদকীয় দপ্তরের পক্ষে

দরিদ্র মুসলিম পরিবারের কুমারী কন্যার কৌমার্য ভংগ করে, নিজেদের ভোগ-লালসা মিটিয়ে দেশে ফিরে যায় হতভাগিনী মেয়েটিকে এদেশেই ফেলে রেখে। এ কি নারীত্বের অবমাননা নয়?

লেখিকা মুসলিম নারীদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের উদাহরণ সীমাবদ্ধ রেখেছেন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের চৌহদ্দির মধ্যে। এখানকার জনৈকা মুসলিম মহিলা সিনেমা বা নাটকে অভিনয় করলেই প্রমাণিত হয় না যে, ইসলামে মেয়েরা পুরুষের সামনে অভিনয় করতে পারে কিংবা কোনো মুসলিম নায়িকার নাম করে এও প্রমাণ করা যায় না যে ইসলামে সংগীত নিষিদ্ধ নয়।

বর্তমান সময়ে ইসলামিক সমাজ-ব্যবস্থার নিখুঁত চিত্র দেখতে চাইলে দেখতে হবে ইরান ও সৌদি আরবের মত শরীয়ত-শাসিত ইসলামিক রাষ্ট্রে। আমাদের পাশের রাষ্ট্র পাকিস্তানও ক্রমশ সেই পথেই ধাবিত হচ্ছে।

পরিশেষে বলব, মুসলিম সমাজের বোবা-কান্নার আওয়াজ চার দেয়ালের গন্ডি পেরিয়ে আজও বাইরে আসতে পারেনি বলেই মুসলিম সমাজে নারীদের অধিকার অন্য ধর্মের নারীদের অধিকারের চাইতে উর্দ্ধে – এই কাকতালীয় যুক্তি মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বরং হিন্দু নারীরা বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বিবেকানন্দ, প্রণবানন্দের মত পুরুষ সংস্কারকদের পেয়েছেন নিজেদের অধিকার অর্জনের সংগী হিসাবে। কিন্তু মুসলিম নারীরা সেই সৌভাগ্য থেকেই বঞ্চিতা।

চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য

বিজয়গড়, কলকাতা – ৩২

লেখিকার বক্তব্য

শ্রীঅমলেন্দু বিশ্বাস ও শ্রীচিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য দুজনের বক্তব্য প্রায় একই। 'মুসলিম মেয়েরা অনেক স্বাধীন' প্রবন্ধটি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে কোরান ও হাদিস থেকে যতটুকু নেওয়ার, নিয়েছি। যে কোনো লেখকই এরকম করতেন; এটাই স্বাভাবিক। এবং যা যা লিখেছি তার কোনটাই আমার মনগড়া নয়।

কোরান শরীফের বিভিন্ন সূরা বিভিন্ন সময় অবতীর্ণ হয়েছে। কোরানকে বলা হয় আসমানী কিতাব। আল্লার এই বাণী ফেরেশতা (দেবদূত) জিব্রাইলের মাধ্যমে হযরত মুহম্মদের কাছে এসেছে। নানান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত সূরা নাজেল হয়েছে। তাই প্রতিটি সূরার পটভূমিকা দেখতে হবে আগে, তারপর তার বক্তব্য। এই প্রসংগে জানাই, এইসব ধর্মীয় গ্রন্থের বিচার যুক্তি-তর্ক দিয়ে করা যায় না। আমরা তো দেখেছি একজন প্রকৃত খুনী বা অন্য অপরাধী জাঁদরেল উকিলের যুক্তির বন্যায় নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে যায়। হিন্দু ধর্মবিলম্বীরা তো বলেই থাকেন – 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।' কোরান-এর শুরুতেই আছে – 'জা লিকাল কিতাবে লারাইবা ফি' – এই সেই গ্রন্থ এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সব ধর্মগ্রন্থ না পড়লেও যেগুলো পড়েছি (বাংলা অনুবাদ) তার প্রত্যেকটি নিয়েই অনেকরকম বিরুদ্ধ কথা বলা যায়। শুধু তাই নয়, যে-কোনো বিষয় নিয়েই বিরোধিতা করা যায়! আমরা মানুষেরা তো অনেককিছুই যুক্তি দিয়ে বিচার করতে যাই। কিন্তু বিশ্বাস সব কিছুর উর্দ্ধে; বিশ্বাসের বিরোধিতা হলে তা আর বিশ্বাস কেন!

এই ধর্মগ্রন্থগুলোর ভুল ব্যাখ্যাও অনেক সুবিধাবাদী অবশ্য করেছেন। নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন অর্থ ঘুরিয়ে, এমন উদাহরণও অনেক দেওয়া যায়। আমার প্রবন্ধে বলেছি, স্বাধীনতা আছে কিন্তু কতটা প্রয়োগ হয় – সেটাই আসল কথা। যেমন, একটা উদাহরণ দিচ্ছি। শরিয়তী বিধানে পণ নেওয়া ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। যিনি প্রকৃত মুসলমান তিনি কখনো এই দুষ্কর্ম করতে পারেন না। অথচ প্রকাশ্যে পণ নেন বহু মুসলমান। টাকার অঙ্ক আকাশছোঁয়া।

আল কোরানে শুধু নয়, প্রায় সব গ্রন্থই পুরুষকে নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। আমি তো কোথাও লিখিনি – নারী পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। বলেছি, নারীদেরও অনেক স্বাধীনতা আছে। আর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে বাধা দিচ্ছে কে! এতবড় ভারতবর্ষটার মাথার উপর তো ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ পুরুষ মেনে নিয়েছিলেন।

পরিশেষে পত্রলেখকদের কোরান শরীফ পাঠকে আমি প্রশংসা করি। আমার জ্ঞান খুব সীমিত, সে কথাও স্বীকার করছি।

নীনা আতাহার

কলকাতা – ২৩

ধর্ম ও নারী

শমীতা দাশ দাশগুপ্তর লেখা 'ধর্ম কি নারীর অধিকারের সীমা বেঁধে দিয়েছে?' (১ এপ্রিল সংখ্যায়) পড়লাম। লেখিকাকে ধন্যবাদ এই কারণে যে, তিনি এমন একটি বিষয়ের ওপর তাঁর সুচিন্তিত মতামত জানাতে পেরেছেন। ধর্মের দৃষ্টিতে নারীর পদমর্যাদা সত্যিই ক্ষুণ্ণ হয়েছে, পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম নারীর আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ দিলেও পুরুষের তুলনায় নারীর গৌরব কোনো অংশেই বাড়ে না – লেখিকার লেখা থেকেই একথা আমরা বুঝতে পারি। বর্তমান বিশ্বে নারী আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদেরও এ বিষয়ে ভেবে দেখতে হবে। তাহলে নারী আন্দোলন তার সার্থকতা খুঁজে পাবে।

গায়ত্রী কংসবণিক

কলকাতা-১৯

আপনার শুধু প্রয়োজন থাকে যেন চিন্তা-ভাবনা মুক্ত মন, আর পুষ্টিকর আহারের আয়োজন !



আজ্ঞে হ্যাঁ, বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর এইটিই হ'ল মূলমন্ত্র। যতদূর সম্ভব, মনে শান্তি রাখবেন—আর যা যা খেলে শরীরে বেশী রকম দুধ উৎপন্ন হয়, এমন সবরকম পদার্থ খাবেন।

ভাবনা-চিন্তা রাখুন দূরে

চিন্তা-ভাবনা শুধু আপনার জন্যেই নয়, আপনার ছোট্ট সোনাটির জন্যেও ক্ষতিকর হতে পারে। বেশী চিন্তা করলে আপনি অস্বস্তি বোধ করবেন—এমন কি আপনার দুধও শুকিয়ে যেতে পারে।

আপনার স্বাস্থ্য যদি ভাল না থাকে, তাহলে শুধু মন খারাপ ক'রে বসে থাকবেন না—আপনার ডাক্তারের কাছে যান আর তাঁকে আপনার সমস্যার কথা জানান। উনি নিশ্চয়ই আপনার সমস্যা সমাধান ক'রে দেবেন—কারণ উনি যে আপনার ডাক্তার, ওঁর ওপর আপনি সম্পূর্ণ ভরসা করতে পারেন।

পুষ্টিকর আহার খাওয়া সুরু ক'রে দিন

পুষ্টিকর আহার সম্বন্ধে জ্ঞান, কোনো বই পড়ে লাভ করা যায় না বা কোনো ক্যালরী চার্টও দেখতে হয় না। আপনাকে শুধু একটু সাধারণ বুদ্ধি খরচ করতে হবে। মনে করুন, আপনার বাচ্চার বুদ্ধি-বিকাশের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন দরকার। প্রোটিন হ'ল, শরীর গড়ে তোলার বস্তু—যা, দুধ, ডিম, আর মাংসতে থাকে। তখন আপনাকে এইসব প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবারই খেতে হবে। এইসব জিনিষ থেকে আপনি যত বেশী প্রোটিন প্রাপ্ত করবেন, আপনার বাচ্চাও আপনার দুধ থেকে অতখানি বেশী প্রোটিন পাবে।

তবে হ্যাঁ, একটা কথা সব সময় মনে রাখবেন। আপনার আহারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট যেন না থাকে। কারণ তাতে আপনার দুধের পরিমাণ ও গুণবত্তার ওপর প্রভাব পড়তে পারে। এইরকম সাবধানতা অবলম্বন আর সহজ-সরল উপায় দিয়েই আপনি আপনার বাচ্চাকে সঠিকভাবে স্তন্যপান করানোয় সাহায্য পাবেন। তবে হ্যাঁ, ভগবান না করুন, যদি কখনও আপনার শরীর বেশ গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে—তাহলে ঐরকম অবস্থায় বাচ্চাকে এমন দুধ দেওয়া উচিত যা মায়ের দুধের ঠিক পরেই ব'লে মানা হয়।

স্প্রে-ড্রায়েড আমূল স্প্রে

আমূল স্প্রে, পুষ্টির দিক দিয়ে এক সম্পূর্ণ সুষম আহার। কারণ এতে খুব উঁচুমানের প্রোটিন, সহজে হজম হয় এমন কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থ সুষম অনুপাতে আর নানান অবশ্যকীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সঠিকভাবে সম্মিলিত করা থাকে। এটি ফুটন্ত জলকে ঈষদুষ্ণ ক'রে নিয়ে তাতে গুললে, খুব সহজে গুলে যায়—আগে থেকে পেস্ট তৈরী ক'রে রাখার দরকার হয় না।

সাশ্রয়কারী

আমূল স্প্রে টিনে পাওয়া যায় এমন অন্য সমস্ত শিশু-আহারের মধ্যে সবচেয়ে সাশ্রয়কারী।

কারণ এটি হ'ল সেই আধুনিক দুগ্ধ-সমবায় সঙ্ঘের উৎপাদন, যারা এ দেশে "শ্বেত বিপ্লব"-এ অগ্রণী।

সাবধানতা

সব সময় মনে রাখবেন যে, বাচ্চার দুধের সমস্ত বাসনপত্র ও ফিডিং বোতল, স্বাস্থ্যপ্রদ উপায়ে পরিষ্কারভাবে ধুয়ে গরম জলে ফুটিয়ে নেওয়া উচিত আর তার আহারের জন্যেও ফুটন্ত জলই ব্যবহার করা উচিত।

বাচ্চার সঠিক পুষ্টির জন্যে, টিনে দেওয়া নির্দেশমাত্রার একেবারে অনুসারেই আহার তৈরী করবেন।

বিনামূল্যে ! আমূল-পুস্তক

এতে অত্যন্ত উপযোগী তথ্যে ভরা এই এই অধ্যায় আছে—গর্ভাবস্থা, প্রসবের পুর্বে দেখাশোনা, প্রসব, স্তন্যপান, অন্য আহার, শক্ত আহারে অভ্যস্ত করা, শিশুর নিত্যকর্ম, শিশুর উন্নতি, কয়েকটি সাধারণ ব্যাধির প্রতিকার, প্রাথমিক চিকিৎসা, শিশুর সাধারণ রোগ, শিশু বয়সে ভাবাত্মক সমস্যা, অসুস্থ শিশুর দেখাশোনা আর তার দিকে লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি। এই পুস্তক ইংরাজী, হিন্দী, মারাঠি, গুজরাটি, তামিল, তেলেগু ও মলয়ালম ভাষায় পাওয়া যায়। এর জন্যে আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ১ টাকা ২৫ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এখানে লিখুন: পোঃ বঃ ১০১২৪, বোম্বাই-৪০০০০১



আমূলস্প্রে

মায়ের দুধের ঠিক পরেই !

নির্মাতা: গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড, পোঃ বঃ ১০, আনন্দ ৩৮৮০০১, গুজরাত

ASP/AS-BEN7/83

‘পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের যথেষ্ট সচেতন হতে হয়’

মহাশ্বেতা দেবী



মহাশ্বেতা দেবী আজকের বাংলা সাহিত্যের আপসহীন পৌরুষ দীপ্তির শিরোনাম। বাংলা সাহিত্য যখন এক পেলব, কোমল, নতমুখ ক্লীবতায় বাঁজা ও বিবর্ণপ্রায়, তখন বিবেক ও বিদ্রোহের শক্তিমূল থেকে উৎসারিত হয়েছে তাঁর লেখনী - তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত পুরুষ লেখকেরা যখন চার দেওয়ালের আরাম ও সুনিশ্চিতিতে কলমচর্চা করছেন, মহাশ্বেতা দেবী তখন পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন সাঁওতাল, লোধা প্রমুখ অন্তেবাসী কখনো বা অরণ্যচারী মানুষদের ঘর থেকে ঘরে। বাংলা সাহিত্যকে রক্তাল্পতার আক্রমণ থেকে মুক্ত করে, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো তেজী নরনারীকে মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর লেখায়। এজন্যেই নিজের লেখা থেকে প্রিয় নারীচরিত্র নির্বাচন করতে হলে তিনি বেছে নেন, গণেশ মহিমার লছিমা, স্তন্যদায়িনীর যশোদা, হাজার চুরাশির মার নন্দিনী ও অপারেশন বসাই টুডু গল্পের দ্রৌপদীকে। সমকালের সমাজ তরঙ্গের প্রতিটি আঘাত তাঁর লেখায় স্পন্দিত হয়। পণপ্রথা, বধূহত্যা, ভোগমুখী জীবনবিলাসের আগ্রাসের বিরুদ্ধে মহাশ্বেতা দেবীর কলম ঐতিহ্য এবং প্রতিবাদের আত্মপ্রত্যয়ে গড়ে ওঠা অথবা ঠিক এই মুহূর্তে এদেশে নারীর ভূমিকা কোন গুরুত্বে আন্দোলিত হবে – এবারের শিল্পীর চোখে নারীতে তারই অনুপুঙ্খ আলোচনা।

‘মানুষের গড়ে ওঠার সময়টায় তার বাড়ির ভূমিকা থাকে অনেকখানি। আমাদের পরিবারে বাইরের দরজাটা খোলা থাকলেও আমাদের জীবন গড়ে উঠেছে পারিবারিক জীবনের মূল থেকেই। আমার সৌভাগ্য, মায়ের দিক এবং বাবার দিক – দু'দিক থেকেই আমি পেয়েছি বিশিষ্ট পারিবারিক পট, ভিন্নতর পারিবারিক পরিবেশ। সেই পরিবেশে নারীর বড় ভূমিকা ছিল।

‘আমাদের ঠাকুরমা ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালিনী নারী। বই পড়তেন খুব। তাঁর সবচেয়ে বড় ক্ষমতা যেটা আমার মনে হয়েছে সেটা হল বৈভবে বা অভাবে – সমস্ত অবস্থাতেই তিনি থাকতে পারতেন অবিচল। দুরকম দিনেই তাঁকে দেখেছি।

‘পৈতৃক বংশের উত্তরাধিকারে আমার সংস্কৃতিচেতনা। বড় পিসিমা তপতী দেবী অসামান্য গান করতেন। তাঁর গানের চর্চা আজও অটুট, এখন এই সাতাত্তর বছর বয়সেও। চুয়াত্তর বছর বয়স আমার মেজ পিসিমা সম্প্রীতি দেবীর। কারো কাছে না শিখে, নিজের চেষ্টায় তেলরঙ জলরঙ থেকে শুরু করে নানা মাধ্যমের চিত্র রচনায় তিনি দক্ষ শিল্পীর পরিচয় রেখেছেন। সেজ পিসিমা ব্রততী দেবী পন্ডিচেরিতে আর্ট হাউসের পরিচারিকা। আজও ভাল গান করেন আমার ছোট পিসিমা প্রতীতি দেবী। ছোট পিসিমা ঋত্বিকের যমজ।

‘আমার সাহিত্য ও স্বদেশচেতনার ঋণ আমার মাতৃকুলের নারীদের কাছে। দিদিমা ছিলেন প্রচুর পড়াশোনা করা স্বদেশচেতনা-সম্পন্না মহিলা। দাদামশাই ঢাকাতে ওকালতি করতেন। পয়সা ছিল না কিন্তু দিদিমাকে প্রকৃত স্বাধীনতা দেওয়ার মতো মনের প্রসার ছিল। দিদিমার যোগাযোগ ছিল ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের সঙ্গে। তাঁকে সাহায্য করতেন দিদিমা। দিদিমা তাঁর মেয়েদের স্কুলে পাঠাননি কিন্তু নিজে ইতিহাস-ভূগোলের পাঠ্যপুস্তক তৈরি করে তাদের পড়িয়েছেন। পাবনার নতুন কাকলি প্রেসের রাজেন লাহিড়ী কিংবা মোহিত মিত্রের পরিচিতি আমার কাছে মামার বাড়ির সূত্রেই। দিদিমার মুখেই শুনেছি বাঘাযতীন এবং অন্য বিপ্লবীদের কথা। ওঁর সেজ মেয়ে শকুন্তলা ঢাকায়

লীলানাথ এবং রেণু সেনের সহযোগিনী ছিলেন। তাঁরা 'নারী শিক্ষা', 'দীপালি' ও 'জয়শ্রী' পত্রিকার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। 'জয়শ্রী'তে আমার দিদিমা, মা, মাসিমার লেখা বেরিয়েছে। আমার দুই মাসি শকুন্তলা ও স্বপ্নময়ীর সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে খদ্দর বিক্রি করার কথা আমার আজও মনে আছে।'

মহাশ্বেতা দেবীর চোখে পারিবারিক নারী-চিত্রের কয়েকটি আঁচড়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রস্তুতিপর্বে ওইসব চরিত্রের ভূমিকা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ এবং আপসহীনতার যে অনড় লেখক-ব্যক্তিত্ব তাঁর রচনার প্রাণশক্তি – তার মূলেরও অনুসন্ধান পাওয়া যায় এর মধ্যে। জীবনের মধ্যে থেকে উঠে আসে ঔপন্যাসিকের যে জীবনদর্শন কিংবা জীবনবোধ – তার শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছে এই মাটিতে।

সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা এবং সর্বোপরি নির্লোভ, বিত্তবাসনা থেকে মুক্ত নারীরা তাঁর মানসভুবনের ভিত্তিভূমি অনেক গড়ে তুলেছে। ওইসব গুণরাজির সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ তাঁর মা ধরিত্রী দেবী। সাহিত্যানুরাগ, লেখা, দেশভ্রমণ, নানারকম লোক উৎসবের কথা, লোকগীতি শোনা, লোকগীতি শিল্পের মধ্যে নিজেকে নিয়ে যাওয়া, প্রবহমান জীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দীক্ষা তাঁর মার কাছ থেকেই পাওয়া। খুব সামান্য জিনিস নিয়ে আনন্দ করার শক্তিও ওইখান থেকে পাওয়া। এরই পাশাপাশি মানসিক বা শারীরিক যে-কোনো যন্ত্রণাকে সহ্য করার শিক্ষাও তিনি মার কাছ থেকে পেয়েছিলেন।

'পারিবারিক জীবনে দুদিক থেকেই আমি মেয়েদের খুব শ্রদ্ধা পেতে দেখেছি। আমার দিদিমা-ঠাকুরমা-মাসিমা-পিসিমারা ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ছোট করে দেখার কথা চিন্তাও করতে পারতেন না। পারিবারিক জীবনে নারীদের এই শ্রদ্ধার আসনটা নারীরাই অর্জন করে নিতেন। কবি অমিয় চক্রবর্তীর মা হলেন আমার মায়ের মামিমা, অনিন্দিতা দেবী। আমার দিদিমার সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধা-ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। অনিন্দিতা দেবী নারী-স্বাধীনতা নিয়ে লিখতেন। এঁদের দেখতে দেখতেই আমরা বড় হয়েছি। ছেলের বিয়ে দিয়ে যৌতুক নেওয়ার অশিক্ষা ও লোভ আমাদের নিকট বৃত্তে আমরা দেখিনি।'

দশ বছর বয়সে মহাশ্বেতা দেবী শান্তিনিকেতনে পড়তে গিয়েছিলেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ – এই বছরগুলিতে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার অনুশীলন, কঠোর নিয়মানুবর্তিতার চর্চা এবং তারই পাশাপাশি প্রকৃতিচেতনা তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় লাভ। এক-একদিন বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চলে যেতেন সাঁওতালদের গ্রামে। সাঁওতাল রমণীর ঘরে বসে মহানন্দে মুড়িটুড়ি খেতেন। তবে পরবর্তী জীবনে মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যে অস্ট্রিক রমণীরা যে ভূমিকায় এসেছে, ওদের দেখার সে দৃষ্টিকোণ তখনও গড়ে ওঠেনি।

'আমার পারিবারিক জীবনকে ঘিরে যে মহিলাদের প্রখর আত্মসম্মানবোধ ও নির্লোভ মানসিকতায় সমৃদ্ধ দেখেছি, আজকের সমাজেও তাঁরা যে নেই তা নয়, তাঁরা অবশ্যই আছেন। কিন্তু তাঁদের পাশাপাশি নৈতিক-মূল্যবিহীন, পার্থিব লোভকাতর, ভোগী আর একটা বড় স্রোত বইতে শুরু করেছিল উত্তর-স্বাধীনতা যুগে। শিক্ষিতা যোগ্য মেয়েকে পাত্রস্থ করার সময় মেয়ের মা-বাবা যখন অহেতুক দাবি মেনে নেন, তখন মেয়েকে ভালবেসেও সম্মানের ব্যাপারটা হারিয়ে ফেলেন। প্রাচীন মূল্যবোধ চলে গেছে, এখন হয়েছে টাকা দিয়ে মানুষকে বিচার করার মূল্যবোধ। এজন্য সুস্থ গণতান্ত্রিক আদর্শবাদকে ফিরিয়ে আনার আন্দোলনের দরকার।

'পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের যথেষ্ট সচেতন হতে হয়। শিক্ষিতা চাকরিজীবী নারীরা পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, অথচ তারা প্রতিবাদ করে না – এটা অত্যন্ত দুঃখের। বরং সমাজের নিচের স্তরে, যেখানে মেয়েটি নিজের ভাত নিজে যোগাড় করছে সেখানে তুলনামূলকভাবে সে বেশি সম্মান পাচ্ছে।

'আদিবাসী সমাজে পাত্রের আজও কন্যাকে পণ দেওয়াই নিয়ম। আদিবাসী দরিদ্র সমাজে দেখেছি মেয়েদের মর্যাদা অনেক। কিন্তু দুঃখের



মহাশ্বেতা দেবী

কথা, আমাদের সমাজের দরিদ্র স্তরে, বিশেষ করে তফসিলী সমাজে পাত্রপক্ষের যৌতুক বা পণ দাবি করার প্রবণতা এখন বেশি দেখা যাচ্ছে। খেতমজুরের ছেলেও বিয়ের সময় সাইকেল-রেডিও-ঘড়ি দাবি করছে।

'বিহার থেকে এসে টাকা দিয়ে গরীব ঘরের মেয়ে বিয়ে করছে বলে পাত্রপক্ষ সে-মেয়েকে অন্য জায়গায় বিক্রি করে দিচ্ছে – এটাও ঘটনা।

'চব্বিশ পরগনার কালীনগর বাওয়ালী থেকে খবর পেলাম একটি ছেলে 'পণ-টন কিছু চাই না, মেয়েকে যা দেবার দেবেন' বলে বিয়ে করেছে। দুদিন বাদে সব কেড়ে নিয়ে মেয়েকে ফেলে উধাও হয়েছে।

'এ সবকিছুর মূলে আছে মেয়েদের স্বাবলম্বিতার অভাব। স্বাধীনতার এত বছর পরেও সেই সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার পরিবর্তন হল না দেখে আশ্চর্য লাগে। এই সঙ্গে দেখছি প্রেমের বিয়ে হলেও মেয়ে তার বাবাকে বাধ্য করছে বিয়েতে সাধ্যাতিরিক্ত দেবার জন্যে। বাবা-মার প্রতি সহানুভূতির অভাব এতে প্রকট হয়ে ওঠে। এটা অবশ্যই সামাজিক সমস্যা।

'সেই শিক্ষা আজকের সমাজ দিতে পারছে না যাতে ছোটবেলা থেকেই মেয়েরা ভাবতে শেখে নিজেকে এমনভাবে গড়ব যাতে মানুষ আমায় শ্রদ্ধা করে এবং আমার সম্মান আমি আদায় করে নিতে পারব। দেশের প্রতিষ্ঠিত বাম-দক্ষিণ রাজনীতিতে সবাই দেউলে হয়ে পড়েছেন। আদর্শবিহীন এই লুটেপুটে খাওয়ার রাজনীতি সবরকম সুস্থ গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে গলা টিপে মেরেছে এবং মারছে। দেশের পরিপূর্ণ অবস্থার চিত্র দেশের যুবক-যুবতীদের কাছে নেই – দুই জেনারেশনের যুব সম্প্রদায় তা থেকে বিচ্ছিন্ন। আগে দুর্ভিক্ষে, বন্যায় বা যে-কোনো বিপর্যয়ে তরুণ-তরুণীদের যে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ঐতিহ্য ছিল – আজ সেই ঐতিহ্য থেকে তাদের দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই দুটি জেনারেশনের যুবশক্তিকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে ভোগমুখী অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস এটা 'পার্ট অব এ মাস্টার প্ল্যান'।

'শিশু শ্রমিক, পণপ্রথা, মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের শোষণ, রাজ্যে রাজ্যে মেয়েদের ব্রথেলে পাঠানোর ঢালাও ব্যবস্থা – এই মুহূর্তে মেয়েদের এই ছবিটাকে আড়াল করা মানে নিজের বিবেককেই আড়াল করা। আজ মফস্বলের মেয়েরাও 'ব্লু ফিল্ম' দেখতে আগ্রহ বোধ করছে। গোটা সমাজটাই যেন একটা 'ব্লু ফিল্মে' পরিণত হয়েছে। কয়েকটা চোরাই ভি. সি. আর ধরে এর কিছু করা যাবে না।

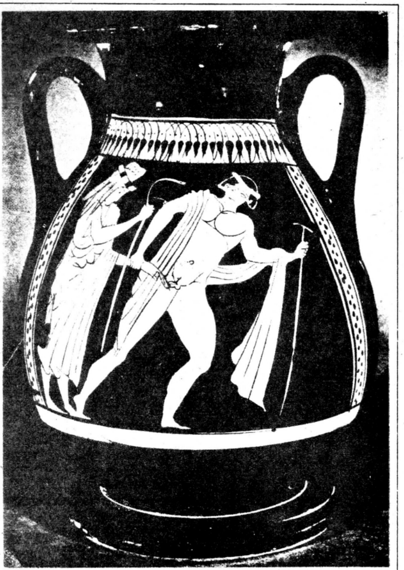
'কিন্তু মেয়েদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা হারাইনি। এই অবক্ষয় চিত্রের পাশাপাশি মানুষের মহৎ জীবনের জন্যে আর্তিও নিঃস্ব হয়ে যায়নি। যেটা দরকার সেটা হল, পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের অনেক বেশি মিলিট্যান্ট অরগানাইজেশন; ব্যাপক চেতনার সম্প্রসারণ।'

সাক্ষাৎকার ঃ সুনীল দাশ

ইতিহাসের পর্দায় নারী

শমীতা দাশ দাশগুপ্ত

সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন কোনো এক সময়ে মানব সভ্যতা মাতৃতান্ত্রিক ছিল। যদিও তার দৃষ্টিগ্রাহ্য ইতিহাস নেই। তবে লিখিত ইতিহাসের প্রথম দিকে মেয়েরা অনেক কিছু অধিকার ভোগ করতেন; মধ্যযুগে যার প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। রোমান, গ্রীসিয়ান, মিশরীয়, ইহুদী ও ভারতীয় সভ্যতায় লিখিত ইতিহাসের সময় থেকে মেয়েরা কোথায় কতটুকু মর্যাদা ও অধিকার পেত – তারই ধারাবাহিক আলোচনা এই নিবন্ধ। সেই সঙ্গে সেকালের সমাজ-কাঠামো, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মেয়েদের বিচরণকেও তুলে ধরা হয়েছে।


জনৈক গ্রীক যুবক কনের হাত ধরে ঘরে ফিরছে। ফুলদানির ওপর আঁকা (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক)

বর্তমান সমাজে নারীর পদমর্যাদা যে পুরুষের সমতুল্য নয়, একথা সকলেই প্রায় স্বীকার করেন। কৃত্রিম প্রজনন, সুপারসনিক জেট আর যাত্রীবাহী মহাকাশযানের যুগেও স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার দূর অস্ত। মধ্যযুগের অবহেলা আর নির্যাতন মেয়েরা অনেকাংশে পেছনে ফেলে এসেছে ঠিকই. কিন্তু পুরোপুরিভাবে পুরুষের সমকক্ষ তাদের এখনো ভাবা হয় না। পৃথিবীর প্রায় প্রতি সমাজেই মেয়েরা এখনো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বাস করছেন। দ্বৈতবিধান, বা পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে দুরকমের মূল্যবোধ, মেয়েদের অগ্রগতির পথে এখনো বিপত্তির সৃষ্টি করে চলেছে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব এখনো বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে নেওয়া হয়।

সমাজে মেয়েদের এই অবস্থা কি করে ঘটল, বা তার কারণ কি, সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। অনেকে মনে করেন এখন এই পরিস্থিতি হলে কী হবে, প্রাচীন যুগে নারী পুরুষের সমান সামাজিক অধিকার আর মর্যাদা ভোগ করত। বস্তুত অনেকেরই বিশ্বাস সমাজ তখন মাতৃতান্ত্রিক ছিল। নানা সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পদমর্যাদা মেয়েরা ধীরে ধীরে হারিয়েছেন। প্রাচীন যুগের সাম্য খুইয়ে মধ্যযুগে এসে নারী পেয়েছে শুধু নিপীড়ন আর লাঞ্ছনা। তারই রেশটুকু আমরা এখনো বয়ে বেড়াচ্ছি।

প্রাচীন যুগ বলতে ঠিক কোন যুগ বোঝায় সেটা অবশ্য বোঝা খুবই মুশকিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে কী হয়েছে, নারী ও পুরুষ তখন সত্যিই একই পদমর্যাদা ভোগ করত কিনা তা সঠিকভাবে জানা এখন আর সম্ভব নয়। এ বিষয়ে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণও কোথাও মজুত নেই। কিন্তু তার পরের অধ্যায়ে, অর্থাৎ লিখিত ইতিহাস আরম্ভ হওয়ার পর থেকে মেয়েদের সামাজিক ভূমিকা আর মর্যাদা কী ছিল তার কিছুটা ইঙ্গিত আমরা পাই। প্রাচীন গ্রীক, রোমান, ইহুদী আর ভারতীয় সভ্যতায় নারীর স্থান সম্পর্কে বিশদ না হলেও কিছু বিবরণ রয়েছে। অবশ্য বিবরণ বলতে বিশেষ প্রবন্ধ বা অন্য কোনো প্রমাণ বোঝায় না। কোনো দেশের ইতিহাসই ঠিক ওই বিষয়ে খুব বেশি লেখালেখি করেনি। বস্তুত নারীর ভূমিকা খুঁজতে গিয়ে ইতিহাসের দলিল-দস্তাবেজ খুলে আমরা পাই শুধু কৃতী মহিলাদের জীবনী আর কৃতিত্বের গল্প। এ থেকে সাধারণ, আটপৌরে নারী সমাজের অবস্থা কি ছিল তার ধারণা করা কঠিন। শুধুমাত্র সেই সময়ে লেখা গল্প, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি থেকেও একটা পূর্ণচিত্র গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এতে মুশকিল হল কোনটা কাল্পনিক আদর্শচিত্র আর কোনটা বাস্তব তা

অনেক সময় বোঝা যায় না। নারী ও পুরুষের পদমর্যাদা বা পারস্পরিক সম্পর্ক কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে দার্শনিক বা চিন্তাশীল লেখকদের মতের সংগে সমাজের সত্যিকারের ছবির খুব একটা সাদৃশ্য না থাকতেও পারে। তবে ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্পকলা, প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ, ইত্যাদি সবকিছু থেকে তথ্য সংগ্রহ করে একটি মোটামুটি নির্ভরযোগ্য খসড়া আমরা গড়ে তুলতে পারি। আজকের মেয়েদের অবস্থা আর পরিস্থিতি ভাল করে বুঝতে গেলে দরকার হল প্রাচীন নারীর সংগে পরিচিত হওয়া, তাকে বোঝা।

অনেক ঐতিহাসিকের বিশ্বাস গ্রীসের ক্রীট দ্বীপে গড়ে ওঠা প্রাচীন মিনোয়ান সভ্যতা মাতৃতান্ত্রিক ছিল। সেখানে নারীর স্বাধীনতা ছিল অপর্যাপ্ত। মেয়েরা পুরুষের পোশাক পরে খেলাধূলা, এমনকি তখনকার দিনের জনপ্রিয় খেলা লাফিয়ে ষাঁড় ডিঙোনোতে (bull-leaping) অংশগ্রহণ করত। ধর্মের ব্যাপারে সাধারণের মধ্যে দেবীদের জনপ্রিয়তা ছিল দেবতাদের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু মিনোয়ান সময়ে লেখা কোনো পুঁথি বা দলিল কোনদিন পাওয়া যায়নি। খুঁজে পাওয়া কিছু মাটির ভাঁড়, কলসি ও অন্যান্য পাত্রের ওপরে আঁকা ছবি থেকে এই ধারণার উৎপত্তি। তাই অবিসংবাদিতভাবে এই তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণ করা অসম্ভব। যে দুটি গ্রীক শহর-রাষ্ট্র সম্বন্ধে মোটামুটি তথ্য পাওয়া যায় সে দুটি হল স্পার্টা ও অ্যাথেন্স। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকের স্পার্টা ছিল একটি যুদ্ধপ্রিয় রাষ্ট্র। ফলে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা আর শরীরচর্চা প্রত্যেক পুরুষের জন্যে ছিল বাধ্যতামূলক। ওই সময়ে স্পার্টা সুপ্রজননবিদ্যায় উৎসাহিত হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্য প্রসারের জন্য নানাভাবে তারা ভাল যোদ্ধা গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছিল। সুঠাম সবল যোদ্ধার জন্যে তাদের দরকার ছিল স্বাস্থ্যবান পুরুষের। একই কারণে মেয়েদের শরীরচর্চাও সেখানে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। স্পার্টার প্রশাসনের ধারণা ছিল মা স্বাস্থ্যবতী হলে সন্তানও সুস্বাস্থ্য লাভ করবে। স্বাস্থ্যবান নারী ও পুরুষের মিলনের ফলে ভবিষ্যতের দুর্দান্ত স্পার্টান যোদ্ধার দল গড়ে উঠবে। স্পার্টার কল্পিত নায়িক পুরুষ, লাইসারগাসের মতে মেয়েদের কাজ হল কেবলমাত্র সন্তান প্রজনন। স্পার্টার জন্যে বীর যোদ্ধা প্রসব করা। অবশ্য শুধুমাত্র স্বাধীন রমণীদেরই এ কাজ সাজে। সংসার চালানোর নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ভার নেবে ক্রীতদাসীরা। তিরিশ বছর বয়স অবধি স্পার্টার পুরুষেরা ছেলেদের জন্যে তৈরি বিশেষ ব্যারাকে এক সংগে থাকত। এর কারণ অবশ্য মেয়েদের ঘর-গৃহস্থালির কাজ কমানো নয়। বিবাহিত পুরুষেরা স্ত্রীর সংগে সংসার করলে রাষ্ট্রের কাজে মনোযোগী হবে না, এই ভয়েই তাদের আলাদা করে রাখা হত। অর্থাৎ আশংকা ছিল যে নারীর মোহিনী মায়ার জালে

> **ডিমোস্থিনেস লিখেছেনঃ রক্ষিতা হল সুখের জন্যে, দাসীরা দৈনন্দিন জীবনে আদর-যত্ন যোগাবে; ধর্মপত্নী হল সংসারের প্রতিপালিকা আর আমাদের সন্তানের জন্মদাত্রী।**

পুরুষের কর্তব্যচ্যুতি ঘটাবে!

অ্যাথেন্সে নারীর অবস্থা ছিল প্রায় একই রকম। ডিমোস্থিনেস লিখেছেন ঃ 'রক্ষিতা হল সুখের জন্যে; দাসীরা দৈনন্দিন জীবনে আদর-যত্ন জোগাবে; ধর্মপত্নী হল সংসারের প্রতিপালিকা আর আমাদের সন্তানের জন্মদাত্রী। অ্যাথেন্সের সমাজে তখন অলংঘনীয় তিনটি শ্রেণীবিভাগ ছিল, ক্রীতদাস, অনাগরিক ও নাগরিক। মেয়েরা কখনই নাগরিকের পদ পেতে পারত না; অন্য দুটি পদের মধ্যেই তাদের সামাজিক স্থান ছিল। ফলে রাজনৈতিক আর আইনগত অধিকারহীন নারীকে সম্পূর্ণ রূপে পুরুষের অধীন জীবন যাপন করতে হত। এমনকি পুরুষ অভিভাবকেরা তখন পরিবারের মেয়েদের বিক্রি বা হত্যা করতেও পারতেন। সাধারণত পিতা এবং পিতৃসম্পর্কের নিকটতম পুরুষ আত্মীয় মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করত। পুরুষের অভিভাবকত্ব ছাড়া কোনো নারী বা শিশুর তখন সমাজে স্থান ছিল না। সম্পত্তি ভোগের ব্যাপারেও সামাজিক অধিকারহীন মেয়েদের পুরুষের মুখাপেক্ষী থাকতে হত। কোনো ভাই না থাকা সত্ত্বেও উত্তরাধিকারসূত্রে মেয়েরা সম্পত্তি লাভ করতে পারত না। তাই পুত্রসন্তান না থাকলে প্রথমা কন্যাকে বাবার দিকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সংগে বিয়ে দেওয়া হত। রাষ্ট্রের আইন অনুসারে এই বিবাহের ফলে জাত পুত্রসন্তান দাদুর সম্পত্তি লাভ এবং বংশরক্ষা দুই-ই করতে পারত।

অ্যাথেন্সের সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিয়ে করা। বিয়ে ছাড়া সমাজে অন্য কোনো গতি তাদের ছিল না। অভিভাবকের পক্ষে দায়িত্ব পূর্ণ করার একমাত্র উপায় ছিল যৌতুক গুছিয়ে কন্যার ভাল বিয়ে দেওয়া। স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা নারীকে অভিভাবক আবার পাত্রস্থ করতেন। প্রাচীন অ্যাথেন্সে একা একা জীবন যাপন করার অধিকার মেয়েদের ছিল না। তাই স্বামীর আশ্রয়হীন মেয়েদের বারবার বিয়ে দেওয়া হত, এ বিষয়ে তাদের মতামতের কোনো প্রয়োজন ছিল না। দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, নাটক, সাহিত্য ও শিল্পকলার আবাস প্রাচীন অ্যাথেন্সে পুরুষের জীবন ছিল উত্তেজনাময়, বৈচিত্র্যপূর্ণ। একই সমাজে থেকে মেয়েরা এর ন্যূনতম অংশও ভোগ করতে পারত না। বিবাহিত এবং কুমারী অবস্থায় তাদের দিন কাটত অন্দরমহলে, অসূর্যম্পশ্যা অবস্থায়। মোটামুটি অবস্থাপন্ন বাড়ির মেয়েরা এই কয়েদঘর থেকে নিষ্কৃতি পেত কোনো উৎসব বা আত্মীয়ের মৃত্যুসভার খাতিরে। তখনকার দিনের আঁকা ছবিতে মেয়েদের ত্বকের রঙ সাদা দেখান হত এই কারণেই। বদ্ধ কয়েকটি কামরায় থেকে থেকে তাদের গায়ের রঙ হালকা হয়ে যেত। গরিব মেয়েরা বাজারহাটে যেতে বাইরে যেত ঠিকই, তবে সংসারের কাজে ছাড়া অন্দরমহলের বাইরে যাওয়া সব মেয়েদের পক্ষেই নিষিদ্ধ ছিল। ভোজসভা বা অন্যান্য নিমন্ত্রণ উপলক্ষেও মেয়েরা উপস্থিত থাকতে পারত না। পরিবারে অধিক সংখ্যক শিশুকন্যা জন্মালে ভূমিষ্ঠ হবার সংগে সংগে এক রাতের জন্যে জংগলে বা পাহাড়ে তাদের রেখে আসা হত। বেঁচে থাকলে পরের দিন তাদের আবার বাড়িতে ফেরত আনা হত। শুধু কন্যা নয়, বিকলাংগ শিশুদেরও গ্রীসে এমনি করে মেরে ফেলা হত। সমাজের একদিকে নারীর ওপর যেমন কঠিন বিধিনিষেধ চাপান ছিল, অন্যদিকে বারবনিতাদের জনপ্রিয়তা ছিল প্রচুর। অনেক ক্ষেত্রে এই বারনারীরা খুবই শিক্ষিতা ও নানা শিল্পকলায় পারদর্শী ছিল। তখনকার দু-একজন প্রখ্যাত বুদ্ধিমতী বারাংগনার কথা বারবারই সাহিত্যে লেখা হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় আর প্রথম শতাব্দীর মাঝে মিশরীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে গ্রীসের মেয়েদের জীবনের কিছু কিছু উন্নতি হয়। মেয়েদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা গ্রহণ করা, সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী বা দায়িত্বশীলা নাগরিক হওয়ার পথে আইনত মিশরে কোনো বাধাই ছিল না। মিশরীয় মেয়েদের বিয়ের চুক্তিপত্রে বাবা এবং মা দুজনের নামেই লেখা থাকত, তবে পাত্রীর অমতে জোর করে তার বিয়ে দেওয়ার অধিকার কারোর ছিল না। দেবী আইসিসের পুজো প্রসারের সংগে সংগে মিশরের সমাজে মেয়েদের অভূতপূর্ব মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। বাণিজ্য সূত্রে মিশরের সংস্পর্শে এসে গ্রীসেও মেয়েদের বিধিনিষেধের ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন হয়। এর একটি

> **রাজনৈতিক আর আইনগত অধিকারহীন নারীকে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীন জীবন-যাপন করতে হত। এমনকি পুরুষ অভিভাবকেরা তখন পরিবারের মেয়েদের বিক্রি বা হত্যা করতেও পারতেন।**

নিদর্শন দেখা যায় গ্রীক সাহিত্যে। নারী-পুরুষের প্রেম, মান-অভিমান নিয়ে রোমান্টিক গল্প এ সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মেয়েদের কিছুটা সম্মান দিয়ে মনুষ্যপদের যোগ্য, অন্তত প্রেমের সংগী মনে না করলে এ ধরনের গল্প প্রচলিত হওয়া অসম্ভব।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর রোমে মেয়েদের অবস্হা ছিল প্রাচীন গ্রীসের মেয়েদেরই মত। তখন রোমে যৌথ পরিবারের প্রচলন ছিল। সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ হতেন পরিবারভুক্ত অন্য সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ইচ্ছে হলে দুচারজন বয়স্ক পুরুষের পরামর্শ তিনি চাইতেন ঠিকই, কিন্তু আসল ক্ষমতার

অ্যাথেন্সের সমাজে তখন অলঙ্ঘনীয় তিনটি শ্রেণী বিভাগ ছিল, ক্রীতদাস, অনাগরিক ও নাগরিক। মেয়েরা কখনই নাগরিকের পদ পেতে পারত না; অন্য দুটি পদের মধ্যেই তাদের সামাজিক স্হান ছিল।

অধিকারী ছিলেন একমাত্র তিনিই। যৌতুক-সহ সব কুমারী কন্যাদের পাত্রস্হ করার দায়িত্ব ছিল তাঁর, আবার দরকার হলে তাদের মৃত্যুদণ্ডও তিনি দিতে পারতেন। রাষ্ট্রীয় আইন প্রবর্তন হওয়ার সংগে সংগে পরিবারের কর্তার এই সর্বগ্রাসী ক্ষমতা কমে যেতে থাকে। খ্রিস্টাব্দ চতুর্থ শতক নাগাদ পরিবারের মেয়েদের আইনত তাড়িয়ে দেওয়ার বিক্রি বা হত্যা করার অধিকার তাঁর আর ছিল না। অবশ্য এই রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় পড়ত শুধু সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা। সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর মেয়েরা বা ক্রীতদাসীদের কথা বিশেষ কোথাও শোনা যায় না। খ্রিস্টাব্দ পঞ্চম শতকের শেষভাগে এসে সাধারণ মেয়েদের সুবিধার জন্যে কিছু কিছু আইন পাশ করা হয়েছিল, তবে ক্রীতদাসীরা কখনই কোনো অধিকার পায়নি।

দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে রোমে নারী আন্দোলনের একটি নজির পাওয়া যায়। বোধহয় এটিই পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নারী আন্দোলন। সেই সময় রোমে একটি আইন পাশ করা হয়েছিল যে কোনো মেয়ে ঘোড়া টানা রথে চড়তে, আধ আউন্সের বেশি সোনার গয়না বা নানা রঙের কাপড় পরতে পারবে না। এই আইনের বিরুদ্ধে রোমে মেয়েদের বিশাল গণবিক্ষোভ আরম্ভ হয়। দূর দূর গ্রাম থেকে এসে মেয়েরা মিছিলে যোগ দিত। সেই সময়কার ক্রুদ্ধ পুরুষের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা মার্কাস পরসিয়াস ক্যাটো



ফুলদানির ওপর আঁকা গ্রীক নর্তকী (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক)

আন্দোলনের দাবি মেনে নেওয়ার বিপক্ষে বলেন, 'পুরুষেরা যদি পরিবারের মধ্যে মেয়েদের এত স্বাধীনতা না দিত আজ তাহলে রোমের পথে পথে আমরা এই বিশৃংখলা দেখতাম না।..... নারী হল আগ্রাসী অদম্য জন্তু। তাদের রাশ ঢিলে করে দিয়ে আশা করা যায় না যে তারা লাথি মারবে না।....... মেয়েরা চায় পূর্ণ স্বাধীনতা, অর্থাৎ স্বৈরাচারের অধিকার। পুরুষের সমানাধিকার পেলে তাদের সংগে বাস করা অসহ্য হয়ে দাঁড়াবে। কারণ সমানাধিকার পাওয়ার পর তারা আমাদের কর্ত্রী হয়ে বসবে।'

ধীরে ধীরে রোমে মেয়েদের অধিকার বাড়তে থাকে। এর অন্যতম কারণ বোধহয় ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে দেশে পুরুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছিল। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন রোমে ছিল।

নিঃসন্তান অবস্হায় কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে স্বামীর ভাই, এমনকি পিতা সেই মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য ছিল। আইনত যেকোনো পুরুষই নিঃসন্তান স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য মহিলাকে বিয়ে করতে পারত।

গরিব ঘরের মেয়েরা স্কুলে আর ধনী মেয়েরা বাড়িতে শিক্ষা লাভ করত। তবে কৈশোরে পৌঁছবার সংগে সংগে বরপণ দিয়ে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত। আশা ছিল কমবয়সে স্বামীর ঘর করতে গেলে মানসিক ও শারীরিক ভাবে মেয়েরা সহজে স্বামীর বশবর্তী হবে। যৌতুক ও পণের মালিক হত ছেলেরা। কিন্তু পঞ্চম শতকের পর থেকে স্ত্রীর পৈতৃক সম্পত্তির মালিক স্বামী হতে পারত না। পিতা বা অন্য কোনো অভিভাবক সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এঁদের অবর্তমানে বয়স্ক মহিলারা স্বাধীন ভাবে সম্পত্তি লাভ করতেন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকার ফলে বিবাহবিচ্ছেদের সংখ্যা রোমে ধীরে ধীরে বেড়ে যায়। স্ত্রী বা স্বামী, যে কেউ বিচ্ছেদের অনুরোধ আনতে পারত। বিবাহবিচ্ছেদ অথবা বিধবা হবার পর আবার বিয়ে করতে মেয়েদের কোনো সামাজিক বাধা ছিল না। বেশ কিছু অর্থনৈতিক আর সামাজিক স্বাধীনতা থাকলেও রোমে মেয়েদের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। রাজনৈতিক পদ বা কোর্টে গিয়ে বিচার প্রার্থনা তারা করতে পারত না। ফলে স্বামীর লাঞ্ছনা বা নির্যাতন প্রতিরোধের একমাত্র আইনসংগত উপায় ছিল বিবাহবিচ্ছেদ। অপরাধী পুরুষকে শাস্তি দেওয়ার অন্য কোনো উপায় তখন মেয়েদের হাতে ছিল না।

প্রাচীন ইহুদী সভ্যতায় নারীর স্হান সম্পর্কে বিচার করতে গেলে সেই সমাজের দুটি

পরিবারে অধিক সংখ্যক শিশুকন্যা জন্মালে ভূমিষ্ঠ হবার সংগে সংগে এক রাতের জন্যে জংগলে বা পাহাড়ে তাদের রেখে আসা হত। বেঁচে থাকলে পরের দিন তাদের আবার বাড়িতে ফেরত আনা হত।

মূল নীতি সম্পর্কে না ভেবে উপায় নেই। প্রথমটি হল সম্পত্তি রক্ষা ও দ্বিতীয়টি ইহুদী জাতির প্রসার, এই দুই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল ইহুদী নারীর ভূমিকা। তাই সেখানে প্রচলিত ছিল কন্যাপণ প্রথা। নিঃসন্তান অবস্থায় কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে স্বামীর ভাই, এমনকি পিতা সেই মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য ছিল। আইনত যে কোনো পুরুষই নিঃসন্তান স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য মহিলাকে বিয়ে করতে পারত। নিঃসন্তান মহিলাদের সংসারে কোনো অধিকারই ছিল না। পুত্রসন্তানের অভাবে কন্যা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতে পারত ঠিকই কিন্তু পিতা ও স্বামী বর্তমান থাকতে সেই সম্পত্তি ভোগদখল করার তার কোনো অধিকার থাকত না। রুক্ষ মরুভূমির বাসিন্দা প্রাচীন ইহুদী সমাজে স্ত্রী পুরুষ সকলকেই বাঁচার তাগিদে পরিশ্রমী হতে হত। কোনো না কোনো উপায়ে শ্রমশিল্পে অংশগ্রহণ করা মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি ছিল। ফলে কর্মঠ আর সন্তান উৎপাদন করতে সক্ষম মেয়েদের চাহিদা ছিল খুব বেশি।

প্রাচীন ভারতে মেয়েদের পদমর্যাদা বা ভূমিকা কি ছিল সে সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ইংগিত নেই। শ্রুতি, স্মৃতি আর প্রাচীন দুই মহাকাব্য, রামায়ণ মহাভারত থেকে এ বিষয়ে একটা ধারণা আমরা করতে পারি। বৈদিক যুগের আদর্শে পুরুষ ও নারীর যে সমানাধিকার ছিল, এ হয়ত সত্যি। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে মেয়েদের অধিকার কমে আসে। এর একটি কারণ হয়ত আর্যদের মধ্যে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা। আর্যনারীর অভাবের দরুন আর্য পুরুষেরা দেশীয় অন্যান্য জাতির মেয়েদের বিয়ে করতে আরম্ভ করল। শ্রেণীভেদের জন্যে সব অনার্যদের মনে করা হত নিচুজাত। আর্যমেয়েরা যে অধিকার ভোগ করত অনার্য স্ত্রীদের সেই একই অধিকার দিতে আর্য পুরুষেরা রাজি হল না। ফলে ধীরে ধীরে সব মেয়েরাই অধিকারচ্যুত হল। বৈদিক যুগে একদিকে আর্য নারীরা যেমন সমাজে নানা অধিকার ভোগ করত, অনার্য মেয়ে এবং দাসীদের কোনো সামাজিক মর্যাদাই ছিল না। 'দাসীপুত্র' বলা খুবই অপমানজনক ছিল। মনে হয় দাসীর পুত্র বলা আর জারজ মনে করা একই ছিল। আর্য মেয়েরা অবিবাহিত থাকার যাগযজ্ঞ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত সহজেই নিতে পারত। যে বেদ বহুকাল থেকে ভারতীয় মেয়েদের পড়ার অধিকার নেই, সেই বেদেরই বহু শ্লোক মেয়েরা রচনা করেছে। সমাজে মেয়েদের গতিবিধি অবাধ ছিল। বৈদিক যুগে মেয়েদের বিয়ে হত যুবতী অবস্থায়। বাল্যবিবাহের প্রচলন হয়েছে অনেক পরে। এত স্বাধীনতা সত্ত্বেও তখনকার সমাজও যে পুরুষ শাসিত ছিল তা বোঝা যায় পুরুষের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন ও সমর্থন দেখে। মেয়েদের এই অধিকারটি ছিল না। স্বামী এবং স্ত্রী, দুজনেরই বিবাহবিচ্ছেদ করার অধিকার ছিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পুত্রসন্তান উপহার না দিতে পারার অপরাধে স্বামীরা আইনত স্ত্রী পরিত্যাগ করতে পারত। অবাধ্য স্ত্রীকে মারধোর করার অধিকারও তাদের ছিল। স্ত্রীর বেলায়



প্রাচীন মিশরের জনপ্রিয় দেবী আইসিস

বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার ছিল শুধু পরিত্যক্ত হবার পর, অথবা স্বামীর ব্যভিচার সহ্য না হলে। বিধবাবিবাহের চলনও তখন ছিল। স্বামীর সাথে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা চালু হয় এর পরে; মহাভারতের আমলে এর একটু ইংগিত আছে।

মহাভারতের সময়ে মেয়েদের সামাজিক অধিকার যে কতটা কম হয়ে গিয়েছিল তা বোঝা যায় এই মহাকাব্যের গল্পগুলো থেকে। জোর করে নারীহরণ, সে যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, নিশ্চয়ই সমর্থনের যোগ্য নয়। বলা বাহুল্য, মেয়েদের বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন সমান

নারী হল আগ্রাসী অদম্য জন্তু। তাদের রাশ ঢিলে করে দিয়ে আশা করা যায় না যে তারা লাথি মারবে না।.......

পদের মানুষ জ্ঞান করলে এ কাজ করা সম্ভব নয়। কুরু-পান্ডবের শ্রদ্ধেয় ঠাকুর্দা, ভীষ্ম এই কাজটা শুধু করেনই নি, এর জন্যে কোনো কটুকাটব্য তাঁকে বিশেষ শুনতে হয়েছে বলে মনে হয় না। মেয়েদের জীবনের প্রধান কাজ ছিল সন্তান, বিশেষ করে পুত্র প্রজনন। বারে বারে তাদের 'ক্ষেত্র', অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় জড় পদার্থের সাথে তুলনা করে তাদের হীন করা হয়েছে। রামায়ণেও অনার্য মেয়েদের ওপর অত্যাচারের নিদর্শন রয়েছে যথেষ্ট। তাড়কা, সূর্পনখা দুজনকেই আর্য পুরুষের হাতে নিগ্রহ আর অপমান সহ্য করতে হয়েছে। দুই মহাকাব্যেই নারী হরণ, হত্যা, অংগহানির প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। অবশ্য কাব্যের পৃথিবীর সংগে বাস্তবের হুবহু যোগাযোগ ছিল কি না কে জানে!

বৈদিক যুগে আর তার পরে মেয়েরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতে পারত একমাত্র ভাইয়ের অবর্তমানে। অবশ্য পিতা বা স্বামী বিশেষভাবে কোনো সম্পত্তি দান করলে তার স্বত্ব তাদেরই থাকত। অন্য যে কোনো ধন, স্ত্রীর উপার্জিত হলেও স্থান পেত স্বামীর তহবিলে। বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার থেকে মেয়েরা এবার শুধু বঞ্চিত হল না চতুর্থ শতাব্দীতে মনু বললেন :

'নীতিহীন, ব্যভিচারী, গুণহীন স্বামীকেও, সাধ্বী স্ত্রীর সর্বক্ষণ ঈশ্বররূপে পুজো করা উচিত।' (৫,১৫৩) ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সংগে সংগে অব্রাহ্মণ ও নারী সামাজিক অধিকার হারাতে আরম্ভ করল। নারীর নিজস্ব পরিচয় বা মূল্য কিছুই রইল না। তার সামাজিক পদের মূলে রইল স্বামীর পদমর্যাদা আর মাতৃত্ব। অবিবাহিতা অথবা সন্তানহীনা মেয়েরা সমাজের এক কোণে অনাদরে পড়ে রইল।

প্রাচীন গ্রীক, রোমান, ইহুদী আর ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থার সংগে আজকের নারী মিল খুঁজে পাবে অনায়াসে। বিভিন্ন দেশে গড়ে ওঠা এই বিশিষ্ট সভ্যতাগুলিতে মেয়েদের ভূমিকা আর মর্যাদার অনেকটা পার্থক্য থাকলেও পুরুষশাসনের মূলরূপ প্রায় সব জায়গাতেই এক। তবে একটি বিষয়ে পাশ্চাত্য আর প্রাচ্য আদর্শের তফাত খুবই প্রকট। পাশ্চাত্য চিন্তায় ভেবে নেওয়া হয় সহজাতভাবে নারী পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট. কিন্তু প্রাচ্য নারীর সহজাত হীনতায় কোনদিন বিশ্বাস করেনি। অবশ্য তার ফলে যে অবস্থার বিশেষ কিছু তারতম্য হয়েছে, তা নয়। পৃথিবীর দুই গোলার্ধের মেয়েরাই পুরুষশাসনের চাপে প্রাচীনকাল থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাহীন রয়েছে। মৌলিক চিন্তা প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের পুঁথিগত তফাত রেখেছে ঠিকই কিন্তু বাস্তবে তা অনুসরণ করতে পারেনি কোনদিন।

বিদেশ ও বিদেশিনী

‘ভারত আমার দ্বিতীয় মাতৃভূমি’

লীনা ফুজিতা

ভারতের কৃষ্টি, ঐতিহ্য, মানুষের ব্যবহার আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করে। আর বাঙালির আতিথেয়তা ও আপন করে কাছে টেনে নেওয়ার দুর্বার ক্ষমতা আমাকে মুগ্ধ করেছে বার বার। কথাগুলি দারুণ ভেজা ভেজা অনুভূতি নিয়ে বালিগঞ্জের এক সুসজ্জিত ফ্ল্যাটে বসে বলছিলেন নৃবিজ্ঞানী ডঃ লীনা মারিয়া ফুজিতা। ডঃ ফুজিতা আদতে ইথিওপিয়ার মেয়ে। মাত্র তিন বছর বয়সে বাবা-মায়ের সংগে চলে আসেন পাশের রাজ্য সুদানে। বাবা ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ইটালিয়ান। আর মা খাঁটি ইথিওপিয়ান। লীনা ছোটবেলার স্মৃতির সমুদ্রে ডুব দিয়ে বলতে লাগলেন, আমার মা বিধবা হলেন মাত্র ১৮ বছর বয়সে এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে। সেই দুর্দিনে আমার নিরক্ষর মার একমাত্র ধ্যান হল ছেলেমেয়েদের উপযুক্তভাবে মানুষ করে তোলা। যে মা টিপসই ছাড়া কিছু জানেন না, তাঁর কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধি প্রখর। টিপসই সম্বল করেই তিনি একটি বিশাল ব্যবসা পরিচালনা করেন। মা একদিন বলে বসলেন, ‘আমি যা পাইনি, তুমি তাই চেষ্টা করবে।’

তাই সুদানে আমার স্কুলের পড়া শেষ হলেই আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল আমেরিকায়। তখন আমার বয়স সতের কি আঠার। আমি ছোটবেলায় খেলতে ভীষণ ভালবাসতাম। পড়াশোনায় খুব একটা মন ছিল না। কিন্তু আমেরিকায় এসে অকূলসমুদ্রে পড়লাম। দেশ ছেড়ে এসেছি অথচ আমেরিকাও ভাল লাগছে না। এইরকম যখন অবস্থা তখন মনের অস্থিরতা বাগে আনতে মনটা ডুবিয়ে দিলাম সম্পূর্ণভাবে পড়াশোনাতেই। পরে বুঝেছি আমেরিকাই ছিল আমার পড়াশোনা ও কাজের উপযুক্ত স্থান। শিকাগোতে অর্থনীতি নিয়ে বি এ পাশ করি। ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষাও শিখি। বি এ পাশ করার পর হঠাৎ মনে হল অর্থনীতি ভীষণ ড্রাই বিষয়। আমি চাই মানুষ নিয়ে কাজ করতে। জানতে চাই বিভিন্ন দেশের মানুষের আচার-আচরণ, দুঃখ-কষ্ট। তাই চলে এলাম অর্থনীতি থেকে অ্যানথ্রোপলজিতে। অ্যানথ্রোপলজিতে এম এ করে মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি করেছি। গবেষণার বিষয় ছিল ‘বাংলার মেয়েদের ধর্ম, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান’।

● এইখান থেকেই আপনার ভারত-ভাবনার সূত্রপাত?

ডঃ লীনা : হ্যাঁ, গবেষণাপত্রের বিষয় স্থির করার পর থেকেই মনেপ্রাণে ভারতীয় ভাবধারাকে নিজের মনের মধ্যে আত্মস্থ করতে শুরু করলাম।

● কত বছরে আপনার এই ব্যাপক গবেষণার কাজ শেষ করতে পেরেছিলেন?

ডঃ লীনা : আমার গবেষণার কাজ শেষ করতে সময় লেগেছিল দশ বছর। ১৯৭৫ সালে পি এইচ ডি হবার পর ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যানথ্রোপলজি বিভাগের অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হই।

● গবেষণার জন্যে ফিল্ড-ওয়ার্ক করতে কবে প্রথম ভারতে আসেন?

ডঃ লীনা : গবেষণার কাজের জন্যে প্রথম ভারতে আসি ১৯৬৭ সালে। ছিলাম দু বছর। আবার ১৯৭১ সালে আসি এক বছরের জন্যে। গোটা ভারতবর্ষের সব রাজ্য ঘুরেছি। বাংলার বিষ্ণুপুরেই ফিল্ড-ওয়ার্ক করেছি কয়েক বছর থেকে।

● বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে আপনার কী ধারণা হয়েছে?

ডঃ লীনা : বাংলাকে আমার নিজের দেশ বলেই মনে হয়। বাঙালিদের আছে এক আশ্চর্য উদার ও ঐতিহ্যবাহী প্রাণ। যে-কোনো মহৎ কাজকে কদর দিতে জানে, যে-কোনো মানুষকে টানতে পারে একেবারে কাছে। আমি দীর্ঘ চার বছর বিষ্ণুপুরে ঘুরেছি। ওখানকার মানুষজন আমায় এমন গভীরভাবে সাহায্য করেছেন, যার জন্যেই গবেষণার কাজে আমার চাহিদা অনুযায়ী ফল পেয়েছি।

● এইবার যে কলকাতায় এসেছেন – এটা কত বছর পরে? কেন এসেছেন?

ডঃ লীনা : দীর্ঘ দশ বছর পর আবার ভারতে এসেছি। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি। কারণ এখন আমি দুটো জিনিস নিয়ে কাজ করছি। প্রথমত – তৃতীয় বিশ্ব, বিশেষ করে আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ও ভারতের কয়েকটি অপরিহার্য বিষয় নিয়ে গবেষণা করা। যেমন ইথিওপিয়ার সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষের কারণ ও তার প্রতিকার নিয়ে সেখানকার কৃষি, অর্থনীতি সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে ব্যাপক কাজ। দ্বিতীয়ত – কলকাতায় যেসব মহিলা সংগঠন রয়েছে তারা দুঃস্থ মেয়েদের পুনর্বাসনে কীভাবে সাহায্য করেন তা নিয়ে কাজ করা।

● একাধারে ভারত ও আফ্রিকায় কাজ করার জন্যে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না?

ডঃ লীনা : মোটেই না। এই অভিনব কাজের ধারা নিয়েছি বটে, কিন্তু এতে অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই হচ্ছে বেশি। এর ফলে তুলনামূলক পরিস্থিতিটা খুব সহজেই আমার সামনে ধরা পড়ছে। অবশ্য এর জন্যে আমায় আজ ভারত, কাল আফ্রিকা করতে হচ্ছে। আবার এরই মধ্যে আমেরিকাতেও যেতে হচ্ছে লেকচার ট্যুরে।

● আমেরিকার লেকচার ট্যুরের বিষয় কী ছিল?

ডঃ লীনা : গত মার্চ মাসে একই সংগে আমেরিকার পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার ট্যুর করেছি। তার সব কটির বিষয় ছিল



ডঃ লীনা ফুজিতা

ভারতের ইতিহাস, ভারতের সঙ্গে অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের সম্পর্ক ও ভারতীয় মেয়েদের বর্তমান অবস্থা।

● ভারতে কোথায় কোথায় বক্তৃতা করেছেন?

ডঃ লীনা ঃ গত বছরের জুলাই মাসে ভারতে এসেছি। এর মধ্যে অসংখ্য ছোট বড় জায়গায় আমি বলেছি। সবচেয়ে মজার কথা এখানকার মানুষ আমার কাছে জানতে চাইছে আফ্রিকার কথা। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্সের আমন্ত্রণে ইথিওপিয়ার দুর্ভিক্ষ ও পরিকল্পিত অর্থনীতির ওপরে ভাষণ দিয়ে এলাম। এছাড়া কলকাতার মহিলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানেও ইথিওপিয়ার কৃষি ও সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে বলেছি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার দেখছি আমেরিকা ভারত সম্বন্ধে জানতে চায়, ভারত আফ্রিকান দেশগুলিকে চিনতে চায়। সতিই এই জানতে চাওয়ার লক্ষণটাই গোটা দুনিয়ার মঙ্গলের পক্ষে অত্যন্ত শুভ।

● একজন নৃ-বিজ্ঞানী হিসেবে বর্তমান ভারত সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

ডঃ লীনা ঃ ভারত সম্বন্ধে আমি দারুণ আশাবাদী। ভারত কয়েক বছরের মধ্যে বিশেষ যেভাবে নিজের একটা সুদৃঢ় স্থান করে নিয়েছে তাতে মনে হয় আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ভারত সেলফ অ্যাটেনটিভ শক্তি হয়ে উঠবে। দুটি বৃহৎ শক্তির মধ্যে যে শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে সেই শূন্যতা ভরাতেই ভারত একটা বিশেষ স্থান পেয়ে যাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। ভারত ধনী দেশ নয়, তবু সে অন্যের জন্যে ভাবতে চায়, আদান-প্রদান করতে চায়। এই জন্যেই ভারত পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে ভিন্ন।

● ভারতের মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

ডঃ লীনা ঃ আমি আমেরিকার মেয়েদের দেখেছি। আমি আফ্রিকার মেয়েদের করুণ অবস্থার কথা জানি। আমি ইউরোপেও ঘুরেছি। কিন্তু ভারতের মেয়েদের দেখেছি অন্য চেহারা। তারা বহু ক্ষেত্রে নিরক্ষর হলেও অদ্ভুত ধরনের বুদ্ধিদীপ্ততায় ভরা। আর শিক্ষিত মেয়েদের মধ্যে দেখছি সেই বিষয়ে একটা প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড়াতে তারা ভীষণই পছন্দ করছে। সত্যি কথা বলতে কি পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে এটাই মনে হয়েছে মেয়েরা অনেক বেশি কাজের হয়ে উঠছে, ছেলেদের তুলনায়।

● ভারতীয় বিষয় নিয়ে কোনো বই প্রকাশিত হয়েছে যা আপনার লেখা?

ডঃ লীনা ঃ হ্যাঁ, আমার স্বামী আকোস অস্টারের সঙ্গে লিখেছি 'কনসেপ্টস অব পার্সন অ্যান্ড ম্যারেজ ইন ইন্ডিয়া'। প্রকাশ করেছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগ। এছাড়া নিউ জার্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাপা হয়েছে 'দ্য গিফট অব এ ভার্জিন'। এখন আমরা স্বামী-স্ত্রী 'ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কালচার অব সুদান' নামে একটি বইয়ের পান্ডুলিপি শেষ করছি।

ডঃ লীনা ফ্রুজিতা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে মিশে গেছেন মানুষের হয়ে কাজ করতে। লীনা এক অদ্ভুত মানসিকতার মেয়ে। স্বামীর পদবী গ্রহণ না করে বহন করে বেড়াচ্ছেন বাবার পদবী। লীনা দীর্ঘকাল আমেরিকায় বসবাস করলেও তাঁর চেহারায়, অভিব্যক্তিতে, পোশাকে এতটুকু আমেরিকানাইজড-এর ছাপ পড়েনি। বরঞ্চ ইথিওপিয়ার মেয়ের বাদামি গাত্রবর্ণ, ইটালিয়ানদের মতো তীক্ষ্ম নাসিকা, ভাবালু চোখ লীনাকে করে রেখেছে একেবারে অন্যরকম। আবার উল্টোদিকে তাঁর চিন্তা, ব্যবহারিক আদব-কায়দা, এমনকি নিপুণভাবে জামদানি শাড়ি অথবা অল্প দামের ছাপা শাড়িতে লীনাকে মনে হয় একেবারে ঘরোয়া এক বাঙালি মেয়ে।

লীনা ভারতে এসে কাজ করায় দারুণভাবে গর্বিত। বাঙালির মাটির টান তাঁর কাছে দুর্নিবার। তাই লীনা বলেন, 'আমি শুধু আমার কাজেই বাংলাকে ধরে রাখিনি, আমি সারা জীবনে ছাপ রাখতে আমার ছোট মেয়ের নাম দিয়েছি কাত্যায়নী। কাত্যায়নী হবে ভারতপ্রীতির জ্বলন্ত প্রমাণ।'

শ্যামলী বসু

বৃত্তের বাইরে



জয়া বসু (রায়)

ওরা তিনজন জমিয়ে খেলছে। ভাস্করের টেপটাতে গমগমে হিন্দি গানের একটা সুর বাজছে। সেটা ছাপিয়ে দূরের শালগাছের ছায়ায় বসা দলটার মাইকের গানের আওয়াজ আসছে। আনন্দর তাসটা ঠিক আসে না, ও একটু সরে বসে গান শুনছিল অথবা ঠিক গান নয়, আনন্দর দৃষ্টি বার বারই সামান্য দূরের পাথর, পাথরে ধাক্কা খেয়ে সুবর্ণরেখার ক্ষীণ জলধারার ছোট্ট ঝনটার ওপর পড়ছিল। এই উন্মুক্ত প্রকৃতি, নদী, জল, শীতের ঝকঝকে রোদ্দুরের একটা আলাদা জাদু আছে, শরীরের একেবারে ভেতরে ঢুকে সারা দেহটাকে চনমনে করে তোলে। ওরা তিনজন তাই সব ভুলে একেবারে ছোট্ট মেয়ের মত লাফাচ্ছিল, আঁজলা করে জল তুলে পরস্পরের গায়ে দিচ্ছিল আর অফুরন্ত হাসছিল। আনন্দর দৃষ্টি এখানে কোথাও বাধা পায়নি, কোন সংকোচও নেই এখানে। তণিমা একটু দূরে বালির উপর বসে পাপু আর রিমঝিকে বালির ঘর করে দিচ্ছিল। ভেঙে যাচ্ছিল, বাচ্চা দুটো হাত দিয়ে আবার বানাচ্ছিল আবার বালিগুলো গড়িয়ে পড়ছিল। ওদের গরম জামা বালিতে মাখামাখি, তবু কেউ শাসন করছিল না। এই খোলা আকাশের তলায় ছোটবড় সকলের অন্তত আজকের এটুকু সময়ের জন্যে অবাধ স্বাধীনতা।

সকলের গলা ছাপিয়ে নন্দার উচ্ছ্বসিত হাসি আসছিল। মেয়েটা যেন এই মুহূর্তে আরও লাস্যময়ী হয়েছে। কে বলবে ও পাপুর মা! সবুজ টিয়া রঙের শাড়িতে নন্দাকে ছোট্ট সবুজ তোতার মত লাগছিল। আনন্দর ভাল লাগছিল দেখতে। অতদূর থেকেও নন্দা আনন্দকে লক্ষ্য করল। তারপর এক দৌড়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'কটা বাজে আনন্দদা? ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে দৌড়াদৌড়ি করে। কেকটা বার করুন শিগগির। এই তণিমা, তাড়াতাড়ি এসো।'

নন্দার এই সাবলীল সপ্রতিভ ভাবটুকু সবচেয়ে ভাল লাগে আনন্দর। কোনো জড়তা নেই, খুব সহজেই মিশে যেতে পারে। আনন্দর সংগে সরাসরি এত কথা বলা আজকেই তো, অথচ হাবভাবে মনে হয় ও আনন্দর অনেক দিনের চেনা।

'এই, এখন তাস বন্ধ কর!' বলে একটুও সময় না দিয়ে সব এলোমেলো করে দিল। তীর্থ রেগে উঠতে গিয়েও হেসে ফেলল। আজকে সব কিছু মাপ করে দেওয়া যায়। অন্তত এই শীতের রোদ্দুরে।

তণিমা নতুন কেনা কেক-ওভেনটাতে কাল রাত্তিরে কেকটা বানিয়েছিল। সেটা আর কিছু কমলালেবু, কলা নিয়ে আসা হয়েছে। দুপুরে ভাত খেতে আড়াইটে তো বাজবেই। খাওয়া-দাওয়ার পর ফুলডুংরি পাহাড় দেখে তারপর বাড়ি ফেরা।

'এই তণিমা, আমাকে দাও। তুমি ভেঙে ফেলেছ –'

নন্দা তণিমার হাত থেকে ছুরিটা নিল। তারপর নিপুণ হাতে পিস বের করে সকলকে দিতে লাগল। ভাস্কর রত্না হৈ হৈ করে উঠল, 'কী অন্যায়! আনন্দদাকে বড় পিস কেন? এরকম পার্সিয়ালিটি ভাল লক্ষণ নয় কিন্তু।'

ভাস্কর তণিমার দিকে তাকাল, 'মিসেস মিত্র, আনন্দবাবুর দিকে লক্ষ্য রাখবেন! ঠিক সুবিধে মনে হচ্ছে না। নন্দাকে তো চেনেন না, ভারী বিচ্ছু মেয়ে।'

'এই ভাস্করদা, নতুন লোকদের কাছে নিন্দে করছ কেন? আমি নতুন সবকিছুই খুব ভালবাসি যে! তুমি যখন নতুন ছিলে তোমাকে ফেবার করিনি বল?'

'একমাত্র আমিই কোনো অবস্থাতে ফেবার পেলাম না, না নতুন না পুরনো।' তীর্থ কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'একি তণিমা, তুমি এরকম চুপচাপ কেন? আরে বাবা, তোমার বরকে আমি সত্যি সত্যিই নিচ্ছি না তো!'

সবাই হেসে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু তণিমা বিশেষ কথা বলল না দেখে শমিতা অন্য প্রসংগ তুলল।

আনন্দ একটু অপ্রস্তুত হল, কিছুটা বিরক্তও। তণিমা সবকিছু এরকম সিরিয়াসলি নেয় কেন! ও কি সত্যি সত্যি কিছু ভেবে বসেছে নাকি! আনন্দ ঠিক বুঝতে পারে না ও অন্যায় করছে কিনা। কিন্তু এটা তো ঠিক নন্দাকে দেখতে, নন্দার আদুরে ভঙ্গির অনর্গল কথা বলা শুনতে ওর ভাল লাগে। ডিউটি থেকে বিকেলবেলা ফেরে যখন, নন্দা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকে পাপুকে পাশে নিয়ে। হয়তো ও তীর্থর প্রতীক্ষা করে, কিন্তু আনন্দর কেন জানি মনে হয় নন্দা বোধহয় আনন্দর জন্যেই দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়িয়ে আছে। আনন্দ নেহাত অভ্যাসবশত ওপরে তাকিয়েই চকিতে চোখ নামিয়ে নেয়। মেয়েটা ভারী দুষ্টু। তণিমাকে একদিন ডেকে বলেছিল, 'তোমার বর এমন ভাব করে না, যেন আমি বাঘ অথবা সিংহ!'

তণিমাই হাসতে হাসতে বলেছিল। তণিমা প্রথম প্রথম খুব বলত, নন্দা এই বলেছে, নন্দা আজ এই করেছে, নন্দা সারা দুপুর সবাইকে হাসিয়েছে। আনন্দর মন্দ লাগত না শুনতে। একটা ছোট্ট চড়ুই-এর মত মেয়েটা দিনরাত ফুরফুর করছে, উড়ে বেড়াচ্ছে। আজকাল তণিমা নন্দার কথা বিশেষ বলে না। একটু উদাসীন যেন। অথবা মেয়েরা বোধহয় খুব তাড়াতাড়ি অনেক কিছু বুঝতে পারে।

আনন্দ আবার ভাবল ও কোনো অন্যায় করছে কিনা। মেয়েটার বোধহয় একটা তীব্র আকর্ষণ আছে। মাঝে মাঝেই হঠাৎ করে ঝকঝকে চোখ দুটো আনন্দর চোখের ওপর রাখে, মুহূর্ত মাত্র, তাতেই হয়তো অনেক কিছু বলা হয়ে যায়। তীর্থ, পাপুকে নিয়ে নন্দার সংসার তো পূর্ণ। তবে –

অথবা আনন্দর নিজের ভুল, দুর্বলতা। নয়তো ভিড়ের মধ্যে রত্না শমিতার গায়ে কতবার ধাক্কা লেগেছে, আনন্দর মনেও হয়নি, কেকের পিস নিতে গিয়ে নন্দার আঙুলে হাত ঠেকতেই আনন্দর সারা দেহে বিদ্যুতের শক লাগল। আনন্দ কি আবার নতুন করে প্রেমে পড়ল! কথাটা মনে হতেই নিজের অজান্তে আনন্দর মুখ স্মিত হল। আনন্দ বড্ড ভাবে, অনেক কিছু, আবোলতাবোল। তণিমাকে ও সত্যি ভালবাসে। তণিমা যখন ওর বুকের একেবারে কাছটিতে ঘুমোয় জড়সড় হয়ে, আনন্দর ভারী মায়া লাগে, গভীর স্নেহে আদর করতে ইচ্ছে করে ক্লান্ত মুখটাকে।

'আনন্দবাবু, বড্ড ভুল হয়ে গেছে! এই

ফুলডুংরির প্রোগ্রামটা দুপুরে খাবার আগে করা উচিত ছিল। উঃ, দম বেরিয়ে গেল, তার ওপর ছেলে কোলে পাহাড়ে ওঠা – একটা ডেঞ্জারাস ব্যাপার। বাবা রাজা, এবার একটু হেঁটে চল বাবা।' তিরিশ পেরুতে না পেরুতে অশোক পেটে বেশ খানিকটা চর্বি জমিয়ে নিয়েছে। তার ওপর ছেলেটা মোটে হাঁটতে চায় না। একবার শমিতা, একবার অশোক পালা করে টানছে ওকে। অশোকের দিকে তাকিয়ে আনন্দর নিজেকে অনেক মুক্ত, অনেক স্বাধীন মনে হল।

ফুলডুংরির মাথার ওপর থেকে দূরের পিচ ঢালা রাস্তাটা ভারী সুন্দর। অনেকটা উঁচু হয়ে তারপর ঢাল খেয়ে নিচে তলিয়ে গেছে কোথায়। শেষ বিকেলের আলো মরে আসছে। খাওয়া-দাওয়ার পর এতটা চড়াই উঠতে গিয়ে সবাই হাঁপাচ্ছিল। শতরঞ্জি পেতে যে যার বসল ছড়িয়ে। ভাস্করের মাথায় সব সময় বুদ্ধি খেলছে। চটপট পকেট ডায়েরী ছিঁড়ে কাগজ নিয়ে চার টুকরো করল, তারপর খসখস করে কী লিখল, লেখার পর মৃদু হেসে বলল, 'একটা মজার খেলা হোক এবার। এই কাগজের টুকরো ছড়াব, ছেলেরা, মেয়েরা নয় কিন্তু তুলে নেবে, যার ভাগে যে পড়বে। এই কিছুটা সময়ের জন্যে সে তার। মানে আমি তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারব। ধর, নন্দা আমার কাছে পড়ল, তার মানে কিছুটা সময়ের জন্যে নন্দা আমার, তীর্থর নয় কিন্তু। ইচ্ছে করলে –'

ভাস্কর আরো একটু দুষ্টুমি করল, 'আমার এখন খুব রেস্ট নিতে ইচ্ছে করছে, আমি নন্দার কোলে মাথা রেখে রেস্ট নিতে পারি।'

আনন্দ হাসল। তারপর বলল, 'এটা কিন্তু আপনার নিজস্ব আইডিয়া নয় ভাস্করবাবু। রেডিওতে কিছুদিন আগে এরকম একটা নাটক শুনেছিলাম মনে হচ্ছে।'

'আরে, সেই আইডিয়াটাই তো এক্ষুনি মাথায় এল!' ভাস্কর বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে উত্তর দিল। তীর্থ সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল, 'গ্র্যান্ড আইডিয়া ভাস্কর! রোজ একরকম আর ভাল লাগে না। একটু অন্যরকম হোক, কী বল?'

নন্দা, রত্না, শমিতা হৈ হৈ করে উঠল, 'যা অসভ্য হয়েছ তোমরা!' তণিমা এদের সঙ্গে ঠিক মন মেলাতে পারছিল না, বারবারই তাই দলছুট হয়ে পড়ছিল।

ভাস্কর হাত মুঠো করে শতরঞ্জির ওপর কাগজের টুকরো ছড়াল। সব শেষে আনন্দ হাত বাড়াল। ভাস্কর টুকরোটা খুলে হতাশ গলায় বলল, 'যাঃ আমার ভাগ্যটা একেবারে ঘোলা জলের ডোবা! পচা, পুরনো রত্নাটা এটুকু সময়ের জন্যেও আমার ঘাড় থেকে নামল না!'

'খুব খারাপ হবে কিন্তু! সবার সামনে যা তা বলছ!' রত্না কৃত্রিম ঝেঁজে উঠল।

'তীর্থ, তোর কে? শমিতা?' ভাস্কর অশোকের কাগজটা খুলল, 'তোরটা মিসেস মিত্র।'

'আনন্দবাবু, শেষ পর্যন্ত রত্না আপনার কাছেই পড়ল! আমি কখন থেকে আশা করে আছি ভদ্রমহিলাটি এবার অন্তত আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করবেন!'

'বেশি বলো না ভাস্করদা! আনন্দবাবু তোমাদের কান্ড-কারখানা দেখে সত্যি ভয় পেয়ে যাবেন। আর কক্ষনো আসতে চাইবেন না!' নন্দা আনন্দর দিকে তাকিয়ে হাসল।

'বেশি বললে সত্যি সত্যি শুয়ে পড়ব কিন্তু!' আনন্দ তণিমার দিকে না তাকিয়ে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল। মেয়েটা সকাল থেকে বড্ড পেছনে লাগছে।

'বাসরে!' নন্দা হাততালি দিয়ে উঠল, 'ভাস্করদা, আনন্দবাবুকে যা ভেবেছ তা নয়। বেশ বোল্ড, তোমাদেরই মতো। নেহাত তণিমা রয়েছে কাছে, নয়তো – কি ঠিক বলেছি আনন্দদা?'

আনন্দর একবার ইচ্ছে করছিল সবার সামনে দুম করে নন্দার কোলে মাথা রেখে ওকে এক কথায় চুপ করিয়ে দেয়। কিন্তু ইচ্ছে করলেই বোধহয় সবকিছু করা যায় না। আনন্দ বড় জোর দূর থেকে নন্দার দিকে তাকাতে পারে। ওর কথা অনর্গল কান পেতে শুনতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। কিসের এক অদৃশ্য গন্ডি ওর চারদিকে একটা সীমাবদ্ধতা টেনে দিয়েছে। ভাস্কর অপেক্ষা না করে রত্নার কোলে মাথা রেখে লম্বা পা ছড়িয়ে দিল। বেচারি সত্যিই ক্লান্ত।

আরও অনেকটা সময় পেরিয়ে ফুলডুংরির পাহাড় আলো করে চাঁদ উঠল। ওপাশের মেয়েলি দঙ্গলটা অনেকক্ষণ নেমে গেছে। ভাস্কর রত্নার কোল থেকে মাথা তুলে বলল, 'সুপার্ব! কি বলুন আনন্দবাবু! সত্যি এসব ডিউটি ফিউটিগুলো জ্বালালে, নয়তো আজ রাতটা 'শবরী' কিংবা 'নির্জন'-এ থেকে গেলে দারুণ হত।'

এ নিয়ে কিছুক্ষণ আগেই তারস্বর আলোচনা হয়ে গেছে। এবার কেউ কোনো কথা বলল না। পাপু, রাজা শতরঞ্জির ওপর সারাদিনের ধকলে একেবারে নেতিয়ে শুয়ে। দস্যি রিমকিটা ঘুমোয়নি, ভাস্করের গা ঘেঁসে একমনে কমলালেবুর খোসা ছাড়াচ্ছে।

আনন্দ নন্দার দিকে চকিতে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। মেয়েটা বড্ড সোজাসুজি চোখের দিকে তাকায়। হিমেল জ্যোৎস্নায় নন্দাকে অদ্ভুত মোহময়ী লাগছে। সারাদিনের শেষেও ক্লান্তির ছাপ পড়েনি মুখে-চোখে। মসৃণ চামড়ায় জ্যোৎস্না পিছলে পড়ছে। দুষ্টুমিভরা চোখে আনন্দর দিকে তাকাল, যেন আনন্দর সবটুকু দুর্বলতা ধরা পড়ে গেছে মেয়েটার কাছে, যেন বলতে চাইছে আনন্দটা বড্ড ভীতু, বড্ড ভালমানুষ। আনন্দর হঠাৎ ফুলডুংরির এই জ্যোৎস্নায়, পাহাড়ের একেবারে মাথায় সমতলভূমিতে একবার নন্দার ঐ নরম মোমের মত হাতটাতে ঠোঁট ঠেকাতে তীব্র ইচ্ছে করল।

শালগাছের ছায়ায় তণিমা এতক্ষণ চোখ বুজেছিল ক্লান্তিতে। আনন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কখন নামা হবে? একেবারে রাত হয়ে এল যে!'

'হ্যাঁ, ওঠা যাক। এক্সপ্রেসটা কটায় যেন তীর্থ?' ভাস্কর আড়মোড়া ভেঙে উঠল।

'অনেক সময় আছে, ধীরেসুস্থে গেলেই চলবে। বাচ্চাগুলোকে তোলা যাক।'

তীর্থ পাপুকে কোলে নিল।

ওরা সাবধানে পাহাড় থেকে নামছিল। পাপু জেগে গেছে। আর জেগে গিয়েই মার মত হৈচৈ বাধিয়েছে। তীর্থ আর নন্দার কথা শুনতে পাচ্ছিল আনন্দ। নন্দা পাপুকে নিতে চাইছিল, 'আমাকে দাও না, তুমি তো সারাক্ষণই নিলে –'

'নিজে নামো তো আগে।' তীর্থ আদর করে নন্দার চুল নেড়ে দিল।

তণিমা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। আনন্দ একটু হেঁটে পাশে গেল।

'শরীর খারাপ লাগছে?'

'নাঃ!' তণিমা একটু গম্ভীর যেন।

'তাহলে কথা বলছ না কেন?'

'কই না তো। এই তো বলছি।' তণিমা ক্লান্ত হাতে কপালের চুলগুলো সরায়।

আনন্দর হঠাৎ করে মায়ায় বুক ভরে ওঠে। আহা, সারাদিন বড্ড ধকল গেছে মেয়েটার ওপর। ক্লান্তিতে পান্ডুর হয়ে আছে মুখটা। তাছাড়া প্রথমদিকে এসময় একটু বেশি ক্লান্তি থাকে সারা শরীর জুড়ে। তণিমা রাজি ছিল না, আনন্দর জোরাজুরিতে এসেছে। 'এস, হাত ধরো। যা নুড়িপাথর, পা হড়কে যেতে পারে।'

আনন্দ শক্ত করে ধরে তণিমার হাতটা, ঠান্ডা হয়ে আছে। একটুও রক্ত নেই যেন। তণিমার দৃষ্টি তীর্থের কাঁধে বসা পাপুর দিকে।

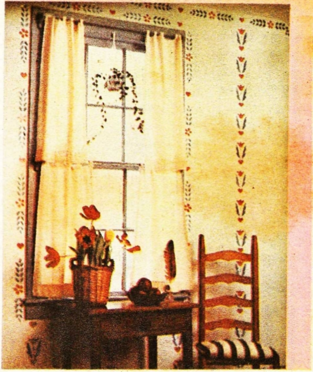
শালগাছগুলোর ফাঁকে চাঁদটা বড্ড বেশি সুন্দর, বড্ড বেশি সাজানো লাগছে। ফ্রেমে বাঁধানো নিখুঁত ছবি যেন। জ্যোৎস্নার সাদা আলোয় নুড়িপাথরে বিছানো বিস্তীর্ণ পথটা চকচক করছে। আনন্দ মুখ তুলে চাঁদটাকে দেখল। শমিতারা অনেকটা এগিয়ে, নন্দা-তীর্থর সম্মিলিত হাসি শোনা যাচ্ছে। পাপুকে কাঁধ থেকে নামিয়ে ওকে দুদিক থেকে দুজনে ধরে হাঁটাচ্ছে ওরা। নুড়িপাথরে পা রেখে ভারী শরীরে টলমল করছে পাপু। পরিষ্কার আকাশে টলটলে চাঁদটার দিকে তাকিয়ে, শালপাতার গন্ধ নিতে নিতে আর তণিমার হিমশীতল হাতটা নিজের সবল হাতের উত্তাপে গরম করতে করতে আনন্দ ভাবল, 'আমাদের চারদিকে একটা গন্ডি টানা হয়ে গেছে। আমরা কেউ কারুর বৃত্তের বাইরে যেতে পারি না, না নন্দা, না আমি, না তুমি –'

পর্দার প্রয়োজনীয়তা

সাধারণত ঘরের সৌন্দর্যবিকাশ ও গোপনীয়তা রক্ষার জন্যই আমরা পর্দার ব্যবহার করে থাকি। এছাড়াও আরো যে কারণে আমরা পর্দা ব্যবহার করি তা হল ধুলো-ময়লার হাত থেকে খানিকটা বাঁচবার জন্য। ঘরের গোপনীয়তা রক্ষার পাশাপাশি জানলাটি যেমনই হোক না কেন পর্দার সাহায্যে তাকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। এছাড়া শীতকালে বাইরের ঠান্ডা হাওয়া যা জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আমাদের আক্রমণ করে তা খানিকটা বন্ধ করবার জন্য এবং রাতে বাইরের অন্ধকারকে আড়াল করবার জন্যও পর্দার প্রয়োজন অনুভূত হয়।



খোলামেলা ঘরের পক্ষে মানানসই পর্দা



জানলার পর্দাকে আরো আকর্ষণীয় করা

পর্দার জন্য উপযুক্ত কাপড় হচ্ছে লিনেন, নাইলন, নেট এবং মসলিন। এতে ইস্ত্রির ঝামেলা থাকে না এবং বাড়িতে চট করে কাচারও কোনো অসুবিধে নেই। তবে এই ধরনের পর্দা করতে গেলে খরচের কথা মনে রেখে করাই ভাল। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের পক্ষে মোটা সুতির কাপড়ের পর্দাই ব্যবহার করা উচিত। বাড়িতে কেচে ইস্ত্রি করে নেওয়া যদিও শ্রমসাপেক্ষ তবুও চট করে নষ্ট হবার ভয় থাকে না। বাড়িতে আটপৌরে ব্যবহারের জন্য সুতির পর্দাই ভাল। তবে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের পক্ষে অন্যান্য দামী কাপড়ের পর্দা ব্যবহার করা যেতে পারে।

পর্দার কাপড় নির্বাচনের সময় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন, যে ঘরের জন্য পর্দা নির্বাচন করব সেই ঘরের রঙ, ঘরটি কি হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ঘরটিতে আলো-বাতাস কিরকম খেলে। যেমন বাথরুমের পর্দা কাপড়ের বদলে প্লাস্টিকের তৈরি হলেই ভাল হয়, কারণ এতে স্নানের সময় জল ছিটলে কোনো ক্ষতি নেই। আপনার শোবার ঘরটির তিনদিকেই যদি বড় বড় জানলা থাকে এবং অতিরিক্ত খোলামেলা হয় তাহলে দেওয়ালের যে রঙ সেই রঙেরই গাঢ় শেডের অথবা বেড কভার, টেবিল কভার, কার্পেট ইত্যাদির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে বেশ মোটা কাপড়ের ভারী পর্দা ব্যবহার করা উচিত; যাতে দুপুরবেলা শোবার সময় পর্দা টেনে দিলে ঘরের মধ্যে বেশ আলো-আঁধারের সৃষ্টি হতে পারে। তাহলে এটা হবে ঘুমের সহায়ক। কিন্তু ঘরটি যদি এমনিতেই আলো-আঁধারি ধরনের হয় তাহলে দেওয়ালের রঙের সঙ্গে মানানসই হালকা একরঙা বিছানার চাদর, টেবিলের ঢাকা এ সবের সঙ্গে মানানসই হালকা ধরনের প্রিন্টের পর্দা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে দেখতে হবে পর্দার কাপড়টি যেন খুব মোটা ধরনের না হয় যাতে টেনে দিলেও ঘরটিতে অল্প অল্প আলো আসতে পারে। শোবার ঘরে উজ্জ্বল ঝকঝকে পর্দা না টাঙানোই উচিত। অন্যদিকে বসার ঘরের পর্দা হবে উজ্জ্বল রঙের; অবশ্যই দেওয়ালের এবং সোফার ঢাকা, টেবিল কভার, টিভি-র ঢাকা এসবের সঙ্গে মানানসই হয়ে। পর্দা টাঙানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে বাইরের যেদিকে রোদ লাগতে পারে; পর্দার সেই দিকটি যেন উল্টোদিক হয়।

কাপড়ের পর্দার বদলে দরজা-জানলায় মাদুরের ওপর সুন্দর করে এঁকে টাঙানো যেতে পারে।

পর্দা সাধারণত ভূমিতল অর্থাৎ মাটি অবধি ঝুলের হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে যদি মাটি অবধি ঝুল করা সম্ভব না হয় তাহলে জানলার ওপরে এবং ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দুটি তার খাটিয়ে নিয়ে দুভাগে পর্দা টাঙালে দেখতে ভালই লাগে। অনেকে আবার একটি ঘরকে দুভাবে ব্যবহার করার জন্য পার্টিশানের বদলে মাটি অবধি ঝুলের পর্দা ব্যবহার করে থাকেন।

শর্মিলা ঘোষ

এই নিন—হেয়ার রিমুভার সম্বন্ধে যাবতীয় খবরাখবর, যা আপনি জানতে চাইতেন!

হাতে পায়ে লোম থাকাটা আমার ভাল লাগে না। কিন্তু ওগুলো সাফ করতেও তো ভয় পাই—পাছে বেশি ঘন হ'য়ে দ্রুত বেড়ে না ওঠে!

এটা পুরো নির্ভর করছে—কি উপায়ে আপনি লোম সাফ করবেন! যদি ক্ষুর চালান, তাহলে হ্যাঁ, লোম সত্যিই দ্রুত বেড়ে উঠবে। আর সেই জায়গাটি হ'য়ে যাবে খুব খরখরে—ছিঃ! কিন্তু গোদরেজ হেয়ার রিমুভার ব্যবহার করলে তা হয় না। কারণ, এটি নারীসুলভ কোমলতায় আপনার হাত, বগোল, পা এমন কি মুখেরও সব লোম মোলায়েম ভাবে তুলে দেয়।

কিন্তু লোম তুলতে গেলে ব্যথা হবে না তো?

এটাও নির্ভর করছে—কি উপায়ে আপনি তা করবেন। ওয়াক্সিং-এ ব্যথা হবেই কারণ এটি টান মেরে লোম উবড়িয়ে আনে—উঃ! গোদরেজ হেয়ার রিমুভার দিয়ে লোম এমনই মোলায়েম ভাবে উঠে যায় যে আপনি কিছু টেরই পাবেন না।

একদিন আমার বান্ধবীকে লোম ওঠাতে দেখলাম—তার ত্বক লাল হ'য়ে সেখানে দাগ পড়ে গেল…

অতি কোমল ত্বকের ওপর ঠিক এই প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক—বিশেষ ক'রে ওয়াক্সিং-এর মত কড়া পদার্থ ব্যবহার করলে। কিন্তু গোদরেজ হেয়ার রিমুভার-এ মেশানো আছে এক বিশেষ হলুদ—ত্বকের স্বাভাবিক কণ্ডিশনার। ফলে, এই হেয়ার রিমুভার অবাঞ্ছিত লোম সাফ করার সাথে সাথে ত্বককে রাখে কোমল ও মোলায়েম।

হেয়ার রিমুভার-এ চারিদিক নোংরা আর সময় নষ্ট—নয় কি?

গোদরেজ হেয়ার রিমুভার-এর সঙ্গে থাকে নিজস্ব অ্যাপ্লিকেটর। এ দিয়ে আপনি হেয়ার রিমুভার লাগান—সেটা কিছুক্ষণ রাখুন—আর মুছে ফেলুন, ব্যস! দেখলেন তো—কাজটা কেমন সহজ! অন্যদিকে, ওয়াক্সিং মানে চট্‌চটে মোম, কাপড়ের পটির ঝঞ্ঝাট আর প্রচুর সময় নষ্ট—কী বিরক্তিকর নোংরা কাজ!

হেয়ার রিমুভার-এর গন্ধ অতি বিশ্রী—নয় কি?

গোদরেজ হেয়ার রিমুভার-এ অন্যান্য হেয়ার রিমুভারের মত বিশ্রী রাসায়নিক দুর্গন্ধ নেই। বরং এতে পাবেন এক মিষ্টি সুবাস!

আর দেরী কিসের? আপনি এখন আস্তিন ছাড়া চোলি-ই পরুন বা সুন্দর স্ট্র্যাপলেস্ ড্রেস! তবে হ্যাঁ, সবার প্রথমে আনুন—গোদরেজ হেয়ার রিমুভার প্যাক।



CHAITRA G-268 BEN

মেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কী?

গার্গী চক্রবর্তী

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মেয়েরাই অধিকাংশ পদক নিয়ে গেলেন, একথা শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ নিজেই স্বীকার করলেন। এবারের চার্টার্ড অ্যাকাউন-টেন্সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়েছেন জনৈকা মহিলা। মেয়েরা সুযোগ পেলে অনেক যোগ্যতা দেখাতে পারেন – তার হাজার দৃষ্টান্ত এনে লাভ নেই। আসল কথা, মেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? এটা ঠিক, সারা দেশে কজন মেয়েই বা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন! সাক্ষরতার কথা বাদই দিলাম। তবু এই স্বল্পপরিমিত মেয়েদের কথাই ধরা যাক, যারা সমাজে শিক্ষিত বলে পরিচিত। প্রশ্ন হল, মেয়েদের কাছে লেখাপড়া শেখবার কী অর্থ?

কয়েক দশক আগেও মেয়েদের শিক্ষায় কিছু বি এ, এম এ জাতীয় ডিগ্রী থাকলে বিবাহের জন্য পাত্র পেতে সুবিধা হত। 'পাত্রী চাই' এই পংক্তিতে 'গৃহকর্মে নিপুণা'র সংগে 'উচ্চশিক্ষিতা' একটি বিশেষণ। এখনও হয়ত এমন অনেক পরিবার রয়েছে, যেখানে মেয়েদের পড়াশুনো শেখানোর উদ্দেশ্য সুগৃহিণী হওয়া। এর বেশি আর কিছু নয়। 'বি এ' পাশ বউ শ্বশুরবাড়িতেও মর্যাদার পরিচয়।

সময় যেমন একজায়গায় থেমে থাকে না, ঠিক তেমনি ভাব ও ভাবনারও একটা চলমান গতি আছে। সেই গতির অন্য নাম 'প্রগতি'। আজকাল যে মেয়েরা কলেজজীবনের আনন্দ গ্রহণের সুযোগ পান তারা পাঠ্যজীবনেই ভবিষ্যৎ রুজি-রোজগারের চিন্তা করেন। ভাবতে থাকেন, কোন লাইনে গেলে চাকরি পেতে সুবিধা হবে? অধ্যাপিকা হিসাবে ছাত্রীদের যখন জিজ্ঞাসা করি – কলেজজীবন শেষ হলে কী করবে? তখন বেশিরভাগ ছাত্রী স্পষ্ট মতামত জানায় – কোনো-না-কোনো ভাবে চাকরি করবে। সাংবাদিকতা, লাইব্রেরিয়ানশিপ প্রভৃতি লাইনে যাবার ইচ্ছাও কেউ কেউ ব্যক্ত করে। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, একটা পেশাধর্মী মনোভাব এভাবে গড়ে উঠছে। ডিগ্রী তাদের কাছে গহনা নয় যে সমাবর্তনের পর সেই ডিগ্রীগুলো চিরকালের জন্য বাক্সে তুলে রাখবে। আমাদের দেশে বেকার সমস্যা খুবই প্রবল। সেটা মেয়েদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। চাকরির সন্ধানে আজকের মেয়েরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছেন। এ প্রসংগে একটা কথা মনে এল। এখনও অনেক লোক, এমনকি শিক্ষিত লোক, মনে করেন – আমাদের দেশে যেখানে ছেলেরাই চাকরি পায় না সেখানে মেয়েরা সবাই চাকরি চাইলে বেকার সমস্যা আরো বাড়বে। কিন্তু বলা বাহুল্য আজকের মেয়েরা চিন্তার রক্ষণশীলতার সংগে কোনো বোঝাপড়া করতে রাজি নন। তাদের সোজা জবাব – যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি, সেখানে পুরুষ বা স্ত্রী এই হিসাবে নির্বাচনের প্রশ্ন উঠতে পারে না। বিভেদধর্মী চিন্তাধারা মেনে নিতে তারা তৈরি নন।

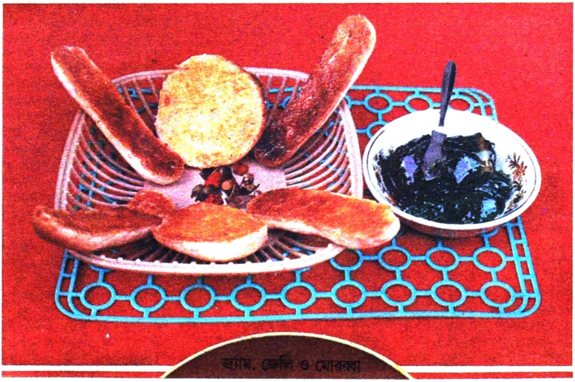
শিক্ষা ও চাকরি – কথা দুটো মেয়েদের মানসিক জগতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ছে। রাতের পর রাত জেগে, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় নিয়ে পড়াশুনো শিখে তারপর মেয়েদের অস্তিত্ব ঘরের চার দেওয়ালে বা রান্নাঘরেই সীমিত থাকবে – এমন কেন হবে? ডাক্তারি পাশ করে বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে বিবাহের পর সুগৃহিণী হবার বাসনায় সমস্ত অতীত ভুলে ডিগ্রীগুলো তুলে রাখলে তিনি অপরাধী হবেন শুধু নিজের কাছেই নয়, সমাজের কাছেও। সমাজের জন্য তার কিছু করবার রয়েছে। নারী-পুরুষের সমান-অধিকার কথাটা শুধু সাংবিধানিক অভিধানের মধ্যে থেকে গেলে, যুগটা যে পিছিয়ে পড়বে!

পণ এবং যৌতুকে ভরিয়ে দিয়ে কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে মা-বাবা দায়মুক্ত হতে চান। কিন্তু কন্যার ভবিষ্যৎ-নিরাপত্তার কথা ভাবলেন কি? বউ-পোড়ানো কিংবা বউদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে ছড়িয়ে রয়েছে। দু-মুঠো ভাতের জন্য তারা যেন বাঁদী হয়ে থাকেন। স্বামীদের মর্জির ওপর তাদের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। 'পুতুলখেলা'র মতো স্বামীর যখন বউকে নিয়ে খেলতে ইচ্ছে করবে, খেলবে; যখন ইচ্ছে করবে না, খেলবে না। মর্যাদাবোধ থাকলে স্ত্রী আত্মনির্ভর হতে চাইবেন। কিন্তু তখন বড়ই দেরি হয়ে যায়। কোথায় তখন চাকরি পাবেন?

আমরা যখন স্বীকার করে নিয়েছি নারী-পুরুষ সমান এবং তাদের রয়েছে সমান অধিকার, তখন মেয়েদের শিক্ষার পর চাকরির সন্ধান না করে বিবাহের পাত্র কেন খুঁজি? চাকরি না পেলে কোনো ছেলেকে তার মা-বাবা বিয়ে দেন কি? এ কথায় খুব আলোড়ন হবে, জানি। কিন্তু তবু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা দরকার। অর্থনৈতিক কারণে, নিজেদের আত্মনির্ভরতাবোধ এবং চাকরি করবার অধিকার বোধের দরুন শিক্ষিত মেয়েরা চাকরি করেন। যখন ভাইবোন এক স্কুলে একইভাবে পড়াশুনো করে তখনও দেখা যায় যৌবনে পা দিতে না দিতেই ভাইয়ের ওপরই পড়ে সংসারের আর্থিক দায়িত্ব। হঠাৎ তাদের মূল্যবোধে একটা দেওয়াল তৈরি হয়ে যায় কেন? সংসার স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের। তাই তাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব এবং আর্থিক দায়িত্বও স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই। সাংসারিক ঘরের কাজের ভারও দুজনেরই! রান্নায় স্ত্রীর সংগে সহযোগিতা করলে স্বামীর পৌরুষবোধে ঘা খাবার কোনো কারণ নেই। আবার স্ত্রীর কোনো ভয় হওয়া উচিত নয় যে, তার রাজত্বে স্বামীর অনুপ্রবেশ হল, কিংবা লোকে কি ভাববে। এর জন্য দরকার দু-পক্ষেরই সাহস এবং সহযোগিতার মনোভাব।

চাকরিকরা মেয়েদের জীবনে রয়েছে অনেক সমস্যা। কিন্তু সেইসব সমস্যার সমাধানের রাস্তা এই নয় যে, মেয়েদের প্রধান ভূমিকা গৃহিণীর। চাকরির রাস্তা মোটেও সুগম নয়। কিন্তু মেয়েদের পক্ষে চাকরি বিশেষ প্রয়োজন। তারা রাস্তায় থাকতে পারে না। মাথার ওপর ছাদ দরকার। আর সেই ছাদ তৈরি হয় আত্মনির্ভরতায় এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতায়। শিক্ষার কোনো অর্থ থাকে না যদি মেয়েরা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন না হন।

এখনও বহু পরিবার রয়েছে যেখানে ছেলে ও মেয়েকে সমান শিক্ষা দেওয়া হয় না। টাকায় না কুলোলে ছেলেকে ভাল স্কুলে দেওয়া হল আর মেয়ের জন্য মামুলি শিক্ষা। সে যে পরের ঘরের ধন! মা-বাবা তাড়াতাড়ি মেয়েকে বিয়ে দিয়েই যেন দায়মুক্ত হতে চান। UNICEF এবং Social and Women's Welfare Ministry থেকে সম্প্রতি কাগজে কাগজে পোস্টার দিয়েছে – যার শীর্ষক হল – 'Equality is their birth right — give them an equal chance, give them an equal share.' ভেতরে রয়েছে – 'Your daughter is as good as your son. Don't let her be deprived. Show her you care.' শিক্ষা, খাদ্য – কোনো বিষয়েই মেয়েকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। মধ্যবিত্ত সমাজে মা-বাবা ভাবেন ছেলেই হবে বুড়ো বয়সের সম্বল, তার রোজগারই বার্ধক্যের সহায়। এই ধারণা সেকেলে। এই চিন্তাধারাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়। কারণ মা-বাবাকে দেখবার ও সাহায্য করবার ব্যাপারে মেয়েদেরও রয়েছে একই দায়িত্ব। বিশেষ করে যে মেয়েদের মা-বাবারা শিক্ষার সমস্ত সুযোগ দিচ্ছেন এবং আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করছেন। মেয়েদের মনেও সেই আকৃতি থাকবে – 'হৃদয় আমার চায় যে দিতে, কেবল নিতে নয়।'



পাউরুটি সহযোগে আনারসের জ্যাম ও আমের জেলি

জ্যাম, জেলি ও মোরব্বা

জ্যাম, জেলি ও মোরব্বা ছোট-বড় সকলেরই প্রিয়। বিশেষ করে আপনার বাচ্চা যদি স্কুলে যায় তাহলে পাউরুটি, বিস্কুট বা কেকের গায়ে একটু জ্যাম বা জেলি মাখিয়ে দিলে ওদের জন্য টিফিনের চিন্তা আর থাকে না। এছাড়া প্রত্যেকদিন সকালে ব্যস্ততার মধ্যে নিত্য-নতুন জলখাবার করা সম্ভব নয়। সে সময় পাউরুটির সঙ্গে জ্যাম বা জেলি মাখিয়ে অনায়াসেই প্রাতরাশ পর্ব মিটিয়ে ফেলতে পারেন।

জ্যাম, জেলি তৈরি করতে গেলে সবসময়েই অতি উৎকৃষ্ট জাতের ফল বাছতে হবে। ফল যেন টাটকা এবং পাকা হয়। আবার খুব বেশি পাকা ফল কিন্তু চলবে না। যে সময়ের যে ফল বাজারে সহজে পাওয়া যাবে এবং দামেও সস্তা হবে সে সময় আপনি এই জ্যাম ও জেলি তৈরি করে রাখতে পারেন।

আপেলের জ্যাম

উপকরণ ঃ ২০০ গ্রাম আপেল, ৩০০ গ্রাম চিনি, ১টি বড় পাতিলেবু, হলদে রঙ (ফুড কালার)।

প্রথমে আপেলের খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। এবার প্যানে পরিমাণমত জল দিয়ে (ধরুন ৩/৪ টেবল-চামচ) সেদ্ধ করুন যতক্ষণ না আপেল নরম হচ্ছে। একটা হাতা দিয়ে আপেলের টুকরো প্যানের গায়ে চেপে দিন; তাহলে সহজে মিশে যাবে। এবার এতে চিনি, লেবুর রস ও হলদে রঙ কয়েক ফোঁটা দিয়ে আরও ৩/৪ মিনিট ফুটিয়ে নামিয়ে ফেলুন এবং গরম অবস্থায় একটি স্টেরিলাইজ করা বোতলে ঢেলে ঠান্ডা জায়গায় সেটি রেখে দেবেন।

আনারসের জ্যাম

উপকরণ ঃ আনারস ১ কিলো, চিনি ৭০০ গ্রাম, ২ টেবল-চামচ পাতিলেবুর রস।

প্রথমে আনারসের খোসা ও চোখ বাদ দিন এবং ছোট ছোট টুকরো করে নিন। কুকারে জল না দিয়ে আনারস ৫ মিনিট স্টীম দিয়ে নামিয়ে ফেলুন। এবার এতে চিনি ও চা-কাপের আধ কাপ জল দিয়ে ফুটতে দিন যতক্ষণ পর্যন্ত রস ঘন ও ভারী হয়ে না উঠছে। মিশ্রণটি ঘন হলে তাতে লেবুর রস মিশিয়ে নামিয়ে ফেলুন। ঠান্ডা হলে বোতলে ঢেলে রাখুন।

এই জ্যামে আপনি আপনার ইচ্ছেমত যে কোনো 'ফুড কালার' দিতে পারেন।

পেয়ারার জেলি

উপকরণ ঃ পাকা পেয়ারা ৬০০ গ্রাম, চিনি ৪০০ গ্রাম, তিনটি পাতিলেবুর রস, ২ কাপ জল।

পেয়ারা ভালো করে জলে ধুয়ে টুকরো করে একটি পাত্রে ২ কাপ জল দিয়ে সেদ্ধ করুন। পেয়ারা একেবারে নরম এবং জল ঘন হয়ে গেলে নামিয়ে ফেলুন। এবার একটি পরিষ্কার পাতলা কাপড়ে ছেঁকে রস বার করে নিন (মনে রাখা দরকার পেয়ারার কোনো বীজ জেলির মধ্যে থাকবে না)। চিনি মিশিয়ে কম আঁচে এই রস চাপান। ধীরে ধীরে নাড়তে থাকুন। গাঢ় হলে লেবুর রস দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ফোটান। কয়েক ফোঁটা জুস তুলে একটা প্লেটে ঢালুন। ঠান্ডা হলে যদি দেখেন সেটি বসে যাচ্ছে তাহলে বুঝবেন জেলি তৈরি হয়ে গেছে। নামিয়ে গরম অবস্থায় বোতলে ঢেলে ফেলুন, কিন্তু বোতলের ছিপি সঙ্গে সঙ্গে আটকাবেন না; ঠান্ডা হলে তবে আটকাবেন।

আমের জেলি

উপকরণ ঃ কাঁচা আম ৫০০ গ্রাম, চিনি ৬০০ গ্রাম, ২টি পাতিলেবুর রস, সবুজ 'ফুড কালার'।

কাঁচা আমের খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে সামান্য চুন জলে খানিকক্ষণ ভিজিয়ে রাখবেন। এরপর ২ কাপ জলে আম সেদ্ধ করতে দিন। নরম হয়ে গেলে কাপড়ে ছেঁকে আমের রসটা বার করে নিন। রসের মধ্যে চিনি মিশিয়ে উনুনে চাপান। ফুটে ঘন হয়ে উঠলে লেবুর রস ও সবুজ রঙ কয়েক ফোঁটা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ফোটাতে থাকুন। যখন দেখবেন রস ঘন ও ভারী হয়ে উঠেছে তখন নামিয়ে গরম অবস্থায় একই প্রক্রিয়ায় বোতলে ঢালুন।

গাজরের মোরব্বা

উপকরণ ঃ আধ কেজি গাজর, আধ কেজি চিনি, ৪টি লবঙ্গ, ২টি দারুচিনি, ২টি ছোট এলাচ, আধ কাপ জল, সাইট্রিক অ্যাসিড আধ চা-চামচ।

গাজরের খোসা ছাড়িয়ে দু-টুকরো করে কেটে নিন। একটি কাঁটা চামচ দিয়ে গাজরের গায়ে বেঁধান। সব টুকরোগুলোতে বেঁধানো হলে একটি প্যানে চিনি ও গাজর মিশিয়ে ৫/৬ ঘন্টা রেখে দিন। এবার এতে আধ কাপ সাইট্রিক অ্যাসিড ও জল দিয়ে উনুনে বসান। এলাচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি দিয়ে দিন। ফোটাতে থাকুন যতক্ষণ না সিরাপ ঘন হয়ে উঠছে। তারপর নামিয়ে সারারাত রেখে পরের দিন বোতলে ভরে রাখুন। যদি দেখেন সিরাপ একটু পাতলা হয়েছে তখন আরও একবার জ্বাল দিয়ে নিতে পারেন (ছোট আকারের গাজর নিলে গোটা অবস্থায় সেদ্ধ করবেন)।

সুস্মিতা সরকার

ফটো : শংকর নাগ দাস

পোস্টম্যানের রেসিপি

আমেরিকান চপ স্যুয়ে

উপকরণ :

৪৫০ গ্রাম বাঁধাকপি
৪ টেবিল চামচ পোস্টম্যান তেল
১ চায়ের কাপ সেদ্ধ করা নুডলস
২ চায়ের কাপ ভাজা নুডলস
আধ চায়ের চামচ আজিনামোটো পাউডার
১০০ গ্রাম বীনের নরম ডাল
৩টে পেঁয়াজ
২টি গাজর
১০টি ফ্রেঞ্চ বীন
১ চায়ের চামচ চিলি সস
আন্দাজমতো নুন

সসের জন্য :

পৌনে এক চায়ের কাপ ব্রাউন ভিনিগার
৪ টেবিল চামচ টম্যাটো কেচাপ
পৌনে এক চায়ের কাপ চিনি
২ টেবিল চামচ ময়দা
১ চায়ের কাপ জল
১ টেবিল চামচ সয়া সস

প্রণালী :

১। পেঁয়াজ স্লাইস করে কাটুন।

২। বীনের নরম ডাল বাদে সব সবজি সরু, লম্বা করে কাটুন।

৩। সস তৈরির সব উপকরণ একটি পাত্রে ভাল করে মিশিয়ে আঁচে বসান। ফুটতে আরম্ভ করলে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না ঘন হচ্ছে।

৪। তেল ভাল করে গরম হলে সব সবজি এবং আজিনামোটো পাউডার ঢেলে দিন। আঁচ বাড়িয়ে দিয়ে ৩ – ৪ মিনিট নাড়াচাড়া করুন।

৫। এবার তৈরি করা সস, সেদ্ধ করা নুডলস, চিলি সস, নুন দিয়ে আরো কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন।

৬। ভাজা নুডলসের অর্ধেকটা ভালভাবে মিশিয়ে দিন।

গরম গরম পরিবেশন করুন। পরিবেশনের আগে বাকি ভাজা নুডলসগুলো ওপরে ছড়িয়ে দিন।

মাটন কাশ্মীরী

উপকরণ :

আধ লিটার দুধ
স্বাদ অনুযায়ী নুন
আধ চায়ের চামচ সাদা জিরে
১ কেজি মাংস (পা/ঘাড়ের কাছের মাংস হলে ভাল)
১ চায়ের চামচ গরম মশলা
২ চায়ের চামচ পোস্ত (জলে ভেজানো)
৩ চায়ের চামচ মৌরি
৬ টেবিল চামচ পোস্টম্যান তেল
৩ চায়ের চামচ আদার গুঁড়ো
আধ চায়ের চামচ এলাচের গুঁড়ো
সামান্য কেশর (জলে ভেজানো)
১২টা বাদাম (খোসা ছাড়িয়ে সেদ্ধ করা)
বাদাম সেদ্ধ করা জলটা ফেলবেন না, মাংসে ঢেলে দিন।

প্রণালী :

১। মাংস ১ ইঞ্চি করে টুকরো করুন। প্রেসার কুকারে তেল গরম হলে মাংস, নুন এবং মশলা দিয়ে দিন (কেশর এবং এলাচ বাদে)। এক গ্লাস জলও দেবেন। মাংস নরম হওয়া পর্যন্ত নাড়তে থাকুন।

২। বাদাম এবং পোস্ত বেটে দুধে দিয়ে ফোটাতে থাকুন। কষানো মাংস ঢেলে দিন, কেশর মেশান।

৩। কম আঁচে রেখে দিন যতক্ষণ না ঝোল ঘন হচ্ছে।

৪। এলাচের গুঁড়ো ছড়িয়ে গরম পরিবেশন করুন।

চিকেন ক্রিসপিস

উপকরণ :

২টি কাঁচা লঙ্কা
২ টুকরো আদা
কয়েকটি পুদিনা পাতা
২টি ডিম (অল্প ফেটানো)
৫ কোয়া রসুন
১টি পাতিলেবু
১ চায়ের চামচ চিনি
স্বাদ অনুযায়ী নুন
ভাজার জন্য পোস্টম্যান তেল
১ কেজি মুরগির মাংস (আট টুকরো করা)
১ কাপ বিস্কুটের গুঁড়ো অথবা কর্নফ্লেক্স

প্রণালী :

১। আদা, রসুন, লঙ্কা, পুদিনা বেটে মিশিয়ে নিন। লেবুর রস, চিনি, নুন মেশান।

২। এই মিশ্রণটি মুরগির গায়ে মাখিয়ে ৩০ মিনিট রেখে দিন।

৩। তারপর প্রতিটি টুকরো ডিমে ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখান। ছাঁকা তেলে ভেজে সংগে সংগে পরিবেশন করুন।

খেজুরের কেক

উপকরণ :

৫টি ডিম
৩ কাপ ময়দা
১৫০ গ্রাম খেজুর
দেড় চায়ের চামচ খাবার সোডা
দেড় কাপ গুঁড়ো করা চিনি
সোয়া এক কাপ পোস্টম্যান তেল
আধ চায়ের চামচ জায়ফল গুঁড়ো

প্রণালী :

১। ময়দা, বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা, জায়ফলের গুঁড়ো একসংগে ভালভাবে মেশান।

২। পোস্টম্যান তেল, ডিম, চিনি খুব ভাল করে ফেটান। এবার ময়দার সংগে মিশিয়ে দিন।

৩। খেজুরের বিচি বাদ দিয়ে খুব ছোট টুকরো করে কাটুন। ময়দার সংগে মেশান।

৪। ৮ ইঞ্চি বেকিং পাত্র ভালভাবে তৈলাক্ত করে নিয়ে সামান্য ময়দা ছড়িয়ে দিন। এবার কেকের ময়দা ঢেলে দিন।

৫। ২০ – ৩০ মিনিট বেক করুন ১৯০ ডিগ্রি সেঃ অথবা ৩৭৫ ডিগ্রি ফাঃ-এ গ্যাসমার্ক ৪ রেখে। পুরোপুরি বেক হয়েছে কিনা দেখার জন্য একটা ছুরি কেকের মাঝামাঝি ঢুকিয়ে দিন, ছুরি বার করার পর যদি গায়ে কিছু লেগে না থাকে তাহলে বুঝবেন কেক হয়ে গেছে।

দ্রষ্টব্য : মাখনের বদলে পোস্টম্যান তেল ব্যবহার করে দেখা গেছে কেক হালকা হয় এবং ভাল ফোলে।

হালুয়া ডিলাইট

উপকরণ :

৪টি এলাচ
৩০০ গ্রাম চিনি
১১৫ গ্রাম ক্ষীর
সামান্য জাফরান
৫৫ গ্রাম পোস্টম্যান তেল
৪০০ গ্রাম সেদ্ধ করা আলু

প্রণালী :

১। কড়াইতে তেল গরম হলে চটকানো আলু সেদ্ধ এবং চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন।

২। অর্ধেক রান্না হয়ে এলে, ক্ষীর দিন।

৩। আরো কিছুক্ষণ নেড়ে তৈলাক্ত থালায় ছড়িয়ে দিন।

দ্রষ্টব্য : ক। সফেদা, আনারস অথবা আমের শাঁস ব্যবহার করা যায় আলুর বদলে।

খ। লাউ অথবা গাজরের হালুয়া করার জন্য ২৫০ গ্রাম দুধ দিয়ে সেদ্ধ করে নিতে হবে।

গ। যেই উপকরণ দিয়ে হালুয়া হবে তার ওপর নির্ভর করবে চিনি এবং তেলের পরিমাণ।

জাম্বো অমলেট

উপকরণ :

৬টি ডিম
আধ কাপ কোরানো চিজ
১০টি রসুনের কোয়া কুচি করা
৩টি পেঁয়াজ কুচানো
২টি টম্যাটো কুচানো
৪টি লঙ্কার কুচি
সামান্য জিরের গুঁড়ো
২০০ গ্রাম রান্না করা মুরগির মাংস/চিংড়ি মাছ/মাশরুম/কাঁকড়ার মাংস
৮ টেবিল চামচ পোস্টম্যান তেল
নুন এবং গোলমরিচ স্বাদ অনুযায়ী

প্রণালী :

১। তেল গরম করে পেঁয়াজ ভেজে নিন। পেঁয়াজ স্বচ্ছ হয়ে উঠলে রসুনের কুচি, টম্যাটো, জিরের গুঁড়ো দিয়ে পাঁচ মিনিট ভাজুন।

২। কাঁকড়া/মাশরুম/চিংড়ি মাছ/মুরগি এবং চিজ দিয়ে তিন মিনিট শুধুই নাড়তে থাকুন।

৩। ডিম ফেটিয়ে তাতে লঙ্কা, নুন, গোলমরিচ মিশিয়ে নিন। ডিমের গোলাটা মাংসের ওপর ঢেলে দিন।

৪। অল্প আঁচে রেখে দিন, মাঝে মাঝে প্যানটা নাড়িয়ে দেবেন। ছুরি দিয়ে প্যানের ধারগুলো থেকে ডিম ছাড়িয়ে নেবেন।

৫। ভাজা হয়ে গেলে ভাঁজ করে গরম পরিবেশন করুন ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এবং টম্যাটোর চাকতির সংগে।

হারবি মেয়োনিজ

উপকরণ :

১টি ডিম
১ চায়ের চামচ নুন
১ চায়ের চামচ চিনি
৩টি কাঁচা লঙ্কা
কয়েকটি পুদিনা পাতা
১ কাপ পোস্টম্যান তেল
১ চায়ের চামচ লেবুর রস
৫০ গ্রাম ক্ষীরা (ঝিরিঝিরি করে কাটা)
কয়েকটি ধনেপাতা
১ চায়ের চামচ সরষে
আধ চায়ের চামচ গোলমরিচ।

প্রণালী :

১। তেল, লেবুর রস, ক্ষীরা বাদে সব উপকরণগুলো মিক্সারে দিন।

২। মিক্সার চলাকালীন ফোঁটা ফোঁটা তেল ঢালতে থাকুন মিশ্রণটি ঘন না হওয়া পর্যন্ত।

৩। লেবুর রস আর ক্ষীরা মিশিয়ে দিন।

৪। ঢেলে দিন –

ক। সেদ্ধ ফুলকপির উপর
খ। স্যালাডে
গ। ফিস ফ্রাইয়ে
ঘ। কোল্ড কাটসে (হ্যাম, চিকেন, মাছ প্রভৃতি)

ঙ। প্রন ককটেল করতে হলে ট্যাবাস্কো সস মিশিয়ে নিন মশলার গন্ধের জন্য।

আহমেদ মিলসের সৌজন্যে

প্রথম মেয়ে চৌকিদার দ্রবময়ী দাসী

ঘটনাটি বিংশ শতাব্দীর অনেক আগে প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটেছিল। বাঙালি স্বাস্থ্যবতী বিধবা মহিলা – কোলে একটি ছোট্ট শিশু নিয়ে অসহায় অবস্থায় তার গ্রামের কিছু লোকের সংগে শহরে পুলিশ সাহেবের দপ্তরে এসে দরখাস্ত নিয়ে ধর্না দিয়েছে। দরখাস্তের বয়ান দেখে, প্রথমে তো পুলিশ বাবুরা হেসেই অস্থির। মহিলাটি গ্রামের চৌকিদারির চাকরি চায়। এ কি ছেলেখেলা নাকি! চৌকিদারির কাজ করবে মেয়েছেলে! আবাদী দুর্গাপুর গ্রামের দ্রবময়ী দাসীর চৌকিদারের চাকরির দরখাস্ত দেখে পুলিশ বাবুরা তো হাসবেনই।

বর্ধমান জেলার কালনা বিভাগের মধ্যে মহম্মদ আমিনপুর পরগনায় উটরো বা আবাদী দুর্গাপুর একটি ছোট্ট গ্রাম। শুধু মুসলমান ও নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বাস। দ্রবময়ীর স্বামী বৈকুণ্ঠ সর্দার সেই গাঁয়ের চৌকিদার। বৈকুণ্ঠের একমাত্র ছেলে তার শিশুপুত্র রংগলালকে বাবা-মার কাছে রেখে অল্প বয়সেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে। আর এর কিছুদিন পরেই বৈকুণ্ঠ সর্দারও মারা যায়।

পুত্রশোক সামাল দিয়েও দ্রবময়ী নাতি রংগলালকে নিয়ে স্বামীর দুঃখ কষ্টের সংসার হাসিমুখে চালাচ্ছিল। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর সংসার একেবারে অচল হয়ে উঠল। নিজের পোড়া পেট তো আছেই তার উপর অবুঝ শিশু নাতি রংগলালকে বাঁচানোর চিন্তাই দ্রবময়ীকে অস্থির করে তুলল। মনে এক অটল প্রতিজ্ঞা ছিল, যেমন করেই হোক গ্রামের চৌকিদারির কাজটি চাই-ই।

চৌকিদারির কাজকর্মও দ্রবময়ীর কিছু জানা ছিল। স্বামীর অসুস্থতার সময় মাঝে মাঝে দ্রবময়ী কর্তৃপক্ষের অগোচরে এ কাজ করত। গ্রামের কিছু লোক তা জানত। বৈকুণ্ঠ স্ত্রীকে লাঠিখেলাও শিখিয়েছিল। তার তো চৌকিদারির চাকরি। বাড়িতে দ্রবময়ী একা থাকে। বিপদের কথা তো বলা যায় না কিছু। তাই দ্রবময়ীর আগ্রহ দেখে বৈকুণ্ঠও নিষ্ঠা নিয়ে লাঠিখেলার সব রকমের কসরত স্ত্রীকে শিখিয়ে দিয়েছিল। মনে মনে দুর্জয় প্রতিজ্ঞা আর নিজের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে তাই দ্রবময়ী গ্রামের কয়েকজন লোকের সহায়তায় নাতিকে নিয়ে হাজির হল কালনা শহরে।

কালনার পুলিশ মহল প্রথমে হতবাক হয়েছিল দ্রবময়ীর কথা শুনে। অনেক সাধ্যসাধনার পর কিছুটা উপহাসের পাত্রী হয়েই তার আবেদনপত্র নিয়ে পুলিশ সাহেবের ঘরে ঢুকতে পেরেছিল দ্রবময়ী। কিন্তু সেখানেও এক নাটকের শুরু। কারণ, সে যুগে বিধবা বাঙালি মহিলা নিজে এমন এক চাকরির আবেদন নিয়ে এসেছে, যে চাকরিতে জবরদস্ত লাঠিয়াল পুরুষ ছাড়া পুলিশ কর্তৃপক্ষ অন্য কাউকে কল্পনাই করতে পারেন না।

বেশ কিছু সময় দ্রবময়ীর দরখাস্তখানা সবার হাতে হাতে ঘোরে। দ্রবময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে পুলিশের বড়কর্তা অনেকক্ষণ কী যেন চিন্তাও করেন। দ্রবময়ীর কাতর আকৃতিভরা মুখে অনেক কিছুই লেখা রয়েছে। পুলিশের বড়কর্তা কিন্তু অন্য সবার মতো দ্রবময়ীকে উপহাসের পাত্রী বলে মনে করতে পারেন না। সাহেবের কাছ থেকে সাহস পেয়ে নিজের মনে আরও সাহস সঞ্চয় করে দ্রবময়ী। তারপর নাতি রংগলালকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে গড়গড় করে তার দুঃখের কথা বলে যায়। সব শেষে তার লাঠিখেলার কথাও জোর দিয়ে বলে।

দ্রবময়ীর মুখে সব শুনে, কালনার পুলিশ সাহেব দরখাস্তের অনুকূলে সুপারিশ করে বর্ধমানের বড় পুলিশ সাহেবের কাছে দ্রবময়ীকে পাঠিয়ে দেন। বর্ধমানেও কালনার মতো একই নাটকের প্রথম অঙ্ক শুরু হয়। শেষে দ্রবময়ীর দৃঢ়তাপূর্ণ কথা শুনে আর হাতের দরখাস্তে কালনার পুলিশ কর্তৃপক্ষের সুপারিশ দেখে বর্ধমানের পুলিশ সাহেবও ব্যাপারটা ফেলনা মনে করতে পারেন না। তবে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সংগে পরামর্শ করে তিনি দ্রবময়ীকে জানালেন যে, চৌকদারির কাজ তো তাকে দিয়ে হবে না, খুব দক্ষ লাঠিখেলা জানা লোকই এ কাজ পেতে পারে। দ্রবময়ী একে তো মহিলা তাছাড়া সে যে প্রকৃতই লাঠিখেলা জানে সেটা তাকে পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।

পুলিশ সাহেবের কথা শুনে দ্রবময়ীর দুই চোখ আনন্দে জ্বলে ওঠে। ঠাকুর তাহলে সত্যি কৃপা করলেন। দ্রবময়ী নিজেও তো এই চাইছিল। যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েই সে চৌকিদারির কাজ চায়। মুহূর্তে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। চারপাশের গ্রামের মানুষ ভেঙে পড়ল মেয়েছেলের লাঠিখেলা দেখার জন্য।

এ প্রসংগে ১৯১৮ খ্রিঃ 'আর্যাবর্ত' পত্রিকায় একটি সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। তার মধ্যে সেদিনের দ্রবময়ী দাসীর লাঠিখেলার ঘটনার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'আর্যাবর্ত' লিখছে: 'পোলিস সাহেব দরখাস্ত পাইয়া মহাখুসী। তৎক্ষণাৎ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে দৌড়িয়া গিয়া খবর দিলেন যে, এক বাঙ্গালী মেয়ে লাঠি খেলায় পরীক্ষা দিয়া, তাহার স্বামীর চৌকিদারী চাকরি লইতে আসিয়াছে। জেলায় মহা গোল উঠিল। দুই কর্ত্তায় দুইখানা কেদারা আনাইয়া কাছারীর মাঠে বৈঠক করিলেন। আর দাঁড়াইয়া আছেলে মামলা কেরানী আমলা সহস্র লোক। সকলেই আজি মজা দেখিবে।'

দ্রবময়ীও দমবার পাত্রী ছিল না। চারদিকের উপহাস আর অবজ্ঞা মাথায় নিয়ে নাতি রংগলালকে গ্রামের এক প্রতিবেশীর কোলে দিয়ে দৃপ্ত ভংগিতে কোমরে কাপড় জড়িয়ে সাহেবদের সামনে প্রথমে হাঁটুগেড়ে বসে সেলাম করল। বিনীতভাবে সাহেবদের উদ্দেশে বলল, 'হুজুর, একা একা তো লাঠিখেলা হয় না। কেহ আমার সংগে খেলিতে আসুক, আজ্ঞা করুন।'

দ্রবময়ীর কথায় এক হাসির হুল্লোড় বেধে গেল। বলে কী মেয়েছেলেটি? ওর সংগে লাঠি খেলতে যাবে কে? ভিড়ের মধ্যে যে সব পুলিশ কনস্টেবল ছিল তারা সবাই লাঠিখেলায় বিশেষ পারদর্শী, কিন্তু দ্রবময়ীর কথা শুনে তারা হেসে গোঁফে মোচড় দিতে লাগল। এ প্রসংগে 'আর্যাবর্ত' লিখছে: 'দ্রবময়ীর আহ্বানেও কেহই আসিতে চায় না। আওরতের সংগে খেলিতে গিয়া কি সম্ভ্রম নষ্ট করিবে? শেষে পোলিস সাহেবের সঙ্কেতে একজন কনেষ্টবল অগ্রসর হইল। ঠকাঠক, ঠকাঠক – কনেষ্টবল বড় ধূর্ত; কান্ডখানা একটা প্রহসনের মত করিয়া তুলিল। সর্দারণী তাহা বুঝিল, বলিল, হুজুর, আমাকে কি সং সাজাইয়া তামাসা দেখিতেছেন? এ কি লাঠিখেলা হইতেছে?

'পোলিস সাহেব আবার আর একরূপ সংকেত করিলেন। ঘড়ি দেখিলেন – দশ মিনিট খেলা হইল। সর্দারণীর লাঠি কনেষ্টবলের লাল পাগড়ি স্পর্শ করিল। সাহেব খেলা বন্ধ করিয়া সর্দারণীর প্রশংসাবাদ আরম্ভ করিলেন। সর্দারণী কিন্তু এখনও সন্তুষ্ট নহে, করজোড়ে বলিল, 'খেলোয়াড় দুইজন আমাকে মারিতে আসুক, দেখুন আমি নিজেকে সামলাইতে পারি কি না?' তাহাই হইল। দুই দিক হইতে দুইজনে আক্রমণ করিতে আসিল; দ্রব দুই গাছা লাঠি দুই হাতে লইয়া তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিল। পাঁচ মিনিট পরে সাহেব খেলা বন্ধ করিলেন।'

এ ঘটনা আজ থেকে একশ তিরিশ বছর আগে ঘটেছিল। কিন্তু আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মানুষ যখন চাঁদের দেশে পাড়ি জমানোর কথা ভাবছে তখনও প্রকাশ্য দিবালোকে একজন মধ্যবয়সী বিধবা মহিলাকে লাঠিখেলায়, দুইজন ওস্তাদ লাঠিয়াল পুলিশ কনস্টেবলকে পরাজিত করতে দেখলে আমাদের চোখেও আর অবজ্ঞা বা উপহাসের দৃষ্টি থাকবে না। আমাদের চোখে বিস্ময়ের আভা মিলিয়ে সম্ভ্রমের দৃষ্টি ফুটে উঠবে। শুধু তাই নয়, তাঁকে আমরা সসম্মানে বিজয়িনীর ভূমিকায় রেখে পুরস্কৃত করব। সরকারের তরফ থেকে নামী খেতাবও জুটে যাবে।

দ্রবময়ী দাসীর বেলাতেও কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যে সব দর্শক কিছুক্ষণ আগেও তাকে মেয়েছেলে বলে অবজ্ঞা করেছিল তারাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চিৎকার করে উঠল বাহবা দিয়ে। ব্রাহ্মণেরা পৈতে হাতে দ্রবময়ীকে আশীর্বাদ করলেন। পুলিশ সাহেব বিস্মিত হতবাক দৃষ্টি সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমার মরদ কা কামমে তুম বহাল হুয়া।' অর্থাৎ দ্রবময়ী দাসী চৌকিদারির কাজটি পেয়েছিল। চাকরি ছাড়াও দ্রবময়ীর ভাগ্যে আরও পুরস্কার জুটেছিল সেদিন। পুলিশ সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সংগে পরামর্শ করে ঘোষণা করেছিলেন, 'তুমারা বকশিস দশ রূপেয়া।' একটু থেমে আবার বলেছিলেন, 'A Seer of Methai for The Grand Child'.

এই ভাবে তখনকার পুরুষশাসিত সমাজে দ্রবময়ী দাসী নামে একজন সাধারণ মহিলা অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে মৃত স্বামীর চাকরিতে নিজে বহাল হয়েছিল।

কমল লাহিড়ী

জন্মবোকা

রতন ভট্টাচার্য



বেরোতে বেরোতে দেরি হয়ে গেল। নটার মধ্যে বেরিয়ে পড়ব ভেবেছিলুম, এখন প্রায় পৌনে দশটা। আমাদের আর তাড়াতাড়ি হয় না। কাপড় পরতেই আধঘন্টা। খুলছি আর পরছি। কুঁচি ঠিক হয় তো আঁচল ঠিক হয় না, অ'াচল ঠিক হয় তো কুঁচি না। তারপর চুল। তারপর একটু আলগা প্রসাধনী। সময় যে কী ভাবে পার হয়ে যায় কে জানে। তবু আমি অ্যাভারেজ বাঙালি মেয়ের চেয়ে সর্ববিষয়ে আলাদা। দশ বছর বাইরে কাটিয়ে সম্প্রতি ফিরেছি। আমারই যদি এত দেরি হয় তো অন্য মেয়ের না জানি···। হায়রে! তাও যদি বিয়ে বাড়ি হত। যাব খিদিরপুর, ননদের বাড়ি।

গলি দিয়ে হন হন করে হেঁটে আমি বড় রাস্তায় পড়লুম। বড় রাস্তার ভিড় ঠেলে আরও মিনিট দশেক হাঁটলে বাস পাব। মিনি বাস। সাধারণ বাস বড় রাস্তায় পড়লেই পাওয়া যেত। কিন্তু তাতে উঠলে ধর্মতলায় গিয়ে বাস পালটাতে হত। তার ওপর আছে অমানুষিক ভিড়। ফুটবোর্ডে পা দিয়ে চিড়েচ্যাপটা। দশ বছর আগে যখন বিদেশে যাইনি, তখন এই ভিড় ঠেলেই কলেজ-টলেজ গেছি। বাইরে থেকে ঘুরে আসবার পর আজকাল আর পারি না। ট্যাক্সি হলে ভাল হয়। কিন্তু একদম একলা ট্যাক্সিতে উঠতে আমার কীরকম ভয় করে।

আসলে ব্যাপারটা আর কিছুই না, এ হল এক ধরনের দুর্জ্ঞেয় পুরুষভীতি। একটা ঘেরা জায়গায় একজন পুরুষের সঙ্গে একলা হলেই অবচেতনের অন্ধকারে থেকে ভুস করে ভেসে ওঠে ভয়টা। পৃথিবীর প্রথম মেয়েমানুষ থেকে এই ভয় সংস্কারের মত আমি রক্তে বহন করে নিয়ে বেড়াচ্ছি। জঙ্গলে পা দেওয়ামাত্র কি ঘাড়ে বাঘ সিংহ লাফিয়ে পড়ে? পড়ে না। কিন্তু জঙ্গলে যতক্ষণ থাকা যায়, মেশিন চালিয়ে দেবার মত একটা ভয় সর্বক্ষণ চলতে থাকে মনের মধ্যে। এই ভয়ও অনেকটা সেইরকম।

তবু আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বড়ই বেমানান। আমার বয়েস তিরিশ। কুড়ি বছর বয়সে বি এ পরীক্ষার পরই বিয়ে হয়ে যায় আমার। তারপর দশ বছর বিদেশ বাস। হ্যাঁ, আমার তিরিশ। তিরিশ বছর বয়সের একজন বিবাহিত মেয়ের অবচেতনের এই পুরুষভীতি বড্ড বেমানান। হাস্যকরও বটে। সব মেয়ের হয় না এরকম। বিদেশ যাওয়া দূরে থাক, একদিনের জন্যে কলকাতার বাইরে যায়নি, এমন মেয়েকেও আমি দেখেছি দারুণ ডাকাবুকো হয়। আমার বড় ননদ নিভাই তাই। সে অবশ্য কলকাতার বাইরে গেছে। সারা ভারত চষে বেড়িয়েছে। কথা বলে যেন পুরুষের বাবা। সে শুনেছি ছোটবেলা থেকেই ওইরকম। নিভার কথা স্বতন্ত্র। তার বাবা রাজনীতি করতেন। ছেলেদের সুবিধে করে উঠতে পারেননি। বড় ছেলে হয়েছে ডাক্তার। ছোট ইঞ্জিনিয়ার। কেউ রাজনীতির ধার মাড়ায়নি। তাই মেয়েকে নিজের মনের মত করে গড়ে তুলেছিলেন। নিভার কথা তাই আলাদা। ছোটবেলা থেকে তার ট্রেনিং ছিল। কিন্তু আমার ছোটজনা শিপ্রার কোনো ট্রেনিং নেই। সে রাজনীতি করেনি জীবনে। কলকাতার বাইরে যায়নি। তা সত্ত্বেও প্রায় নিভার মতই নির্ভীক ও বাকপটু। যাকে বলে

ওস্তাদ মেয়ে, তাই। এমন কাজ নেই পারে না। যত গোলমাল আমাকে নিয়ে। আমি যেন কিরকম। মাঝে মধ্যে নিজেই বুঝে উঠতে পারি না ব্যাপারটা। দশ বছর বিদেশে কাটিয়ে এলুম, কত দেশ, কত মানুষ দেখলুম, তবু এখনও একা একা ট্যাক্সিতে উঠতে কেন যে আমার···।

হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল আমার। ফিটফাট জামাকাপড় পরা বয়স্ক ভদ্রলোক। তা সত্ত্বেও ভদ্রলোকের কনুইয়ের গুঁতোয় ব্যথা পেলুম খুব। উনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সরিটরি বললেন। তারপর চলে গেলেন। আমার মনে হল ধাক্কাটা উনি ইচ্ছে করে মেরেছেন। বেশ রাগ হয়ে গেল। কিন্তু ওর মুখের দিকে একবার তাকানো ছাড়া আমি কিছু বলতে পারলুম না। বরং নিজের ওপরেই বেশি রাগ হল। কেন ওভাবে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে রাস্তা হাঁটছিলুম? অন্যমনস্ক না থাকলে লোকটা ধাক্কা মারার সুযোগ পেত না। লোকটা চলে যেতে রাগের গলায় বলে উঠলুম, 'অসভ্য, ইতর কোথাকার।' বলে নিজেই হেসে ফেললুম। তারপর আবার রাস্তা হাঁটতে লাগলুম আগের মত।

কুড়ি পঁচিশ বছর আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ কোনো মেয়ে কোনো পুরুষকে উদ্দেশ্য করে 'অসভ্য, ইতর' বললে পুরুষটির চারপাশে সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে যেত। সময়মত পিঠটান দিতে না পারলে অপরাধী পুরুষটির লাঞ্ছনার সীমা থাকত না। আর এখন? এখন এসব ব্যাপার কেউ গ্রাহ্য করে না। লোকটা শুধু আচমকা কনুই দিয়ে ধাক্কা মেরেছে। সামান্য ব্যাপার। ইচ্ছে করলে সে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঠকাস করে একটা চুমু খেতেও পারত। কেউ কিছুই বলত না।

হাসি পেয়ে গেল আমার। চিন্তাটা বড় বিপজ্জনক। মনে হতে পারে লোকটা আমাকে ধাক্কা মারার পর আমি বোধহয় রাস্তার পুরুষদের কাছে ওইরকম কিছু আশা করেছিলুম। মোটেও তা নয়। একজন মেয়ের পক্ষে ওই পরিস্থিতিও খুব লজ্জার। আমার হলে আমি লজ্জায় মরে যেতুম। প্রকাশ্য দিনের আলোয় হাজার পুরুষের চোখের সামনে একটা লোক আমায় জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে, দৃশ্যটা মনের মধ্যে অস্পষ্ট কল্পনা করেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। বুকের কাপড় সামলালুম। আঁচল চেপে মুখ মুছলুম।

আসলে কি হয়েছে আমি জানি। দু মাসের ছুটি কাটিয়ে আমাকে আর কৌশিককে এখানে ফেলে রেখে ধীরেন প্রথমে ফিরে যাবার পর থেকে নিরাপত্তার একটা গভীর অভাববোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আমার মধ্যে। এখানে এভাবে পড়ে থাকতে চাইনি আমি। কৌশিকের পড়াশুনোর জন্যে সে প্রায় জোর করে রেখে গেছে আমাকে। ব্যাপারটা ঘটালেন বাবা। ছেলেকে ডেকে বললেন, 'তুই তো দু বছর বাদেই ফিরছিস। এ দু বছর বউমা কৌশিককে নিয়ে এখানে থাক। ছ বছর বয়স হল কৌশিকের। এখন স্কুলে না দিলে পরে অসুবিধে হবে।' তবু আমি থাকতে চাইনি। বলেছিলুম, 'দু বছর আমি নির্বাসনে একলা থাকতে পারব না। কৌশিককে সেখানেই ভর্তি করে দেব চল।'

মাথা নেড়ে ধীরেন বলেছিল, 'উঁহু। সেখানে ভর্তি করলে ওর দুটো বছর আননেসেসারি নষ্ট হবে।'

'কেন নষ্ট হবে? এখানে এসেও আমরা ওকে ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করে দেব।'

কথাটা বলেছিলুম বটে, কিন্তু আমি জানতুম ধীরেন ইংলিশ মিডিয়ামের ওপর হাড়ে হাড়ে চটা। বাবাও তাই। বাবা স্বাধীনতা-সংগ্রামী। ইংলিশ মিডিয়ামের নাম শুনেই রেগে আগুন হয়ে যান। বলেন, 'ইংলিশ মিডিয়াম। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! জান, স্বাধীনতার আগে কারা পড়ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে? অনাথ বালক, মানে অরফ্যান। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মানেই ছিল অরফ্যানেজ। আমার নাতি পড়বে সেই স্কুলে?' ধীরেন বলে, 'কেন? আমরা দু ভাই যে ইংরেজী স্কুলে পড়িনি, আমরা কি বয়ে গেছি? প্লেন বাংলা স্কুলে পড়েই আমার ভাই ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, আমি ডাক্তার।' এ সব কথা জানা ছিল আমার। তা সত্ত্বেও এখানে দু বছর একলা পড়ে থাকবার কথায় আমার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তাই বলেছিলাম। কিন্তু কাজ হয়নি কোনো। ধীরেন হো হো করে হেসে উঠে বলেছিল, দূর দূর! তুমি একটা ওয়ার্থলেস। নিজের দেশে থাকবে, তোমার কিসের নির্বাসন? নির্বাসন আমার। বুঝেছ?'

এরকম যে হবে আমি জানতুম। আমার উচিত ছিল থাকতে না চাওয়ার আসল কারণটি বলে দেওয়া। আমাদের ওই এক মুশকিল। সব সময় সব কারণ আমরা জানাতে পারি না। কেন পারি না কে জানে? তবে দু দুটো বছর যখন একলা থাকতে হবে, কম সময় তো না, তখন বোধহয় সেই কারণটাও জানান উচিত ছিল। 'দেখ, নির্বাসন-টির্বাসন যে একেবারে বাজে কথা, তা বলব না। বিয়ের পর তোমাকে ছেড়ে থাকিনি কোনদিন। নির্বাসন মনে হতেই পারে। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ের কথা তরুণদা। এবারে আসা অবধি তরুণদার হাবভাব, চোখমুখ, কথাবার্তা আমার ভাল লাগছে না।'

'কেন?'

'মনে হচ্ছে তরুণদা না', কথাটা বলতে গিয়ে একবার ঢোক গিলতে হল আমাকে, 'তরুণদা না আমার প্রেমে পড়ে গেছে।'

'পড়তেই পারে। তুমি একটা সেন্ট-পারসেন্ট মেয়েমানুষ। পিওর মেয়েমানুষ বলতে যা বোঝায়, তাই। সতেরো থেকে সত্তর যে কোনো বয়সের পুরুষমানুষ তোমার প্রেমে পড়ে যেতে পারে। তাতে তোমার কি?'

'বাঃ। ভয় করে না? তুমি থাকতে আর একটা লোক আমার প্রেমে পড়ে যাবে?'

'যাবে। একটা কেন? একশোটা লোক যাবে। তাতে তোমার বিচলিত হবার কিছু নেই। তুমি আনকনসার্নড থাকলেই হল।'

'আনকনসার্নড থাকব?'

'নিশ্চয়ই। সূর্যোদয়ের মত, সূর্যাস্তের মত, ঝড়ের মেঘের মত আনকনসার্নড থাকবে তুমি।'

গোটা কথোপকথনটা আমি কল্পনা করলুম। চলতে চলতে কথোপকথনটা কল্পনা করলুম বটে, কিন্তু ধীরেনের মুখে বসানো একটা কথাও আমার বানানো নয়। এই প্রসঙ্গে না হোক, অন্য প্রসঙ্গে বিদেশে কথাগুলি যে আমাকে নানা সময়ে বলেছে এবং তার উপদেশমত আমার পক্ষে সব সময়ে আনকনসার্নড থাকা যে সম্ভবপর হয়েছে, তাও নয়। কিন্তু সেটা ছিল বিদেশ।

দেশের মাটিতে ব্যাপারটা একটু আলাদা। চারপাশের সবাই এখানে নিকট আত্মীয়। আমি যেখানে থাকব আমার সেই শ্বশুরবাড়িতে আছে শ্বশুর, ছোট জা, দেওর। বড় রাস্তায় পড়ে উল্টোদিকে মিনিট পনেরো হাঁটলে আমার বাপের বাড়ি। সেখানে আছে বাবা মা, দাদা বউদি আর দাদা বৌদির দু মেয়ে। এছাড়া আছে চারপাশের প্রায় আত্মীয়ের মত পরিচিত জন। এখানে নীতি দুর্নীতির সীমান্ত অনেকটা সুদৃঢ়। সেই সীমান্ত লঙ্ঘন করতে বুক কেঁপে ওঠে।

ব্যাপারটা আর একটু গুছিয়ে বলা দরকার। তরুণদা নামের যে মানুষটি আমার প্রেমে পড়েছে বলে আমার ভয়, সে মানুষটি আমাদের বাড়িওলার বড় ছেলে। বয়েস পঁয়তাল্লিশ। বিবাহিত। বছর তেরো বয়সের একটি মেয়ে আছে। আজ থেকে পনেরো বছর আগে যখন আমার বিয়ে

হয়নি, তরুণদা আমাকে চার বছর গান শিখিয়েছিল। আমার সেই বয়ঃসন্ধিকালে সুপুরুষ এই মানুষটা ছিল আমার ভগবানের মত। তখন তার একটি মুখের কথায় তাকে সব দিতে পারতুম। কিন্তু অহংকারী তরুণদা সে সময় আমার দিকে ফিরেও তাকায়নি। যথাসময়ে নিজে বিয়ে করেছিল এবং প্রেম করেই। তার ওপর তাদের ভাড়াটের ছেলে ধীরেনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধও এনেছিল সে। ডাক্তারী পাশ করার পর বিদেশ যাবার সমস্ত ঠিকঠাক করে বিয়ে করেছিল ধীরেন। বিয়ের পরে পরেই তাই বিদেশ চলে যেতে হয়েছিল আমাকে। তরুণদার নিচতলায় খুব বেশিদিন থাকতে হয়নি। মাঝখানে ছুটিতে বার দুয়েক এসেছি বটে, কিন্তু সে মোটে দু মাসের জন্যে। ফলে ইতিমধ্যে আমার প্রেমে পড়ার সুযোগ হয়নি তার। কিন্তু এবারে আসার পর কি হল কে জানে, তরুণদা যেন আমাকে নতুন করে আবিষ্কার করল। যে মানুষটা তার তিরিশ একত্রিশ বছর বয়েস থেকে একটানা চার বছর আমায় গান শিখিয়েছে, পঁয়তাল্লিশে পা দিয়ে সে যেন এই প্রথম আমাকে চোখ তুলে দেখল।

প্রথম দিকে যা ছিল অস্পষ্ট, আমার অনুমান মাত্র, যাবার আগে তাকে পাকিয়ে তুলে দিয়ে গেল ধীরেন। তার স্বভাবটাই এরকম। বরাবরের ফাজিল। আমাকে নিয়ে বিদেশে সে ফাজলামির চূড়ান্ত করেছে। ফাজলামির সময় কোনো জ্ঞানগম্যি থাকত না তার। ভেবেছিলুম দেশে ফিরে নিশ্চয়ই সে সব করবে না। প্রথম দিকে করেওনি কিছু। পয়সা একটু কম লাগবে বলে আমরা বাংলাদেশ বিমানে ঢাকা হয়ে কলকাতা এসেছিলুম। আগের দুবার এসেছিলুম দিল্লি হয়ে ভারতীয় বিমানে। তাই ফিরেই সেই উদ্বৃত্ত পয়সায় বউছেলে নিয়ে টানা এক মাস চরকির মত ঘুরতে লাগল। আমরা প্রথমে গেলুম আমার দিদির বাড়ি খড়্গপুর। সেখান থেকে ফিরে এসে বলল, 'দুবার বেনারসের ওপর দিয়ে এলুম গেলুম, একবারও নামা হল না। চল, বেনারস ঘুরে আসি।' গেলুম। কথা ছিল দিন পনেরো থাকব। কিন্তু সাতদিনের বেশি থাকতে পারল না। সাতদিনের মাথায় বলল, 'বড্ড ধর্ম চারদিকে। এমন নোংরা শহরে থাকা যায়?' ফলে আটদিনের দিন সেখান থেকে সোজা আসামের জোড়হাট। ওর এক বন্ধু সুপ্রভাত গত বছর বিদেশ থেকে ফিরে ও এন জি সি তে চাকরি নিয়ে জোড়হাটে আছে। জোড়হাটে আমরা পনেরোদিন ছিলুম। আমরা ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে বিদেশ থেকে ফিরেছিলুম। তারপর এই-সব ভারতদর্শনে মাসখানেক কেটে যাবার পর জানুয়ারি মাসের ফার্স্ট উইকে বিয়ারের বোতল হাতে ইজি চেয়ারে টান হয়ে শুয়ে ধীরেন বলেছিল, 'লিসন ভাই, আর আমাকে বিরক্ত কর না। যে কটা দিন দেশে আছি, বিয়ার খাব আর ঘুমোব।'

আমি হেসে বলেছিলুম, 'কিন্তু ভারত-দর্শনের যে এখনও একটু বাকি রইল।'

'সেটা কি?'

'ছেলেকে কি কর্পোরেশনের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করবে?' কোনো বড় স্কুলের অ্যাটাচড প্রাইমারিতে ভর্তি করা কিন্তু অত সোজা নয়। বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয় শুনেছি।'

ধীরেন বলেছিল, 'ওসব ভর্তিটর্তির মধ্যে আমি নেই। ও যা করার তুমি করবে।'

'আমি করব?'

'হ্যাঁ। আমি তরুণদাকে ডেকে বলছি, ও ব্যাপারটা তুমি আর তরুণদা মিলে করবে।' বলেই 'তরুণদা তরুণদা' বলে ডেকে চ্যাচামেচি ফেলে দিয়েছিল ধীরেন। সন্ধেবেলা। তরুণদা তখন ওপরে রেওয়াজ করতে বসেছিল। রেওয়াজ থামিয়ে নিচে নেমে এলে ধীরেন আমাকে দেখিয়ে বলেছিল, 'এই মেয়েটিকে তুমি এনে দিয়েছিলে দাদা। বলেছিলে, আমার ছাত্রী। খুব ভাল মেয়ে! আমি এখন সুদসমেত তাকে ফেরত দিচ্ছি। পার্মানেন্টলি নয়। দু বছরের জন্যে। তুমি এই দু বছর ওদের দেখবে। অতি যত্নে পালন করবে। আর এখন যেভাবে পার সুদটিকে একটি ভাল স্কুলে ভর্তি করে দাও দাদা। অ্যাটাচড প্রাইমারি আছে এমন স্কুলে। যেন ফাইভে উঠলে আর নতুন করে ভর্তি করার ঝামেলা না হয়।'

তরুণদা বলেছিল, 'কেন? তুই কি করবি?'

'আমি? কিছু মনে কর না দাদা। যে একমাস আর থাকব এখানে, আমি শুধু বিয়ার খাব আর ঘুমোব।'

তা খাক। বিয়ার খাক, হুইস্কি খাক, তাতে কিছু এসে যাবে না আমার। সেটা ওর নিজের লিভারের ব্যাপার। কিন্তু এটা কি করল ও? যে বাঘ আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে ওৎ পেতে আছে, তারই জিম্মায় তুলে দিল আমায়?

সেই শুরু। কৌশিককে ভর্তি করতে খুব যে অনেকদিন লেগে গিয়েছিল, তা নয়। বেশি হলে দিন চারেক। ফর্ম আনা অ্যাডমিশন টেস্ট, ভর্তি, একদিন একজন মাস্টার মশাইয়ের বাড়ি যাওয়া, সব মিলিয়ে চার-দিনও হবে না বোধহয়। তার মধ্যেই বাঘটা আমাকে হালুম করে খেয়ে ফেলতে চাইল। কিন্তু পারল না। কেন না ধীরেন তখনও এখানে। মাসখানেক হল ধীরেন গেছে। বাঘটা সেইরকমই হালুম অবস্থায় মুখব্যাদান করে আছে। তবে সময় এবং সুযোগের অভাবে গিলে ফেলতে পারেনি। একদিন ফেলবে ঠিক। কড়মড় করে চিবিয়ে খাক কি গিলে ফেলুক, তরুণদা আমাকে খাবেই।

বাসস্ট্যাণ্ডে এসে গেলাম। রাস্তাটা এখানে একটু হঠাৎ চওড়া হয়ে গেছে। বাঁ দিকে ছোট মাঠ। মাঠের গায়ে কালীমন্দির।

ফেব্রুয়ারির শেষ। যাই যাই করেও ঠাণ্ডাটা একেবারে চলে যায়নি। আকাশ মেঘলা। আকাশে মেঘ থাকলে ঠাণ্ডা তেমন থাকে না। কিন্তু আজ ছিল। উত্তরদিক থেকে বেশ জোরালো হাওয়া বইছিল। বাসের লাইনের পেছনে দাঁড়িয়ে কালী মন্দিরের দিকে মুখ করে অভ্যাসমত কপালে হাত ঠেকিয়েছি, দেখি মন্দিরের সামনে কাঁঠাল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তরুণদা। আমাকে দেখতে পেয়ে হনহন করে হেঁটে এগিয়ে আসতে লাগল। অসম্ভব অবাক হলুম। যেখানে বাঘের ভয়, ঠিক সেখানেই সন্ধে। তরুণদা এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার জন্যে, আমি একদম ভাবিনি, বাড়ি থেকে বেরোবার সময় আমার যেন স্পষ্ট মনে হল ওপরে তরুণদার গলা পেলাম। সেই তরুণদা আমার আগেই এখানে পৌঁছে গেল কি করে? তবে কি ভুল শুনেছিলাম?

'এই নীপা, এতক্ষণে এলে?' তরুণদা কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল। 'নটা থেকে দাঁড়িয়ে আছি। কি যে কর না! তিনটে বাস ছেড়ে চলে গেল।' তার কণ্ঠস্বরের ব্যগ্রতায় আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমার একবার মনে হল খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কেন দাঁড়িয়ে আছেন তরুণদা?' কিন্তু পুরুষ মানুষের মুখের ওপর ঠিক কথাটা কবে আর বলতে পারলুম। উল্টে খুব হেসে যেন কত খুশি হয়েছি এই ভাবে বললুম, 'তাই? নটা থেকে দাঁড়িয়ে আছেন?'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল। এত দেরি হল কেন তোমার?'

'খুব দেরি হয়ে গেল?'

'হল না? তুমি সকালে ওপরে গিয়ে মীরাকে বললে নটায় বেরুবে, আর এখন দশটা।'

'সকালে বাড়িতে ছিলেন আপনি?'

'কোথায় যাব?'

'আজ আপনার গান শেখানো ছিল না?'

'না।' আমি লিখছিলাম। লিখতে

লিখতে শুনলাম তুমি মীরাকে বলছ নটায় বেরুবে। মিনিবাসে যাবে। আমার একটু ডালহৌসি স্কোয়ারে কাজ ছিল। ভাবলুম এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। আমি সময়মতই বেরিয়েছিলুম, কিন্তু তুমি এলে এক ঘণ্টা পর।' বেশ আহত ভঙ্গিতে হাসল তরুণদা। আমার মনে হল যেন সত্যি সত্যি তাকে কথা দিয়ে আমি কথা রাখতে পারিনি। তরুণদা বলল, 'আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না গো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছি। চল বাসে গিয়ে বসি।'

'চলুন' বলে আমি সামনের বাসটার দিকে এগোচ্ছি, তরুণদা বলে উঠল, 'পেছনের-টায় এস।' পেছনেরটাতেই উঠলাম।

এ বাসটা একদম ফাঁকা। আমি সীটের ভেতরে ঢুকে জানলার ধারে বসলুম, তরুণদা বলে উঠল, 'তোমাকে আজ দারুণ দেখাচ্ছে নীপা!' ঝপাস করে গা ছেড়ে দিয়ে পাশে বসল তরুণদা। বসে পড়ে বলল, 'শাড়িটাও সাংঘাতিক পরেছ আজ। কে কিনেছে এটা? কার চয়েস? তোমার না কর্তার?'

মুখে বললাম, 'দুজনেরই।' তরুণদা পাশে বসার সময় আমাকে মোটেই সমীহ করে বসেনি। ইচ্ছে করে বেশ চেপেচুপেই বসেছিল। শরীরে যথেষ্ট ছোঁয়াছুঁয়ি হচ্ছিল আমাদের।

'নীপা।' একটু চুপ করে থেকে তরুণদা হঠাৎ আমাকে খুব গভীর গলায় ডেকে উঠল।

'অ্যাঁ।' আমি চমকে উঠে মুখ ফেরালুম।

'আমাকে বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়ে যাওনি?'

'হ্যাঁ। তা একটু হয়েছি।'



'তোমার মনে হয়নি কেন শুধু শুধু তরুণদা এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে গেল আমার জন্য? বাড়িতেই তো দেখা হত। বাস স্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা কেন? মনে হয়নি নীপা?'

মনে যাই হক, আমি হুঁ হাঁ কিছু করলাম না। শুধু তাকিয়ে রইলাম। তরুণদা বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে একটু আলাদা দেখা করতে চাইছিলাম নীপা।'

আমার তো সবই জানা। তা সত্ত্বেও ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলাম, 'কেন বলুন তো?'

'কদিন ধরে তোমাকে একটা-কথা বলবার জন্যে আমি মরে যাচ্ছিলাম। তোমাকে আমি কতকাল ধরে চিনি। তুমি বরাবরই দারুণ সুন্দরী। তোমার ফর্সা রোগা মুখটায় একটা সাংঘাতিক আকর্ষণ আছে। কিন্তু কোনদিন কিছু মনে হয়নি আমার। অথচ এবার তুমি বিদেশ থেকে ফিরতেই কি যে হল, কিছুতেই আর ধরে রাখতে পারছি না নিজেকে। তোমাকে আমি চাই নীপা। আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে না পেলে আমি···।' বাক্য শেষ করতে পারল না তরুণদা। তার আগেই কথা বলতে বলতে বাসে এক সঙ্গে তিনজন লোক উঠে পড়ল। আগের বাসটা একটু আগে ছেড়ে গেছে। এখন এটাতেই লোক উঠবে। লোক তিনজন উঠতে আমি যেন বেঁচে গেলুম। তরুণদা বাক্য শেষ করতে পারল না, কিন্তু সীটের আড়ালে আমার একখানা হাত এক মুহূর্তের জন্যে চেপে ধরে তার না বলা কথার বিষয়টুকু বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেল।

এরকম একটা কিছু যে ঘটবে তা আমার অনেকদিন ধরেই জানা। প্রায় দু মাস। তা সত্ত্বেও ভয়ে সিঁটিয়ে গেলাম আমি। কি করব, না করব কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না। আগে থেকে কিছু ভেবে রাখিনি বলে খুব রাগ হয়ে গেল নিজের ওপর। নিজেকে মারতে ইচ্ছে করছিল আমার।

বাস ছাড়তে ছাড়তে দশটা কুড়ি হয়ে গেল। লোকজনে বোঝাই হয়ে গেছে বাস। বোঝাই বাসেও তরুণদা সর্বক্ষণ কথা বলে চলল। কিন্তু সেসব সাধারণ সাংসারিক কথাবার্তা। ধীরেনের চিঠি পেয়েছি কি না, সে বিদেশে কখনও আমাকে ছেড়ে থাকেনি, এবার নিশ্চয়ই তার আমাকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবে, সল্ট লেকে জমি কিনে ফেলে রেখেছি কেন, কেন বাড়ি করছি না, বিল্ডিং মেটিরিয়ালসের দাম যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, খুব মুশকিলে পড়ে যাবে ধীরেন, এইসব। তরুণদাটা অদ্ভুত। আমার ভেবে খুব মজা লাগল, যার বউ-এর কাছে এইমাত্র প্রেম

নিবেদন করল সে, তার জন্যেই তার কত চিন্তা। অবশ্য মজাটা স্থায়ী হল না। পরক্ষণেই ভয় এসে গ্রাস করে ফেলল আমাকে।

তার মানে এই নয় যে আমি বিয়ের পর মেয়েদের প্রেম ভালবাসার ঘোরতর বিরোধী। মোটেই তা নয়। বরং উল্টো। একটু-আধটুক প্রেম ভালবাসা হলে একজনের বউ হয়েও নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। অন্তত আমি পাই। বুঝতে পারি এখনও আকর্ষণ আছে আমার। বুড়ি হয়ে যাইনি এখনও। কিন্তু সে হল অচেনা মানুষ যদি হয়, তখন, মাঝে মধ্যে দেখা হবে এমন অচেনা মানুষের সঙ্গে সামান্য দুর্নীতি-টুর্নীতি করতে দেখেছি আমার নীতিবোধে আটকায় না। কিন্তু তাই বলে এক বাড়িতে থাকা অতি পরিচিত তরুণদার মত কারও সঙ্গে নয়। এইরকম ভয়ানক সম্পর্ক নিয়ে এক বাড়িতে থাকা খুব বিপজ্জনক। কিভাবে রেহাই পাব তরুণদার হাত থেকে তা নিয়ে অনেক ভাবলুম, তবু কিছুই মাথায় এল না। একমাত্র উপায় হল তরুণদাকে এই মুহূর্তে মুখের ওপর দু-চারটে শক্ত কথা শুনিয়ে দেওয়া। কিন্তু সে জিনিস আমি পারি না। আমার চরিত্রে নেই। তাছাড়া তরুণদাকে তো পারবই না। তরুণদা আমার বয়ঃসন্ধির ভগবান। তাকে কি শক্ত কথা শোনাতে পারি?

গাড়ি হুহু করে ছুটছিল আর ক্রমাগত বদল হয়ে যাচ্ছিল দুপাশের দৃশ্য। লোকজন উঠছিল আর নামছিল। শেষে যখন ডালহৌসি স্কোয়ারে হুড়মুড় করে সব লোক নেমে গিয়ে বাস প্রায় খালি করে দিয়েছে, তখন বিদ্যুৎ চমকের মত আমার মাথায় একটা নতুন ফন্দী এসে গেল। বেশ শক্ত ফন্দী। সফল হতে গেলে জোরালো অভিনয় জানা দরকার। কিন্তু কে না জানে সব মেয়েই অল্পবিস্তর অভিনয় জানে। মনে হল ঠিক পারব। একটু শুধু সময় এবং সুযোগের দরকার। এক বাড়িতে যখন থাকি তখন তাও পেয়ে যাব নিশ্চয়ই একদিন। হঠাৎ ভারী হালকা লাগল। বাসের ভেতর তাকিয়ে দেখলাম আমাদের বাদ দিয়ে মোটে আর তিনজন যাত্রী বসে আছে। পেছনের দুজনকে মনে হল অবাঙালি ব্যবসায়ী। হালকা গলায় নিজেদের ভাষায় কথা বলছিল তারা। ডানদিকে সামনের সীটটায় টান হয়ে বসেছিল একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। গাড়ি এসপ্লানেড পার হয়ে যায় দেখে আমি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলুম, 'তরুণদা নামলেন না? ডালহৌসি স্কোয়ার চলে গেল। এসপ্লানেড চলে যাচ্ছে। কোথায় নামবেন আপনি?'

তরুণদা খুব গম্ভীর স্বরে ফিসফিস করে বলল, 'তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও নামব না।'

শুনে বুকের মধ্যে যেন কি রকম করে উঠল আমার। কোনরকমে ঢোক গিলে বললাম, 'তার মানে?'

'তোমাকে মিথ্যে বলেছিলুম নীপা। আমার কোথাও কোনো কাজ নেই। তোমাকে খিদিরপুর নিভার ওখানে নামিয়ে দিয়ে বাসস্টপে বসে থাকব আমি। তুমি ফিরলে আবার বাসে চেপে একসঙ্গে ফিরব আমরা।'

আমি অস্বস্তির সঙ্গে বলে উঠলুম, 'সে কি! দিদি আমাকে কতক্ষণ আটকে রাখবে তার কি কোনো ঠিক আছে? কতক্ষণ বসে থাকবেন আপনি?'

'যতক্ষণ না ফিরে আস।'

হাসি পেয়ে গেল আমার। পুরুষদের এই সব বোকা বোকা কাণ্ডকারখানায় হেসে ফেলতে পারলে খুব কাজ হয় দেখেছি। চমৎকার হালকা হওয়া যায়। কিন্তু তরুণদা কষ্ট পাবে মনে করে হাসতে পারলুম না। খিদিরপুরে বাস থেকে নেমে বললুম, 'তা হয় না তরুণদা। আপনাকে আমি এখানে বসে থাকতে দিতে পারি না। আপনি আমার সঙ্গে চলুন।'

'তোমার সঙ্গে যাব?'

'হ্যাঁ। আপনি তো আর সে বাড়ির অপরিচিত নন। আমি বলব, আমার একা আসতে খারাপ লাগছিল, তাই আপনাকে সঙ্গে এনেছি।'

'না না। খবরদার বলো না ও কথা।'

'কেন?'

'কি দরকার মিথ্যে কথা বলার। তার চেয়ে বলো, এইখানে দেখা হয়ে গেছে তোমার সঙ্গে। বাস থেকে নেমে আমায় দেখতে পেয়ে তুমি জোর করে ধরে এনেছ।'

আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু দুটো বলার মধ্যে কি যে তফাত, তা ধরতে পারলুম না। বাস থেকে নেমে এখানে দেখা হয়ে গেছে, এটাও তো মিথ্যে কথাই। কাজটা করে ফেলে খুব অনুশোচনা হচ্ছিল আমার। তরুণদা এখন আর বনের বাঘ নয়, মানুষখেকো বাঘ। সম্পর্কের আড়ালটুকু ঘুচিয়ে দিয়ে মানুষখেকো হয়ে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে যা খুশি তাই করে ফেলতে পারে তরুণদা। কি দরকার ছিল আমার তাকে এভাবে ডেকে আনার।

এক বিঘে জমির ওপর চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা সাহেবি আমলের থামঅলা একতলা বাড়ি বড়দির। পেছনে ফলের বাগান। সামনে ফুলের। গেটে তালা লাগানো ছিল। কলিং বেল টিপতেই বড়দির চাকর কালিদাস গেট খুলে দিয়ে বলল, আরে 'মামীমা! আসুন আসুন। কিন্তু বাড়িতে তো কেউ নেই।'

'নেই মানে? কোথায় গেছে?'

'কালীঘাটে পুজো দিতে গেছে। কটা বাজে এখন?'

তরুণদা ঘড়ি দেখে বলল, 'এগারোটা পনেরো।'

'ও! তা হলে ফিরে আসবার সময় হয়ে গেছে। আসুন, ভিতরে আসুন। চা খান। আসুন মামাবাবু।' আলাদা করে তরুণদাকে ডাকল সে। 'এখুনি এসে যাবে সবাই।'

বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠল আমার। গলা শুকিয়ে কাঠ। এমন ফাঁকা বাড়িতে তরুণদার সঙ্গে ঢুকতে আমার যেন পা উঠছিল না। কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। তখন হঠাৎ আমার সেই ফন্দীর কথাটা মনে পড়ল। এই তো সুযোগ। সুযোগ এবং সময় দুইই আছে এখন। সেই ফন্দীটাই এখন একবার চেষ্টা করে দেখা যাক না। অনবরত কথা বলতে পারলে আমি দেখেছি ছেলেদের শারীরিক আবেগ কমে যায়। তৎক্ষণাৎ মনের জোর ফিরে পেলুম আমি। ফুলের বাগান আর পাম গাছের সারির মধ্য দিয়ে হেঁটে উঁচু রকে এসে উঠলাম আমরা। চারটে থামের আড়ালে রকের ওপর বড় বড় বেতের চেয়ার পাতা। কালিদাস আমাদের সেইখানে রেখে চা করতে গেল। বলল, 'বসুন মামীমা, বিশ্রাম করুন। আমি চা বানিয়ে নিয়ে আসছি।'

কালিদাস যাবার আগেই ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়লুম আমি। বাঘ যখন মানুষ-খেকো হয়ে ওঠে তখন তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিপজ্জনক। নিজে বসে তরুণদার হাত ধরে টেনে পাশের চেয়ারটায় তাকে বসতে বললাম। তরুণদা বসল। বসে পড়ে খুব উদাস গলায় বলল, 'জায়গাটা সত্যি সুন্দর নীপা। সারাজীবন এখানে তোমার পাশে এইভাবে বসে থাকা যেত।'

আমি একটু হেসে বললাম, 'মানুষের সব ইচ্ছে কি ফলে?'

মনে মনে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু বুদ্ধি হারালাম না। আমার ভেতর থেকে কেউ যেন ডেকে বলে দিল, 'নীপা, এই তোমার সুযোগ। ফন্দীটাকে কাজে লাগাও। জোরালো অভিনয় কর। তুমি না স্কুলে অভিনয় করে প্রাইজ পেয়েছিলে একবার।' বেশ উত্তেজনা অনুভব করলাম। সেই উত্তেজনা কাজে লাগিয়ে খুব গম্ভীর অথচ কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, 'তরুণদা, আমিও কিন্তু আপনাকে একদিন ভাল-বেসেছিলাম। একটু আগে বললাম না,

মানুষের সব ইচ্ছে কি ফলে। সত্যিই তাই। আমার সে ভালবাসার কথা আপনি জানতেও পারেননি।'

প্রায় আকাশ থেকে পড়ে তরুণদা বলল, 'তুমি আমাকে ভালবেসেছিলে? সে কবে নীপা?'

'আমার ষোল বছর বয়সে। আপনি তখন আমাকে গান শেখান। তখনও বিয়ে করেননি। আপনাকে মনে হত আমার ভগবান। আপনার যেদিন বিয়ে হল সেদিন রাত্রে আমি গোপনে অনেক কেঁদেছিলাম।'

তরুণদা আমার একটা হাত মুঠো করে ধরে বলল, 'সেই জন্যেই কি এরকম হল আমার? তোমাকে অবহেলা করার শাস্তি?'

তরুণদা দু মুহূর্ত চোখ বুজে বসে থাকল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগল বারান্দায়। ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসে আমার হাত ধরল তরুণদা। 'আমাকে মাফ কর নীপা। আমি বুঝতে পারছি তোমার ভালবাসাকে অবহেলা করার পাপেই কিছু হল না আমার। নতুন করে তোমাকে ভালবেসে ক্ষতিপূরণ করতে হচ্ছে। তুমি যেদিন এবার বিদেশ থেকে ফিরলে তোমার কি মনে আছে সেদিনকার কথা?'

'হু'। আমরা ট্যাক্সি থেকে এসে নামলুম। আপনি বেরিয়ে এলেন বাইরে।'

'ঠিক সেই মুহূর্তেই সাংঘাতিক কাণ্ডটা ঘটে গেল। দু পাশে দুটো ঢাউস ভি আই পি সুটকেশ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলে তুমি। তোমার মাথায় বাসি চুলের বিনুনি। একটা অদ্ভুত সিল্কের শাড়ি পরেছিলে। আমি যেতেই আমাকে দেখে যেই হাসলে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, ব্যস, আমার চারপাশের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দুলে উঠল। সেই মুহূর্তে কী অসাধারণ তোমাকে যে লাগল, তা আমি বোঝাতে পারব না নীপা। আমি মরে গেলুম।'

মরে যাবার পর যে নৈঃশব্দ্য, তরুণদা থামতেই সেই নৈঃশব্দ্য এসে ঘিরে ফেলল আমাদের। সামান্য বাতাসের শব্দ, বাগানে পাখির কিচিরমিচির আর বাড়ির ভেতর থেকে একটু আধটুক বাসনের শব্দ ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ ছিল না। আমার খুব তাড়া ছিল। যে কোনো মুহূর্তে গাড়ি চেপে কালীঘাট থেকে লোকজন এসে পড়তে পারে। লোকজন এসে গেলে আমার এত যত্নে পাতা ফাঁদ বৃথা হয়ে যাবে। আমি তাই সরাসরি বিষয়ে চলে যেতে চাইলাম। গলা খুব গাঢ় করে বললাম, 'তরুণদা, জীবনটাকে আমরা সংশোধন করে নিতে পারি না?'

তরুণদা ফুল বাগানের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। অবাক হয়ে ফিরে চেয়ে বলল, 'সংশোধন! কি করতে চাও?'

'আপনি আমাকে ভালবাসেন, আমিও একদিন ভালবেসেছিলুম আপনাকে। জীবনটাকে সংশোধন করে নিয়ে আসুন আমরা আবার নতুন করে শুরু করি।'

'নতুন?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না নীপা।'

মনে মনে ভাবলুম পুরুষ মানুষ এরকমই হয়। ম্লান হেসে মুখে বললুম, 'নতুন করে জীবন শুরু করার কথা বলছি তরুণদা। আমারও আর ভাল লাগছে না। চলুন দুজনে কোথাও পালিয়ে যাই।'

তরুণদা দু মুহূর্ত কথা বলতে পারল না। শেষে ভুরু কুঁচকে কিরকম আলগা গলায় বলল, 'কোথায় যাব?'

'যেখানে হোক। যে কোনো ছোট শহরে। আপনি গান জানেন। কোনো ভাবনা নেই আমাদের। গিয়েই গানের স্কুল খুলে দেব। দু-চার মাস একটু তালিম নিলে আমিও সাহায্য করতে পারব আপনাকে। তারপর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত......।' কথাটাকে ইচ্ছে করে শেষ করলাম না। শেষ না করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুখে থাকার আগ্রহটুকু আমার মুখেচোখে ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম।

অত্যন্ত অবিশ্বাসের গলায় তরুণদা বলল, 'ধীরেনকে ছেড়ে তুমি আমার সঙ্গে চলে যাবে?'

'আপনার ধীরেন আমাকে ভালবাসে না তরুণদা। আমার বুকের মধ্যে যে ধরনের ভালবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা আছে, সে ধরনের ভালবাসা আমি তার কাছ থেকে কোনদিন পাইনি।'

তরুণদা আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। কথা না বলে নিঃশব্দে থমথমে মুখে খানিকক্ষণ পায়চারী করল বারান্দায়। দেখে বোঝা যাচ্ছিল অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে। তরুণদা হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ভয়ানক গম্ভীর মুখে ঝুঁকে পড়ে অত্যন্ত অস্থির গলায় জিজ্ঞেস করল, 'নীপা, তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ না? তুমি সত্যি সত্যি ধীরেনকে ছেড়ে আমার সঙ্গে চলে যেতে চাও?'

'বারে! ঠাট্টা করব কেন?'

হঠাৎ গলা চড়িয়ে তরুণদা বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই তো জিজ্ঞেস করছি। ঠাট্টা করছ না?' গলার এমন অদ্ভুত ঢেউ তুলে কথাটা বলল তরুণদা যে আমার কান্না পেয়ে গেল। অভিনয়ের কান্না নয়। সত্যিকার কান্না। আমি অস্ফুট গলায় বললাম, 'না। ঠাট্টা করিনি।'

আচমকা দু হাতে আমার মুখ তুলে ধরে আমার কপালে একটা চুমু খেল তরুণদা। সমস্ত ব্যাপারটা এমন দ্রুত সম্পন্ন হল যে আমি বাধা দেবার কিছুমাত্র সুযোগ পেলাম না। চুমু খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তরুণদা জিজ্ঞেস করল, 'কবে যেতে চাও?'

আমি একটু রাগের সঙ্গে বললুম, 'আজ। এখুনি।'

'উঁহু'। এখুনি তো হবে না। টাকা চাই।' হেসে ফেলল তরুণদা। 'ইস্কুলটিস্কুল শুরু করার আগে পর্যন্ত খেয়ে পরে বাঁচতে হবে তো। ভালবাসা খেয়ে তো বাঁচা যাবে না।'

আমি যেন আশার আলো দেখতে পেলুম। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল আমার। তাড়াতাড়ি আমার হাতের বালা জোড়া দেখিয়ে বললাম, 'এই তো টাকা। চার ভরির বালা। বিক্রি করলে অন্তত হাজার সাতেক পাব।' আমার আত্মবিশ্বাস এত বেড়ে গেল যে এক মুহূর্ত থেমে হঠাৎ তরুণদাকে আমি বলে ফেললাম। বললাম, 'আমি আর বাড়ি ফিরব না তরুণদা। এই-খান থেকেই যেখানে হোক আমায় নিয়ে চল তুমি।'

তরুণদা দু মুহূর্ত আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল। তারপর আমার হাতের বালা জোড়া দেখিয়ে বলল, 'থাক ওটা। পরে কাজে লাগতে পারে। আমি দেখি টাকা জোগাড় করতে পারি কিনা। একটা সুটকেশ চাই, কিছু জামা কাপড়, তোমার খানকতক শাড়ি। বিদেশে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে নিজেদের। কম করেও হাজার চারেক টাকা চাই। কটা বেজেছে নীপা?' আমার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে নিজেই ঘড়ি দেখে বলল, 'বারোটা। দুটোয় ব্যাঙ্ক বন্ধ হবে। ঠিক আছে। আজই যাব। দেখাই যাক না, নতুন করে জীবন শুরু করতে কেমন লাগে। নীপা! বসে আছ কেন? উঠে এস। কালিদাস চা নিয়ে এসে পড়ার আগে তোমাকে জড়িয়ে ধরি একবার। জড়িয়ে ধরে আর একটা চুমু খাই। নীপা! এই নী—পা!'

শুনতে শুনতে সেই শীতের মধ্যেও ঘেমে নেয়ে উঠলুম আমি। আমার ফন্দী কাজ করল না। আমি হদ্দ বোকা। ভেবে-ছিলাম পালিয়ে যাবার কথা বললেই তরুণদা ভয় পাবে। তার ভালবাসার বেলুন চুপসে এইটুকু হয়ে যাবে। পালাবার পথ পাবে না। তা হল না। মাঝখান থেকে তুমুল অভিনয় করে আমার নিজের ফাঁদেই আমি জড়িয়ে গেলাম। পৃথিবীতে কোথাও কোনো শব্দ নেই। শুধু দু-চারটে পাখির কিচিরমিচির আর বাতাসে শব্দ। সেই শব্দের মধ্যে বসে আমার নিজের তৈরি ফাঁদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি মনে মনে ভীষণ ছটফট করে উঠলাম। □

ছবি : পোলারিস



চুল যেমনই হোক না কেন, কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল কিন্তু আপনারই জন্যে। কারণ, এতে চুল থাকে পরিপাটি, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। অথচ মাথায় তেলমাখা, চটচটে বিসদৃশ ভাবটি থাকে না।

যে কোন ধাঁচে, যে কোন স্টাইলে এ চুল আপনি আঁচড়াতে পারেন।

রোজ ব্যবহার করুন সুগন্ধী কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল। চুল থাকবে সুন্দর, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। এবার চাইলে নিজের ইচ্ছেমত চুলের স্টাইল পাল্টে পাল্টে দেখুন কোনটিতে আপনাকে সবথেকে বেশী ভালো মানায়।



CLARION C-DMHO-3R

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল

আপনার চুল সুস্থ ও সুন্দর রাখে অথচ চটচটে করে না।

১০০ এবং ৩০০ মি.লি. শিশিতে পাওয়া যায়

Dey's® যাদের যত্নই আপনার আস্থা



স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দাঁড়াল এক ছিপছিপে তরুণী। উজ্জ্বল দুটো চোখ খানিকটা অপরিচয়ের বিস্ময়। মৃদুকণ্ঠে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাকে চান' ?

স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত আছেন ? 'বললাম, 'আমি তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'আমিই', তরুণীর বিস্ময় বেড়ে গেল। তাই চোখেমুখে লজ্জা শঙ্কা দুই-ই আমদানি করে বললেন, 'কোত্থেকে আসছেন ?'

'সুকন্যা থেকে—' আমার কথা শেষ হল না, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আসুন, আসুন।'

ভেতরে গেলাম। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার। ঘরের হাবভাব আসবারপত্র তাই প্রমাণ করে।

শ্রীমতী স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত ২৮ এপ্রিল ১৯৮৫, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে লায়নস্ ক্লাব আয়োজিত সর্বভারতীয় সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন। প্রতিযোগিতাটি ছিল লঘু উচ্চাঙ্গ সংগীত বিষয়ে। প্রাথমিক স্তরে ৫০০ জন প্রতিযোগী ছিল। তাঁদের মধ্য থেকে ২৫ জনকে নির্বাচিত করে মূল প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। বিচারক ছিলেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র সুরকার নৌশাদ, জয়দেব, ভি. বালসারা, চলচ্চিত্র পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের নামকরা গায়ক-গায়িকা গিরিজা দেবী, এ. কানন ও লতাফত হোসেন। শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিচারকদের প্রধানরূপে। এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার মূল্য ছিল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়র জন্য ৫০০০, ৩০০০ ও ২০০০ টাকা। নগদ টাকার পরিবর্তে সমপরিমাণ অর্থের সামগ্রী বিজয়ীদের হাতে দেওয়া হয়।

স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত এ বছরই ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স আয়োজিত ভজন প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান পেয়েছিলেন। ১৯৮৫-তেই রবীন্দ্রভারতী আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত প্রতিযোগিতাতে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। রবীন্দ্র সংগীত ও বাংলা গানে প্রথম ও খেয়াল বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিক্ষালাভ শুরু হয় স্বাগতালক্ষ্মীর বাবার কাছেই। ওঁর বাবা শ্রীপবিত্র দাশগুপ্ত লক্ষ্মৌ মরিস কলেজের সংগীত বিশারদ। তিনি পাঁচ বছর ওখানেই শিক্ষকতা করেন। আগেই বলেছি গানের প্রতি আকর্ষণ স্বাগতালক্ষ্মীর একদম শৈশব থেকেই। উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিভিন্ন বিভাগের গান তিনি চর্চা করে আসছেন সেই তখন থেকেই। বর্তমানে রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ছেন। ওখানেই মায়া সেনের কাছে রবীন্দ্র সংগীত শিখছেন।

মাত্র সাড়ে তিন বছর বয়সে তিনি সর্বভারতীয় একটি সংগীত প্রতিযোগিতায় খেয়াল গেয়ে উপস্থিত সকলকেই অবাক করে দিয়েছিলেন। এ ছাড়া ৬ থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত আকাশবাণী কলকাতার শিশুমহল ও গল্পদাদুর আসরে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন।

'কী গান ভাল লাগে আপনার ?', সরাসরি প্রশ্নটা করলাম স্বাগতালক্ষ্মীকে। সামান্য একটু ভাবলেন। তারপর ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, 'ছোটো থেকেই উচ্চাঙ্গ সংগীত শিখছি। তা বলে উচ্চাঙ্গ সংগীতেই আমার মন থেমে নেই—লঘু উচ্চাঙ্গ, রবীন্দ্র সংগীত, বাংলা গান, গজল ও ভজন সব কিছুই ভাল লাগে। যে কোনো গান ভাল লাগলেই নিবিড় হয়ে শুনি। এর ভেতর বাছাবাছি নেই।'

'কার গান ভাল লাগে ?' যদিও এই প্রশ্নটি খুবই ডেলিকেট। সঠিক উত্তর দেওয়া যায় না। সুতরাং ওঁর পক্ষেও এ উত্তরটা সহজ ছিল না। তবু সপ্রতিভ ভাবে বললেন, 'বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে এককেজনের গান ভাল লাগে। কারো একটা গান হয়তো মন টানল, না, তাঁরই অন্য একটা গান হৃদয়ের গভীরে ভীষণ অনুরণন তোলে।'

ওঁর কথা মানতেই হয়। উত্তরে বলি, 'ঠিকই বলেছেন, তবে মানুষের খুব প্রিয় কেউ একএকজন থাকে।'

'আমার সে রকম কেউ নেই।' স্বাগতার কণ্ঠে সহজ উক্তি—সকল মহৎ গায়কই আমার প্রিয়। তাঁরা আমার প্রণম্য।'

ছোটো থেকে—অর্থাৎ মুখে বোল ফোটার সামান্য কিছু পরে থেকেই ওঁর কণ্ঠে গান স্বভাবজ আশ্রয় নিয়েছিল। যখন সমস্ত কিছু সম্পর্কে কোনো চেতনা গড়ে ওঠেনি তখনই কিছু গান গেয়েছেন স্বাগতালক্ষ্মী। গেয়েছেন মনের আনন্দে, স্বকীয়তায় এবং ছন্দ তাল লয় বজায় রেখে।

১৯৬৩ সালে জন্মেছেন স্বাগতা। ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝিই প্রতিযোগিতামূলক গান গেয়ে জীবন শুরু করেছেন। যে বয়সে সাধারণত অক্ষরজ্ঞান পর্যন্ত হয় না—তখনই তিনি গলায় সুর ও স্বরের বৈচিত্র্য তুলেছেন।

ব্যাপারটা সত্যিই অবিশ্বাস্য লাগে। কিন্তু অনেক অবিশ্বাস্য ব্যাপারই তো প্রতিনিয়তই আমাদের চারপাশে ঘটে চলেছে। সুতরাং এটাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

সংগীত ছাড়া স্বাগতালক্ষ্মী অন্যান্য হবির মধ্যে রয়েছে ছবি আঁকা ও কবিতা লেখা। একটি মেয়ের মধ্যে একই সঙ্গে তিনটি শিল্প মাধ্যমের বিকাশ দেখে অবাক হতে হয়। ভবিষ্যৎ জীবনে পরিপূর্ণ সংগীতজ্ঞ হবার স্বপ্ন রয়েছে ওঁর দুচোখে। এই তিন শিল্পচর্চা ছাড়াও অবসর পেলেই পড়াশুনা করতে ভালবাসেন।

আমাদের কথার মধ্যেই ওর বাবা পবিত্রবাবু এসে পড়লেন। স্বাগতালক্ষ্মীই ওর বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পুরোপুরি গানের মানুষ পবিত্রবাবু। নানা ধরনের গান নিয়ে আলোচনাও করলেন।

অজয় দাশগুপ্ত

মানসী মিত্র

বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামের আর্ট ডিপার্টমেন্টে অস্থায়ী চাকরি করছে মানসী মিত্র। গত কয়েক মাস ওখানে সবাই খুব ব্যস্ত ছিল। আমেরিকায় ফেসটিভ্যাল অব ইণ্ডিয়ায় ভারত সম্পর্কে যা কিছু দেখানো হবে তার অনেকখানি মানসীরা তৈরি করেছে। পেশার বাইরে মানসীর নিজস্ব ছবি আঁকার যে জগৎ আছে সম্প্রতি তার পরিচয় পাওয়া গেছে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত এক যৌথ প্রদর্শনীতে। বয়সে তরুণী হলেও মানসী ইতিমধ্যেই খুঁজে পেয়েছে শিল্পী হিসেবে তার নিজস্ব স্টাইল এবং দৃষ্টিভঙ্গি। কলকাতায় এখন নবীন চিত্রশিল্পীদের ভরা জোয়ার। যত প্রদর্শনী হয় তার সিংহভাগ তরুণদের। এই তীব্র স্রোতের মধ্যে আলাদা করে কাউকে দেখতে পাওয়া কঠিন। নানান কারণে মানসীর ছবি অন্য অনেক নবীন শিল্পীর থেকে স্বতন্ত্র। ও কখনই সহজ চেনা জিনিস নিয়ে ছবি আঁকে না। বিমূর্ত আর্টের জটিলতাও ওর ছবিতে তেমন বিস্তৃতভাবে নেই। তরুণ শিল্পীরা স্বাধীনতার ব্যবহার কিছু বেশি



করছেন এবং এমনও শোনা যায় যে, আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা ইত্যাদির কথা ফলাও করে বলতে গিয়ে তাঁরা শিল্পের নিজস্ব প্রতিমা বা অবয়বটিকে অসম্মান করছেন সস্তা নাম কেনবার তাগিদে। মানসীর ছবিতে এই অন্ধকার অবস্থার বিরুদ্ধে এক অতি সুন্দর সূক্ষ্ম প্রতিবাদ লুকনো থাকে। ও কলকাতার উত্তরাঞ্চলে বাস করে। রোজ বাস-ট্রামে চেপে দক্ষিণে কাজ করতে যায় কিন্তু ছবি আঁকে পাহাড়ের, নদীর, ঝর্নার। লক্ষণীয় হল চেনা বা পরিচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষজনকে; ওর সচল হাত পটের ওপর এমনভাবে রূপান্তরিত করে, খালি চোখে মনে হয় তারা হিজিবিজি কিন্তু থমকে দাঁড়ালে, ভাবতে চাইলে, তারা হয়ে ওঠে যাবতীয় কালো ভাবনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং আলো বিশেষ। মানসীর সঙ্গে সেদিন অনেকক্ষণ কথা হল ওর কর্মক্ষেত্রের অভ্যর্থনা কক্ষে।

'প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আমার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। ট্রেনিংটা ঠিক করে নিতে গেলে ঠিক টিচার চাই। আমরা তা পেয়েছি। আমি অবশ্য কখনই পুরোপুরি বাস্তবধর্মী ছবি আঁকিনি কিন্তু শিখেছি যত্ন নিয়ে। ডিটেল না শিখলে ভাঙা কাজ করা যায় না। স্টাডি বা কপি করার অভ্যেস আমার এখনও যথেষ্ট আছে। সুযোগ পেলেই গ্রামে চলে যাই। সেখানে পরিবেশ এবং প্রকৃতির মধ্যে যে পবিত্রতা এখনও আছে তা কপি করতে চেষ্টা করি।'

'কিন্তু যে পরিবেশে তুমি বেঁচে আছ তার প্রতিফলন তোমার ছবিতে হচ্ছে কি?'

'পরিবেশ খুবই অনুকূল। ব্যক্তিগতভাবে বাড়িতে সব সময়েই উৎসাহ পেয়েছি। আমার বাবা পেশায় ইন্টিরিয়ার ডেকরেটার। তাছাড়া দুঃখিত বা বিরক্ত হবার মত সিচুয়েশন সব সময় আসছে, তাতে তো কাজ ভাল হবারই কথা। তবে মাঝেমধ্যে যখন হঠাৎ খুব ভাল ছবি দেখি মনটা একটু দমে যায়। মনে হয় কিছু পারছি না। আর সামাজিক সমস্যার প্রতিফলনের কথা যদি বলেন তাহলে আমার যুক্তি হবে, সমাজের নানান সমস্যার কথা সরাসরি ছবিতে তুলে ধরলেই আর্টিস্টের দায়িত্ব শেষ হয় না। সাধারণ মানুষ যারা ক্যালেন্ডারের ছবি দেখতে অভ্যস্ত তাদের চোখকে, চেতনাকে নাড়া দেবার মত ছবি আঁকতে চেষ্টা করা, প্রদর্শনী করা, সেও তো সমাজসেবা, নয় কি? এই তো গত কয়েক মাসে শিল্পী শানু লাহিড়ীর সঙ্গে উত্তর কলকাতার বলাই সিংহী লেনের দেওয়ালে ছবি আঁকলাম। সেটা প্রায় বস্তি। আর্টের প্রতি কোনো বিশেষ আকর্ষণ সেখানকার লোকের নেই। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে দেখলাম পাড়াসুদ্ধ লোক কৌতূহলী এবং ক্রমশ উৎসাহী হয়ে পড়ল। জানেন নিশ্চয়ই শানুদি 'লাভ ক্যালকাটা প্রজেক্ট' বলে একটা ব্যাপার করছেন। চাইছেন শহরের সর্বত্র ফাঁকা দেওয়ালে ছবি এঁকে দিতে। আমরা যারা নতুন পাশ করে বেরিয়েছি, তাদের কাজ করবার সুযোগ হচ্ছে এবং একটা অবকাশ থেকে যাচ্ছে আমাদের এই জীর্ণ বিবর্ণ শহরের শরীরে রঙ ধরানোর। এতে করে নিশ্চয়ই শত সমস্যার মধ্যেও বাঁচতে ভাল লাগবে। এটাও তো আর্টিস্টের কাজ। নয় কি?'

'শেষে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি। একজন মহিলা হিসেবে তুমি কি যথেষ্ট স্বাধীন?'

'কেন নয়? আজকাল একটা ধারা এসেছে পুরুষ ছাড়াই চলতে চেষ্টা করার। আমি পুরোপুরি এ কথা মানি না। মেয়েরা কিছুটা অভিভাবকত্ব চায়। এটা তাদের সহজাত। তাছাড়া পুরুষ মাত্রেই যে খারাপ এটা ভাবার আমি কোনো কারণ দেখি না। ভাল বন্ধুর অভাব নেই। মেয়েরা একটু বেশি বাইরে বেরোচ্ছে, স্বাবলম্বী হচ্ছে বলে হয়তো মেয়েদের মধ্যেকার নরম ব্যাপারটা একটু কমছে। কিন্তু তাতে করে হতাশ হবার কারণ নেই। এখন মেয়েদের সামনে সুযোগ অনেক বেশি।'

মানসীর ছবিতে এই প্রত্যয় এবং আশা আছে। সে যন্ত্রণার অতিরিক্ততা বা সর্বস্বতায় বিশ্বাস করে না।

শংকর মজুমদার

ফ্যাশনে বৈচিত্র্য ● ফ্যাশনের মূলকথাই হল বৈচিত্র্য। নিত্য-নতুন ফ্যাশন বদলের অর্থ আরও বৈচিত্র্য আনা। বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে যে শাড়ি, বৈচিত্র্যের গুণে তা আজও ফ্যাশনেবল। ষাট-দশকের সালোয়ার-কামিজ নানা রূপে এখনও মেয়েদের মন জয় করে। এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও ফ্যাশনকে রমণীয় করে তোলে সামঞ্জস্য। পোশাক, সাজ এবং গয়না এই–তিনটিকে একই সূত্রে বাঁধতে না পারলে যে ছন্দপতন ঘটে তা কখনও কাম্য নয় । সামঞ্জস্যটুকু বজায় রেখে চলতেই হবে।









ফটো : নিমাই ঘোষ : দেবযানী চ্যাটার্জির সৌজন্যে

নতুনত্ব

বৈদেহী

অনেক নতুন পত্রিকা বেরোচ্ছে। নতুন পত্রিকা মানেই কি নতুন সাহিত্য না কি শীতের মুখে বাজারে যেমন ফুলকপি নতুন আসে তেমনি পত্রিকা বেরিয়ে আসছে নতুন নতুন? একটু ভেবে দেখুন।

সব নতুন কি সত্যি নতুন? আমার কাছে যা নতুন, আপনার তাঁর সকলের কাছেই সেটা নতুন? কথাটা নেড়েচেড়ে ভেবে দেখবার মতো। বিষয়টি নিয়ে ভাবনা কখনো কোথাও হয়নি এমনও নয়। বারবার, আরো বহুবার হওয়াই দরকার। আগের ভাবনাগুলোকেও সেই প্রসঙ্গে তুলে এনে বাজিয়ে নেওয়া ভালো। তাতে পুরোনোর ভিতরে নতুনত্ব খোঁজা হবে, পুরোনোকেও জানা হবে ফিরে।

আমরা শুরু করবো নিজের জীবদ্দশায় যে কোনো বিষয় নিয়েই যিনি কিছু-না-কিছু নতুন এবং সজীব কথা বলে রেখে গিয়েছেন সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৩৩৫ বাংলা সনের ৯ চৈত্র তারিখের পত্রাংশের উল্লেখ করে। আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর সাত মাস আগেকার সেই চৈত্রে "সাংহাইয়ে সু-র বাড়িতে ভালো লাগেনি; অত্যন্ত ক্লান্ত করেছিল, তার প্রধান কারণ নূতন জায়গায় মন গায়ের মাপ পায়নি, চার দিকে এখানে ঠেকে ওখানে ঠেকে আর তার উপরে দিনরাত অভ্যর্থনা গোলমাল।... প্রতিদিনের ভাবনা কল্পনার মধ্যেই নূতনত্ব আছে, বাইরের নতুনত্ব তাকে বাধা দিতে থাকে। জীবনে আমরা যে-কোনো পদার্থকে গভীর করে পেয়েছি, অর্থাৎ অনেকদিন অনেক করে জেনেছি, সত্যিকার নতুন তারই মধ্যে – তাকে ছেড়ে নতুনকে খুঁজতে হয় না। অন্য সব মূল্যবান জিনিসেরই মতো নতুনকে সাধনা করে লাভ করতে হয়। অর্থাৎ পুরোনো করে তবে তাকে পাওয়া যায়।"

পুরোনো করে নতুনকে পাওয়া গেলে নতুন বলতে তখন কি দাঁড়ালো জিনিসটা? পুরোনোই নতুন হয়ে দেখা দিলো, না নতুন পুরোনো হয়ে গেল? চিঠিতে এ সব কথা স্বভাবতই নেই। প্রাসঙ্গিক একটা কথা স্পষ্টভাবে রবীন্দ্রনাথ জাভা থেকে এই সময়ের বছর দেড় কি দুই পূর্বে লিখেছিলেন, "অতীতকাল যত বড়ো কালই হোক নিজের সম্বন্ধে বর্তমানকালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত, মনে থাকা উচিত তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে।" আবার পরবর্তীকালে পারস্যযাত্রার সময়েও তিনি লেখেন, "পুরোনো বাড়ি আপন যুগ পেরোতে না পেরোতে পোড়োবাড়ি হতে বাধ্য। ....নতুন বংশ নতুন পাড়ায় গিয়ে বাস করে।" নানা দেশে পথ চলতে চলতে নতুন-পুরোনোর সহযোগ কিংবা বিভেদকে তিনি একরকমের মুক্তাঙ্গন মঞ্চে দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণের মূল্য বিশিষ্টতায় তাই স্বতন্ত্র।

সাধারণ পাঁচজনের ওভাবে দেখার অবকাশ নেই, তবু নতুন পুরোনো নিয়ে কথা উঠে যায়। সময়টা এখন দ্রুত বদলের। কোন্‌টা নতুন আর কোন্‌টা পুরোনো বস্তাপচা, নিজের নিজের কান্ডজ্ঞান দিয়ে ঠিক করে নিতে হয় সকলকে। সে কাজটা সবাই করেও নেয়। ঠিক কী করে সকলে? আমাদের প্রশ্ন এইটা।

শক্তপোক্ত জিনিসের বেলায় নতুন-পুরোনো তফাত করা বেশ সহজ। কাপড়-জামা, বাড়ি-ঘর, আসবাবপত্র এ সবই তো শক্ত ধরাছোঁয়ার জিনিস? অথচ এক পুজোর কাপড় কেনা নিয়ে পাড়ার হরিহরবাবুর গৃহিণীর সঙ্গে মতান্তর হয়ে গেল। হলুদ-কালোয় মেশানো চওড়া পাড়, মুগার ধাক্কা তার গায়ে, সাদা খোল, সবে হরিহরবাবু বলেছেন, "এইখানা দেখো দেখি" – ব্যস, তাঁর স্ত্রী একেবারে দোকান থেকে সোজা নেমে বাড়ি ফিরে যান আর কী! কেন? "ম্যাগোঃ !! একদম সেই বৈশাখ মাসে যেটা কিনেছি ঠিক যেন সেখানা। কেন? নতুন কিছু কি তোমার চোখে পড়তে নেই?" – অর্থাৎ, শাড়িখানি যদিও নতুন সুতোয় বোনা এবং স্পর্শদোষে প্রাচীন করেনি কেউ তাকে, তবু হরিহরপত্নীর কাছে ও শাড়ি নতুন নয়।

অন্যদিকে, হরিহরবাবুর পরম সুহৃদ দপ্তরের কাজে গিয়েছিলেন উড়িষ্যাতে, কুক্ষণে শারদীয় উপহার বলে ঘরের মানুষের জন্যে একখানি সুন্দর বর্ণাঢ্য সম্বলপুরী এনেছিলেন, ঘরের মানুষ আবার মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাই বরণ করার পর থেকে সেই যে একঘেয়ে এতটুকু-টুকু বুটিদার সাদা জমিন ধরেছেন ঠিক সে রকম ছাড়া আর কোনো শাড়িকে নতুন কেনা কাপড় বলে মনেই হয় না তাঁর। এবারে বেশি বলাবলি করায় হরিহরবাবুর সুহৃদপত্নী তাঁর স্বামীকে বলেছেন, "তুমিই পরো সম্বলপুরীটা পাঞ্জাবির সঙ্গে।" – কোনো মানে হয়? কোনো মানে হয় কি না এ বিষয়ে হরিহরবাবু যাই বলতে চান, পাঠক পাঠিকারা সকলেই জানেন ধুতিপ্রিয় বাঙালি পুরুষদের নতুন কাপড়ে পুরোনো চেহারার সাক্ষ্য থাকলেই তাঁরা শান্তিতে থাকেন। একটুখানি খয়েরী আমেজ পাড় তো সেই খয়েরই চাই সবুজ চলবে না। সাদা পাঞ্জাবি তো সাদা পাঞ্জাবিই। আসলে অভ্যাসের একটা নেশা আছে, সেই নেশায় কেউ চান বারবার এলেও একই জিনিস ফিরে ফিরে আসুক, নতুন কিন্তু চমকে দেওয়া নতুন নয়। ঠিক ঠিক সেই একই জিনিস যেমন ছিলো প্রথমে। প্রথম জামা, ধুতি কিংবা জুতো নিতান্ত ছোট হয়ে যায় মাপে আর না হয় ছিঁড়ে যায় তাই তার বদলে নতুন আনতে হয়, হ্যাঁ, কিন্তু একদম অন্যরকম কিছু তাই বলে ওই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ুক এটা এই সব মানুষের ইচ্ছে নয়। এই নেশায় মেতে গেলে মেয়েরাও একই ছাঁদের শাড়ি চান। সেই পাড়, সেই খোলের খোলতাই। একদম এক।

এর উলটো দিকে রয়েছেন তাঁরা যাঁরা নতুন বলতে আকারে প্রকারে পুরোপুরি নতুনত্বই চান। বেশ ভিন্নরকম কিছু না হলে একই রকম 'আবার একটা'-কে নতুন বলতে মন ওঠে না তাঁদের। হাল্কা রং যদি এর আগে অনেক হয়ে থাকে এবার একটু গাঢ়তা এনে দেখা যাক না। আর তা না হলে একদম পাড়ছাড়া অন্য ডিজাইন। এই ইচ্ছেকে আরো একটু ঠেলে দিলে দেখা যায় এঁরা পোশাককে-পোশাক পুরো নতুন করে দিতে পারেন। শাড়ির বদলে কিনে ফেলতে পারেন সালোয়ার কামিজ। সেটা হবে নতুনত্ব মাত্র নয়, একেবারে অভিনবত্ব। অভিনবত্ব বিষয়ে লোকজনের প্রায়ই ভয়ানক সন্দেহ থাকে, ভাবনা থাকে অবশ্য।

ধরাছোঁয়ার ভিতরে এমনিতে শক্ত জমিতে নতুনত্বের যে দুরকম ধরন দেখছিলাম যার একটাতে নবীকরণের ভিতরে পুরোনোর পুনরাবৃত্তিকে নতুন বলা হচ্ছে আর, অন্যধরনে 'নতুন' মানে এমন এক বৈচিত্র্য যাতে সেই বিশিষ্ট বৈচিত্র্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই শুধু পুরোনোর সঙ্গে সামান্য একটুখানি যোগ রেখে দেওয়া হয় ('এটাও শাড়ি, ধনেখালি তাঁত সরুপাড়, আর এটাও শাড়ি, হ্যাঁ, হলোই বা উজ্জ্বল বালুচরী। শাড়ি এটা, দারুণ নতুন, এরকম বালুচরী সচরাচর দেখা যায় না।') –এই দুই ধরনের সঙ্গে 'অভিনবত্ব'কে আলাদা

করা যায় মাত্রার জোরেই। কিন্তু সেই বিশেষ মাত্রার 'অভিনবত্ব' নিয়ে যে ধাঁধা সেটা-ই কখনো কখনো আরোপিত হয় নতুনত্বে আর সেই জন্যেই থেকে থেকে শোনা যায়, "অমন নতুন ঢের দেখেছি, আর নতুনে কাজ নেই।" এর থেকেও চড়া সুরে কড়া কথা শোনা যায় অভিনবত্বের মুখোমুখি প্রথম এলেঃ "ওটা কী পরেছে কি? ওকে পোশাক বলে, অ্যাঁ?" বাড়ি-ঘরদুয়োরের ব্যাপারেও তেমনি কোন্‌টার নাম বসতবাড়ি আর কোন্‌টাকে ঠিক ম্যুজিয়াম বানিয়ে তোলা হয়েছে এসব মতামত সবসময়েই লোকেরা দিতে চান, দিয়ে যান। নতুনত্ব দেখাবার দাবিদার কে কতটা হতে পারে এ বিষয়েও মানুষজনের মত খুব অস্পষ্ট থাকে না। সেই কোনকালের পন্ডিতী বিধানের সময় থেকে সব ব্যাপারে 'হ্যাঁ' 'না' ঠিক করে দেবার সর্দারি ছেলেরাই করছে, ছেলেদের পোশাক-আসাকে চুলের বাহারে নতুনত্ব তাই সহজে এসে যেতে পারে। মেয়েদের বেলায় দাপট বেড়ে যায়। অধিকাংশ মেয়ের চেষ্টা থাকে তাই একই পরিধেয়ের বাহার ফিরিয়ে ফিরিয়ে আর সংখ্যা বাড়িয়ে বাড়িয়ে এরই মধ্যে নতুনত্ব আনার। নতুনকে রুখে দেবার চাপ বুড়োদের বেলায় আরো বাড়ে আর বুড়ীদের নতুনত্ব নিষিদ্ধ। এটা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। খুব খ্যাতিমান, বিত্তবান, প্রতিপত্তিশালী মানুষদের বেলায় অবশ্যই নানা ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু সে সব আমাদের কথা নয়। কথাটা যে কী নিয়ে সমস্ত বিচক্ষণ পাঠকপাঠিকা এতক্ষণে তা বুঝে গেছেন।

বাড়িঘর, পোশাক এ সব তো বাইরের কথা, তুচ্ছ কথা। ভিতরের কথা, বড়ো কথাটা হচ্ছে বাড়িতে যারা বসবাস করে, পোশাক যারা ব্যবহার করে, কিংবা এ সব বানায়, গঠন, রীতি আর রং, ঢং সব বাছে সেই মানুষদের নিয়ে। মানুষ নতুন করে চায় বলেই তার থাকার ধরন, চলাফেরার ধরন, খাওয়া-পরার চাল বদল হয় আর বদলে যায় বাড়ি বানাবার, গাড়ি বানাবার, জামা বানাবার এবং আমিষ-নিরামিষ রান্নার কায়দা। নতুন মানুষ এলে সব হয়। এ কথাটা সবাই মনে মনে একরকম জানে। জানে বলেই নতুন মানুষ বিষয়ে পুরোনো মানুষদের কৌতূহলও যেমন, সন্দেহ তার দশগুণের বেশি বই কম নয়। নতুন' পুরোনোর একটা সোজাসুজি ভাগ মানুষের ভিতরে করা রয়েছে জন্ম দিয়ে। নবজাতক আসে।

নতুন মানুষ শুধু যে জন্মসূত্রে আসে তা-ও নয় তো। বিয়ের সূত্রে নতুন জামাই কিংবা নতুন বউ হয়ে এসে দাঁড়ায়। লেখাপড়ার সুবাদে ইস্কুলে কলেজে নতুন সতীর্থ আসে কাজের জগতে নতুন সহকর্মী হয়ে কিংবা ঊর্ধ্বতন পদাধিকার নিয়ে আসে। আর কিছু না হোক শুধু বেঁচে থাকার সুবাদে নতুন পাড়ায় নতুন বন্ধু, বেড়াতে গিয়ে নতুন চেনা, ব্যাঙ্কের নতুন ম্যানেজার এমনি হাজার রকম নতুনত্বে দেখা দিয়ে যায় নতুন মানুষেরা। এদের সবার বেলাতেই অবস্থা বিশেষে কোনো-না-কোনো রীতিনিয়মের আঁটবাঁধ কাজ করতে থাকে যতক্ষণ-না যে-নতুন সে একেবারে জীর্ণ হয়ে যায়, নতুন বলে তাকে চিনবার কোনো উপায়ই থাকে না, আর নয়তো সে সকলের অলক্ষ্যে নিজের নতুনত্বের ধরনকে স্বীকৃত বিশেষত্বে দাঁড় করিয়ে ফেলে। এই রকমটা চলে সর্বত্র, পুরোনোর দল যেখানে যত ঘনিষ্ঠ ওই সমস্ত রীতিনিয়মের বেড়া সেখানে ততই গোলমেলে। তবু, সব গোলমাল পেরিয়ে যে দলের ছাড়পত্র পেল সে তখন দলেরই একজন হয়ে গেল, সর্বত্রই অলিখিত নিয়মও এটাই। ধরুন একটা পরিবার। আমাদের দেশে পারিবারিকতা তো খুব ঘনিষ্ঠ, সেই পুরোনো পরিবারে নতুন বউ আসে। নববধূ হয়ে সম্পূর্ণ অজানা পরিবারে যাওয়ার পরে, যে-বউ একসময়ে হাসিমুখে বলতে পারে, "ওরে বাবা, আমি যখন নতুন বউ হয়ে এলাম, এদের সব যা কাণ্ড দেখে তো আমার চক্ষুস্থির" – সে বউ একেবারে নিখাদ প্রমাণ দেয় কেমনভাবে সে নতুন বাড়ির মানুষ হয়ে গিয়েছে। তার বহিরাগত হিসেবে এসে পৌঁছানোর কোনো চিহ্নই আর কোথাও নেই।

কিন্তু তখন প্রশ্ন যেটা রয়ে গেল সেটা এই যে তখন কি সে আর 'নতুন বউ' থাকে?

না। কাব্য করে যেমন যা-ই ভাবা যাক, প্রকৃত প্রস্তাবে খুব আশ্চর্য সুন্দর নববধূও কোনো একজন মানুষ একবারের জন্যই হতে পারে। তাহলে কি পুরোনো হয়েই তবে এই নতুন বউ পারিবারিক দলে ভিড়তে পারলো? নইলে পারত না? এর উত্তর নির্ভর করে নতুন বউটি কতখানি সত্যি 'নতুন' ছিলো তার উপরে। একটু জটিল হয়ে গেল উত্তর? হ্যাঁ। মানুষ ওইরকম জটিল সেইজন্যই তার পৃথিবী এত বড়ো, এমন বাঙময়।

শুধু বউ হয়ে পুরোনো প্রথায় 'যখন যেমন তখন তেমন' গা ভাসিয়ে দেওয়া কতো সহজ, দেখতে-দেখতে উপরোক্ত নতুন বউ পুরোনো হয়ে উঠতে পারে এ ভাবেই। তার বাঁধা বুলি হতে পারে "আর ঝামেলা ভালো লাগে না বাবা!" কিন্তু এইটাই নতুন বউয়ের একমাত্র গতি তা নয়। নতুন বউ 'নতুন বউ' না থাকলেও হয়ে উঠতে পারে, হয়ে ওঠেও কখনো, একবারে নতুন একটি অন্য মানুষ। বউ হিসেবে সে আর নতুনটি নেই, কিন্তু সে তো সেই পুরোনো মেয়েটিমাত্র আর নয়, কিংবা, নয় আর দশজনের অনুকৃত প্রতিচ্ছবি। সে নিজে একজন বিশিষ্ট কেউ, সত্যি করে যে এখন বলতে পারে "এ নতুন জন্ম আমার।" এভাবে নিজেকে নিজে নতুন করে তোলার জন্য নতুনত্ব বিষয়ে স্থির লক্ষ্য আর শ্রদ্ধা থাকাটা খুব দরকার। নইলে নতুনত্ব অন্যদের পীড়া দিচ্ছে বলে নিজের কাছেও পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। নতুনের বড়ো মুশকিল সেটাই। একলা থাকার, একা লাগার মুশকিল। যে নিজেকে নিজে বলতে পারবে "আমাকে পুরোনো করে হজম করে ফেলতে পারবে না। আমি একলা উদ্ভট কিছু তো নই, আমি নতুন ধারা তৈরি করবার চেষ্টা করছি" – তার নতুনত্ব থেকে ভিন্ন ঐতিহ্যের সূত্রপাত হয়। সেই ঐতিহ্য ক্রমে প্রাচীন হয়ে এলে তাকে ঠেলা দিতে তখন আবার আনকোরা নতুনত্বের বেগ লাগে। নিজেদের কোনোভাবে নতুন করে তোলার কাজে নতুন বউ হয়ে (কিংবা না হয়েও) কি আজকের মেয়েরা দেশে দেশে নেমেছেন? তাঁদের নতুনত্ব কি বেশবাসে? বাড়িঘরের বিন্যাসে? কর্মকৃত্যে? না কি ব্যক্তিসত্তায়? এ সব কথা ভাববার সময় হলো। নতুন সাহিত্যের ফসলেই ফলবে সে সব ভাবনা, সেই প্রত্যাশারও ঠেলা এলো।

অথচ নতুনত্ব ঠেকে ঠেকে যায় কেন? কারণ বাধা পড়ে। মানুষের ভিতরে নতুনের প্রতি আকর্ষণে যেমন অবাধ প্রাণশক্তির স্বভাবী বেগের নিদর্শন মেলে, অন্যদিকে তেমনি মানুষের নতুনকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টাতে দেখা যায় বুদ্ধিমান প্রাণীদের অপর প্রাণীর প্রতি সন্দেহী ভয়। মানবেতর জৈবতায় এই সন্দেহী ভয় জিতে যায় প্রায়ই। মানুষ বুদ্ধির চর্চাকে বাড়িয়ে এই দ্বন্দ্বের ভিতরে নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছেকে এনে ফেলেছে এমন ভাবে যাতে সাপও মরে আবার লাঠিও না ভাঙে।

নতুনত্ব সম্বন্ধে এই বাধো-বাধো দ্বিধা, এর সহজ একটা কারণের কথা বলে এবার ছেদ টানি।

নতুনত্ব মানেই এক রকমের বড়ো প্রতিযোগতার ইশারা। পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বীরা একতরফা মহড়া দিয়ে নেয়।

আপনার বাচ্চাকে দিন সেরেল্যাকের পুষ্টি!



এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন প্যাক

চার মাস বয়েস হলেই দুধের সংগে সংগে আপনার বাচ্চার শক্ত খাবারেরও দরকার। আর এই সময়েই ওকে দিন সেরেল্যাকের পুষ্টি।

পুষ্টিকর গুণমান ঃ সেরেল্যাকের প্রতিটি ফীডের মধ্যেই আছে সব কিছু যা আপনার বাচ্চার পুষ্টির জন্যে দরকার। এতে আছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ। বাচ্চাদের জন্যে ঠিক যেমনটি দরকার সেই অনুযায়ী এগুলি সুসম অবস্থায় থাকে।

অল্প সময়ে তৈরী ঃ বাচ্চার খিদে পাওয়ার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সেরেল্যাক তৈরী। এতে দুধ আর চিনি দেওয়াই আছে। আপনি শুধু ফোটানো জলে সেরেল্যাক গুলে নিন!

খেতে ভাল ঃ প্রথম শক্ত খাবার ধরাতে গেলে সেটা বাচ্চাদের কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। সেরেল্যাকের স্বাদ বাচ্চাদের খুব পছন্দ। অতএব এটা দিয়ে সুরু করাই ভাল। তৈরী করার যে স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি টিনের গায়ে লেখা আছে সেই অনুযায়ী তা তৈরী করে আপনার বাচ্চাকে সুসম পুষ্টি যোগান।

বিনামূল্যে শিশুর বৃদ্ধিসূচী ঃ
আপনার বাচ্চার জন্যে একটা বৃদ্ধি পুস্তিকা এই ঠিকানায় চেয়ে পাঠান-
সেরেল্যাক, পোস্ট বক্স ৩
নিউ দিল্লী ১১০০১৮



Nestlé

SAA/FSL/C/3799 BEN

সেরেল্যাকের মমতা : পুষ্টিতে সম্পূর্ণ-স্বাদে অপূর্ব

অগ্রহায়ণের কৃষ্ণচূড়া : অখিলবন্ধু ঘোষ



‘গান নেই, এখন শুধু হুল্লোড় আছে। ভেবে দ্যাখ আগে এত খুন, রাহাজানি ছিল না। ভাল গান শুনলে মানুষের মনটাই অন্যরকম হয়ে যায়। এখন গান-বাজনা শুনলে শুধু মারদাঙ্গা করার ইচ্ছে হয়। কোনদিন ভাবতে পেরেছিলি, ঘরের বউকে পুড়িয়ে মারাটা প্রতি সপ্তাহে হেডলাইনের খবর হবে? আমার তো মনে হয় লঙ্কা জয়ের পর অযোধ্যাতেও গানের প্রচলন ছিল না – নইলে রামচন্দ্র সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলতেন না।’

বাড়িটা আমার অনেক দিনের চেনা। প্রায় তিরিশ বছর। নোনাধরা পুরনো বাড়ি। তিরিশ বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে। বদলায়নি বাড়িটির চেহারা। এই জীর্ণ প্রাসাদে প্রায়ই সুর ভেসে ওঠে। ঠিক তখন মনে হয়, বাড়িটা যে ধসে পড়েনি ,তার কারণ বোধহয় সুরের গাঁথুনি। যিনি সুরসাধক তাঁর কাঁচা চুল পাকা হয়েছে, দাঁত অন্তর্হিত – কিন্তু সুর অনড়। আসরে বসে যখন গান শুনি তখন মনে হয় বাস্তব চেহারাটা উধাও। তারুণ্য এখনও আলোড়িত করে। সুরের প্রেরণা অনেক কিছুই অগ্রাহ্য করে। তিরিশ বছর ঘরের আসবাবপত্রও বিশেষ বদল হয়নি। ঘরের কলি ফেরানো হয়নি কতদিন – কে জানে? কিন্তু গান ধরলেই বিবর্ণ দেওয়ালে রামধনুর রঙ। হলুদ পাতায় সবুজ শিরা। সাধকের নাম অখিলবন্ধু ঘোষ।

গলা ছেড়ে হাঁক দিলেন, ‘পুরনো ছাত্র এসেছে, এককাপ চা দিয়ে যাও।’ নিচে থেকে চা এল, চা-য়ে চুমুক দেওয়ার আগে, ব্যস্ততার সঙ্গে অখিলদা বললেন, ‘দাঁড়া দাঁড়া, খালি পেটে চা খাবি না, এই করেই চেহারাটার বারোটা বাজালি!’ কোণ থেকে একটা কৌটো বের করে দুটি বিস্কুট হাতে দিলেন। অকৃত্রিম স্নেহ জীবনে প্রায় ভুলেই যেতে বসেছিলাম, মনটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল।

‘কি যে হয়ে গেল গানের জগৎটা!’ আনমনে কিছুক্ষণ কাটল। ‘এখন কি কেউ আনন্দে গায়? আগে যখন ফাংশন যেতাম, সকাল থেকে মনটা গুন্‌গুন্‌ করত, গান গাইব, সকলের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে, সবাই শুনবে – প্রত্যেককে মাতাতে হবে। এখন বয়েস হয়ে গেছে; ফাংশনে যেতে হয়, যাই – কিন্তু যাঁদের বয়স কম তাঁদেরও উত্তেজনা নেই। কোনমতে নিয়মরক্ষা। আগে বিভিন্ন জলসায় গান গাইতাম, সকলের সঙ্গে দেখা হত, আড্ডা হত – সে আর-এক উত্তেজনা। টাকাপয়সা কি পেয়েছি হিসেব কষিনি। লুচি-আলুর দম আর মিষ্টি পেয়েই সন্তুষ্ট। এখন গান নয়, টাকাটাই মোক্ষ। তার সঙ্গে আর-একটি জিনিস যোগ হয়েছে – অর্কেস্ট্রা পার্টি। এক-একজনের গানের সঙ্গে দল বেঁধে যন্ত্রীদল উঠলেন। গানের চেয়ে বাজনার দাপট বেড়ে গেল।

‘বাজার বাড়লেই চটক বেড়ে যাচ্ছে।

প্রত্যেকে তৈরি শিল্পী অথচ জনপ্রিয়তার চাহিদায় ভজনের চেহারা বদলে গেল। নজরুলের গান এখন খুব জনপ্রিয় – ফলে নজরুলগীতিও বদলে যাচ্ছে। একটা জিনিস লক্ষ্য কর – কেউ নজরুলের মূল সুর গায় না – সুর করে নিয়ে আধুনিক করার দিকে ঝোঁক বেশি। প্রত্যেকে তাই শুনেই খুশি। কয়েকটা গান শোন।' অখিলবন্ধু কয়েকটি গান শোনালেন, নজরুলের অপূর্ব সব সুর। 'কিন্তু সেগুলি কারও নজরে আসে না। গান গাইতে বসে, নিজে কত বড় ওস্তাদ সেটা জাহির করতেই হবে। গানের মাঝে তান, সরগম কায়দার ঠেলায় গানের প্রাণ উধাও। শান্তভাবে গান উঠেই গেল।

'ছোটবেলায় মামার বাড়ি ছিলাম। মামা কালিদাস গুহের বাড়ি গানবাজনার চর্চা ছিল। খুব গান শুনতাম, শিখতাম। বছর দশেক যখন বয়েস তখন পাড়া থেকে একটা নাটক হল রামমোহন লাইব্রেরিতে। নাম বোধহয় 'স্বামী'। আমি নেচেকুঁদে গাইলাম রবীন্দ্রনাথের গান 'আমি ভয় করব না'। সবাই খুব ভাল বললে, কাগজেও রিপোর্ট বেরোল। মাথা গরম নয়, তবে নেশা ধরে গেল। ক্রমশ ভেবেই নিলাম, গানটা শিখতে হবে। শিখতে আরম্ভ করলাম নিরাপদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। নিরাপদবাবু খুব যত্ন নিয়ে শেখাতেন। বাংলা গানে আমার আদর্শ ছিলেন শচীন দেববর্মন। ওঁর গানগুলিই জলসায় গাইতাম। একদিন নিরাপদবাবু আমাকে তারাপদ চক্রবর্তীর কাছে শিখতে পাঠালেন। নিজেরই গাওয়া গানের চেহারা পালটে যেতে লাগল। প্রথম থেকে আজ অবধি, সকলেই কারো না কারো অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। ওই অনুপ্রেরণা-শব্দটায় গোলমাল আছে। শুধু গান গাইলে চলবে না, তার গায়কীকে অনুভব করতে হবে। নইলে তো ক্যারিকেচার হয়ে যাবে। এখন যেটা অনেকেই করেন।

'আমি শচীন দেববর্মনের গান গাইতাম, শুধুই রেকর্ড থেকে শুনে গানটা গেয়ে যাওয়া। তারাপদ চক্রবর্তী বা পরবর্তীকালে চিন্ময় লাহিড়ীর কাছে শিখতে গিয়ে বুঝলাম শচীন দেববর্মন কেন স্বরগুলি ওভাবে লাগালেন, কোথায় উচ্চারণ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং কেমনভাবে গানের চেহারাই বদলে গেল। 'কুহু কুহু কোয়েলিয়া' গানে সামান্য ছেদ দিয়ে দেখি ফল অন্যরকম হল। 'রঙ্গিলা রঙ্গিলা রঙ্গিলা' গানের প্রথম লাইনেই সামান্য অনুরণন অন্য মেজাজ আনত। লোকসংগীত গাইতে গেলেও শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষা অন্য ফল আনতে পারে।'

আমি বুঝতে পারলাম বহু দিন আগে একটি জলসায় অনেক নামজাদা শিল্পীর মাঝখানে একজন শিল্পী গান গাইতে বসলেন, কম নামী অখিলবন্ধু ঘোষ। প্রায় প্রত্যেকেই দুটি গান গাইছিলেন, অখিলবন্ধু ঘোষ গাইলেন তিনটি শচীন দেববর্মনের গান। আমাদের বিরক্তি তখন চরমে। শেষে যে প্রচন্ড হাততালি উঠেছিল, সেটা উৎসাহের নয়, প্রত্যাখ্যানের। এই একবারই, তারপরে আর কান ফেরানো যায়নি। সুধীরলাল চক্রবর্তী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য সকলেই গাইছেন; একই আসরে অখিলবন্ধু ঘোষ। কিন্তু তাঁর গান শুনতে শ্রোতা বাধ্য। একটা হিসেব পাশাপাশি রাখলে সুবিধে হবে। পাশাপাশি শিল্পীদের মত মাঝে মাঝে অখিলবন্ধু ঘোষের রেকর্ড বেরোয় না, প্লেব্যাক প্রায় নেই বললেই চলে – অথচ তাঁর গানের আকর্ষণ আলাদা। আসরে বসে 'বধূ গো এই মধু মাস বুঝিবা বিফলে গেল' শুরু হতেই সকলে চুপচাপ। একমাত্র সুধীরলাল চক্রবর্তী ছাড়া অখিলবন্ধু তখনকার দিনের একমাত্র শিল্পী – যিনি বেতারে খেয়াল-ঠুংরীর সংগে আধুনিক গানের অনুষ্ঠান করছেন।

এই গায়কীর ফলে একটা নতুন ধারার সৃষ্টি হল। যেটার ভিত্তি শচীন দেববর্মন, কিন্তু স্বকীয়তায় আরও কিছু। যেমন 'মায়ামৃগ সম', 'শিপ্রা নদীর তীরে' গানগুলি অন্য কেউ রেকর্ড করলে অন্য চেহারা নিত। 'ও দয়াল বিচার কর' গানটিতে শ্রোতারা অনেক দিনের পর শচীন দেববর্মনের অনায়াস ভঙ্গিটিকে খুঁজে পেলেন। 'তোমার ভুবনে ফুলের মেলা' বা 'কেন প্রহর না যেতে' গানগুলিতেও অন্য মেজাজ। নাম না করেও বলা যায় বহু শিল্পী, পূর্বসূরীর কণ্ঠ বা সুরের অনুসরণ করেছেন কিন্তু এরকম স্বকীয়তা আনতে পারেননি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রেকর্ড করা 'কে যায় সাথীহারা মরু সাহারায়' গানটি অখিলবন্ধু ঘোষের গলায় যদি কেউ শুনে থাকেন তবেই তফাত বুঝতে পারবেন।

শচীন দেববর্মনের গান ছাড়া অখিলবন্ধু ঘোষের নজরুলগীতি খুব কম শুনেছি। হঠাৎই তিনি নজরুলগীতি গাইতে আরম্ভ করলেন – কিন্তু নিজের জোরেই প্রথম সারিতে চলে এলেন। কোনো বাড়াবাড়ি নেই, অথচ কথার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত, রূপটি ছবি হয়ে ফুটে উঠল। 'রস ঘনশ্যাম' গানে যে শান্ত সমাহিতিতে শ্যামকল্যাণ রূপটি বিস্ময়কর।

'পিয়ালশাখার ফাঁকে ওঠে' গানটির প্রসংগে অখিলদা বললেন, 'গৌরী একদিন বলল, কাল সকালে একবার বাড়িতে আয়, একটা গান লিখেছি। সকালে গেলাম, চা খেয়ে বললাম, আর এক কাপ চা বল। গানটি রোমাণ্টিক। মাঝে মাঝে সংসারের প্রয়োজন ছাড়াও ধার করতে হয়। গানটা পেয়েই প্রথম দুটি লাইন বিদেশী ছকে ফেললাম। জমে গেল – কিন্তু কোথাও বিদেশীয়ানা প্রকট নয়।

'এইভাবেই চলছে; সুরকার রতু মুখোপাধ্যায়, স্ত্রী দীপালি ঘোষ আমার কাজে পাশাপাশি থাকে।'

একটা কথা গোপনে বলি, ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে যখন জলসায় যেতাম তখন কোনদিন বউদিকে দেখিনি। গান শিখতে গিয়ে বউদিকে দেখেছি। এখন সব জায়গায় অখিলদার পাশে বউদি থাকবেনই। বউদি ছাড়া অখিলদা ভাবাই যায় না। ডি এল রায়ের 'বুড়োবুড়ি দুজনাতে মনের সুখে' গানটিতে যে অহর্নিশ বিবাদের কথা আছে, অখিলদাকে দেখলে সেটা মিথ্যে প্রমাণিত হবে। যদিও বয়েসে আমি ছোট, তবে এরকম বয়েসে এতখানি একাত্মতা দেখে হিংসে হয়। আমিও অপেক্ষা করে যাচ্ছি হয়ত বয়স বাড়লে যথার্থ প্রেমের আশ্বাস পাব। কিন্তু শুধু গানের বেলায় নয়, জীবনেও অগ্রহায়ণে কৃষ্ণচূড়া ফোটাতে পারে কজন?

অখিলদা লাজুক হেসে বললেন, 'জানিস এখনকার শিল্পীরা আসরে বসে ঘোষণা করেন, আমার গত বছরের পুজোর গান শুনুন, এবারে অমুক ফিল্মের গান শুনুন। নিজেদেরই পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। সেই আসরে আমি বসলে লোকে চেঁচায় 'মায়ামৃগ' 'শিপ্রা নদীর তীরে' 'পিয়ালশাখার ফাঁকে' ……। কয়েক যুগ আগের গান – জানি না কে জিতল! অথচ তাঁরা অনেক দামী শিল্পী। বাজারদর অনেক বেশি, আমাকে দেখলে 'ভাল আছেন?' এটুকুতেই বাক্যালাপ শেষ। আমরা বোধহয় স্ক্র্যাপ আয়রনের দলে। কিন্তু আসরে দু-তিন জন বাজিয়ে নিয়ে বসালে দর্শক অনুরোধ করে যেতে থাকে। সেদিনও দুর্গাপুরে গাইলাম 'ম্যয় নেহি মাখন খায়ো' – মায়ের প্রতি আবদার। লোকে হৈ হৈ করে উঠল। অথচ একজন সর্বভারতীয় শিল্পীর ওই রেকর্ড এখন বাজারে হু হু করে কাটছে।'

কিছুক্ষণ আনমনা থেকে অখিলদা বললেন, 'গান নেই, এখন শুধু হুল্লোড় আছে। ভেবে দ্যাখ আগে এত খুন, রাহাজানি ছিল না। ভাল গান শুনলে মানুষের মনটাই অন্যরকম হয়ে যায়। এখন গান-বাজনা শুনলে শুধু মারদাংগা করার ইচ্ছে হয়। কোনদিন ভাবতে পেরেছিলি, ঘরের বউকে পুড়িয়ে মারাটা প্রতি সপ্তাহে হেডলাইনের খবর হবে? আমার তো মনে হয় লংকা জয়ের পর অযোধ্যাতেও গানের প্রচলন ছিল না – নইলে রামচন্দ্র সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে বলতেন না।

'সিঁড়ি দেখে নামিস, রেলিংটা নড়বড়ে আছে।' নেমে এলাম।

বউদি ডেকে সন্তর্পণে বললেন, 'সব ঠিক বলেছে তো, তুমি চলে গেলেই বলবে যা সেইটা তো ভুলে গেলাম! প্রথম দিকের রেকর্ড, অনুপম ঘটকের সুর সব বলেছে তো?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ সবই ঠিক আছে।' রেলিংটা দেখতে নড়বড়ে কিন্তু রোজকার জীবনে যাকে পাশে নিয়ে চলতে হয়, সেই ভিতটি খুব শক্ত। তাই বয়েসের দিক থেকে অগ্রহায়ণ এলেও কৃষ্ণচূড়া ফুটেই যাবে অফুরান, অক্লান্ত।

মানব গুপ্ত

ছবি : সৌমিত্র মণ্ডল

কবিপক্ষে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য

প্রতিবারের মত এবারও রবীন্দ্রসদন কর্তৃপক্ষ কবিপক্ষের আয়োজন করেছিলেন, সংগীত, নাটক, নৃত্যনাট্য, আবৃত্তি ও গল্পপাঠের আসর। ৮ মে থেকে ২৪ মে পর্যন্ত রবীন্দ্রজন্মোৎসবের সময়সীমা প্রসারিত ছিল। এই প্রতিবেদনে 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা', 'তাসের দেশ' ও 'শাপমোচন' এই পাঁচটি অনুষ্ঠানের স্বতন্ত্র আলোচনায় সাম্প্রতিক রবীন্দ্রনাট্যের প্রযোজনার গতিপ্রকৃতি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা

কবিপক্ষে ত্রিবেণী-র নিবেদন 'চিত্রাঙ্গদা'। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় ছিলেন অনিল সেন। নৃত্যপরিকল্পনায়,ছিলেন রেখা মৈত্র এবং সংগীত পরিচালনায় ছিলেন সুমিত্রা সেন।

প্রথমে সংগীতাংশ কুরূপার ভূমিকায় শোনা গেল সুমিত্রা সেনের গান। তাঁর গান ভাল লাগে 'বধূ, কোন আলো লাগল চোখে'। রুণু দত্তের গাওয়া সুরূপার গান খুবই হৃদয়গ্রাহী। অর্ঘ্য সেন তাঁর সব কটি গানেই সাবলীল। যন্ত্রসংগীতে বিপ্লব মন্ডল, রঞ্জন মজুমদার, বিষ্ণু সাধুখাঁ ও ঘনশ্যাম পাইন তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

নৃত্যাংশে রেখা মৈত্রের কম্পোজিনশান প্রশংসনীয়। তাঁর নৃত্যশৈলী বলিষ্ঠ বলে কুরূপা চরিত্রটি তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন কথাকলি, ভরতনাট্যম এবং ওড়িশীর ব্যবহারে। তবে কুরূপার সখীদের দুর্বল লাগে। রেখা মৈত্র-র বেশি দীপ্তভাব অবশ্য একটি নাচে ভাল লাগে না – 'বধূ কোন আলো.....' গানের সঙ্গে নাচে। গানটিতে অনেক গভীরতা আছে। তাঁর নাচে এই গভীরতা ছিল না। গানের তুলনায় নাচ চটুল হয়ে যায়। অলকনন্দা রায়কে সুরূপার চরিত্রে চমৎকার মানিয়েছে। কুরূপার বলিষ্ঠতার ঠিক বিপরীত সুললিত দেহভঙ্গিমা দেখে সত্যি মনে হয়, 'এ কি সত্য! এ কি মায়া! ... ...' শুধু তিনি একটু বেশি মাত্রায় ওড়িশী ব্যবহার করেছেন – যেটা একঘেয়ে লাগে। অর্জুনের ভূমিকায় ছিলেন মলয় ভট্টাচার্য। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন তাঁর চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে, কিন্তু এই দুই নামী শিল্পীর মাঝখানে তিনি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। নাচের দিকে মন দিতে গিয়ে ভাব দিতে ভুলে যান, এবং 'অশান্তি আজ হানল ... ...' নাচে তাঁর মুখে হাসি দেখি। অর্জুনের অনুচরদের মধ্যে পার্থ ঘোষের নাচ বেশ পরিচ্ছন্ন এবং পরিশীলিত। সন্তু মুখার্জির আলোকসম্পাত নিচুমানের। বেশিরভাগ সময় মঞ্চ গা ছমছম করা অন্ধকারে ভরে থাকে।

চণ্ডালিকা

অতিরিক্ত মাত্রায় কথাকলির প্রয়োগ, বেশ কিছু যোগাসন এবং কত্থকের বোলের আতিশয্য – এই নিয়ে এক নতুন আঙ্গিকের 'চণ্ডালিকা' দেখা গেল রবীন্দ্রসদনে কবিপক্ষের উৎসবে। নির্দেশনায় ছিলেন মঞ্জুশ্রী চাকী সরকার। তিনি তাঁর চণ্ডালিকাকে গতানুগতিক ধারার বাইরে এনেছেন – প্রতিটি দৃশ্য নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন ধারায় হলেও দর্শকের চোখে পুরোপুরি



চণ্ডালিকা

ভাল লাগে না, বা বোধগম্য হয় না। আমার পাশের কিছু দর্শককে প্রায়ই বলতে শোনা যায় – 'কই, প্রকৃতি কোথায়?' কিংবা এই নাচটায় কি বোঝাচ্ছে?'

এইখানে আমরা দেখতে পাই আত্মাভিমানী, বিদ্রোহী এক প্রকৃতিকে, যে নিজের অধিকারের শক্তিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। নির্দেশিকা, নাটকের উপস্থাপনা এমনভাবে করেছেন যাতে দইওয়ালা বা আনন্দকেও মঞ্চে আনার প্রয়োজন হয়নি। অবশ্য তাতে নাটকের কোনো ক্ষতি হয়নি। প্রথমদিকে দশ-বারোটি মেয়ে মঞ্চে উপস্থিত, কোনটি প্রকৃতি চেনার উপায় নেই। তারা সবাই মাটিরকন্যা – সুখে, দুঃখে, আনন্দের আতিশয্যে তাদের ভাবোচ্ছ্বাস একসঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির ভূমিকায় ছিলেন রঞ্জাবতী সরকার – তাঁর নাচ আগেও দেখেছি – এবার তাঁকে অনেক পরিশীলিত মনে হল। বিশেষত, মায়া নৃত্যের সময় তাঁর অভিব্যক্তি মনে রাখার মত, কিংবা 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা' নাচে। মঞ্জুশ্রী নিজেও মায়ের চরিত্রে বলিষ্ঠ। কিছু কিছু নৃত্যশৈলীতে স্টেনজ বিউটি আছে, যেমন মায়া দর্পণ নিয়ে নাচ, অসংখ্য মায়া কন্যাদের ভেতর দিয়ে প্রকৃতির ভয়ার্ত মুখে বেরিয়ে আসা, 'চক্ষে আমার তৃষ্ণা', 'হৃদয়ে মন্দ্রিল' এবং 'আমার মালা ফুলের দলে' নাচগুলি। নৃত্যনাট্যের মধ্যে নাটকের প্রয়োগ ভাল লাগে – কিন্তু স্বরূপা দাসের ভাবলেশহীন গলায় সংলাপ একেবারেই মনে দাগ কাটে না। মঞ্চের বাইরে আনন্দ এবং দইওয়ালা-র উপস্থিতি আমরা টের পাই প্রকৃতি এবং চণ্ডাল কন্যাদের অভিব্যক্তিতে। শ্রীনন্দা চৌধুরী পরিষ্কার গলায় গান গেয়েছেন। গানে একমাত্র তাঁর নামই উল্লেখ করার মত। বিশেষ করে 'তোমারই মাটির কন্যা' গানটিতে তিনি



শ্যামা

স্বচ্ছন্দ। বিপ্লব মন্ডল দাপটে তবলা বাজিয়েছেন। নৃত্যে অংশগ্রহণ করেছেন ঝুমা বসাক, পিয়ালী পাল, সংঘমিত্রা মজুমদার, স্বরূপা দাস, গোপা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এদের টিম ওয়ার্ক খুব ভাল।

আনন্দধারা প্রযোজিত ডান্সারস্ গিল্ডের নিবেদন 'তোমারই মাটির কন্যা' ভাল হয়েও সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না তার কারণ সব ভঙ্গিমাতেই আতিশয্য। প্রায় প্রতিটি নাচে একই পদোত্তলন ভাল লাগে না। একঘেয়েমি আসে। তবু, স্বীকার করতেই হবে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যে একটি চমক সৃষ্টিকারী পরিবর্তন।

শ্যামা

'শ্যামা' বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন মঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই রচনার মধ্যে এমন এক নাটকীয়তা আছে যা অন্য কোনো নৃত্যনাট্যে পাওয়া যায় না।

কবিপক্ষে রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত 'শ্যামা' সম্বন্ধে নতুন কিছু লেখার থাকত না, যদি না, এটা নৃত্যাঙ্গনের প্রযোজনা হত। শান্তি বসুর নির্দেশনায় 'শ্যামা' একটি নতুন রূপ পেয়েছে – যদিও তিনি কোনোরকম নতুন আঙ্গিক এতে সংযোজন করেননি। একই উপস্থাপনা, তবু নৃত্যাঙ্গনের 'শ্যামা' যেন অন্য সব প্রযোজনাকে ছাড়িয়ে যায় – এবং এখানেই এর কৃতিত্ব।

বজ্র সেনের ভূমিকায় ছিলেন নির্দেশক স্বয়ং। কি পুরুষোচিত তাঁর নাচ। অতিরিক্ত পদসঞ্চালন নেই, নেই কোনো বাড়তি অভিনয়। শুধুমাত্র ভাবে এবং ব্যক্তিত্বে বোঝা যায় তিনি কি বলতে চাইছেন। বারবারই মনে পড়ছে সেই দৃশ্যটি – 'কাঁদিতে হবে রে পাপিষ্ঠা' অসাধারণ অভিনয় করেছেন শান্তি বসু। তেমনই ভাল লাগে 'প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে' নাচটি।

শ্যামার ভূমিকায় ছিলেন অলকনন্দা রায়। সাধারণত তাঁর নাচে অতিরিক্ত মাত্রায় ওড়িশী থাকে বলে একটু একঘেয়ে লাগে। কিন্তু এখানে তিনি একেবারে অন্যরকম। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভাল লাগে। বিশেষ করে শেষ দৃশ্যে, যেখানে তিনি অভিমান করে চলে যাচ্ছেন – অনবদ্য তাঁর অভিনয়।

কোটালের ভূমিকায় শিবশঙ্করণ যথাযথ। তাঁর চেহারা এবং কথাকলি আঙ্গিকে নাচ কোটাল চরিত্রেরই উপযোগী।

পরিচালক সম্মেলক নাচের দিকে ততটা মন দেননি। কিছু নাচ ভাল লাগলেও শিল্পীদের কারোর মুখেই এক্সপ্রেশন-এর বালাই ছিল না।

সংগীত পরিচালনায় ছিলেন বিভা সেনগুপ্ত। ঋতু গুহর কণ্ঠে শ্যামার গান চিত্তগ্রাহী। অর্ঘ্য সেন ও অভিরূপ গুহঠাকুরতার গানও ভাল লাগে। তবে বড় শিল্পীদের নিয়ে একটা অসুবিধে – তাঁরা কখনোই মহলা দিয়ে আসেন না। মঞ্চে উঠে হয় কোথায় গান ধরতে হবে জানেন না, না হয় সংগীতাংশেই গান ধরে ফেলেন, নয়তবা একবারের জায়গায় দুবার গেয়ে ফেলেন; এতে অসুবিধে হয় নৃত্য শিল্পীদের – এবারেও দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় এর ব্যতিক্রম ঘটাননি।

যাঁকে না হলে অনুষ্ঠান সুন্দর হতে পারত না, তিনি হলেন সুশীল দাস। তাঁর আলোকসম্পাত প্রশংসনীয়।

তাসের দেশ

'আগামী' গোষ্ঠী তাঁদের কর্মধারার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। নবীন শিল্পীদের যথাযোগ্য মর্যাদায় উপস্থাপিত করার কর্তব্য পালনে ব্রতী হওয়ার নজির তাঁরা রাখছেন।

কবিপক্ষে এই গোষ্ঠীর নিবেদন 'তাসের দেশ'। মঞ্চসজ্জার কথাতেই প্রথমে আসা যাক। বাসব গুপ্তের মঞ্চসজ্জা এক কথায় অপূর্ব। একেবারে নতুন তাঁর চিন্তাধারা। খুবই বর্ণময় এবং সুরুচিপূর্ণ কাজে মঞ্চটি প্রাণ পেয়েছিল। এর ওপর আলোর ব্যবহার ঠিকমত হলে প্রযোজনাটি সার্থক হতে পারত।

রাজপুত্রের ভূমিকায় নরেশকুমার চরিত্রোপযোগী। অবশ্যই তিনি নবীন শিল্পী নন। স্মৃতি তাঁকে



তাসের দেশ

প্রতারণা করেছে কিনা জানি না, তবে দেখা গেল রবীন্দ্রনাথের সংলাপের পরিবর্তে স্বরচিত সংলাপেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ।

রেখা মৈত্রর নৃত্য পরিকল্পনায় মুনশিয়ানা আছে। সম্মেলক নাচ বেশ ভাল লাগে। বিশেষ করে 'বাঁধ ভেঙে দাও' নাচটি খুবই চিত্তাকর্ষক। 'তাসের দেশ'-এর শিল্পীরা বেশির ভাগই নবীন। কাজেই প্রত্যেকের মধ্যেই প্রাণ ছিল। পরিচালিকা স্বয়ং হরতনী-র ভূমিকায় যথাযথ। সংলাপ উচ্চারণ তাঁর একেবারেই স্পষ্ট নয়। তাঁর কাছ থেকে আরো ভাল আশা করা যায়। সদাগরপুত্রের ভূমিকায় ছিলেন অসিত ভট্টাচার্য। তাঁর নৃত্যশৈলী পরিচ্ছন্ন এবং বলিষ্ঠ। যথেষ্ট নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার সঙ্গে তাঁর ভূমিকা তিনি পালন করেছেন। সংলাপ এবং অভিনয়েও তিনি ছিলেন সাবলীল। পঞ্জার ভূমিকায় পার্থ ভট্টাচার্যকে ভাল লাগে। ছক্কার ভূমিকায় আদিত্য মিত্র প্রতিটি ক্ষেত্রেই বড় তাড়াহুড়ো করে ফেলেছেন।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি চরিত্র নহলা পন্ডিত – বাসব গুপ্ত, গোলাম – সাম্যজিৎ মজুমদার, দহলনী – কন্যাকুমারী মুখোপাধ্যায় এবং সর্বোপরি রাজার ভূমিকায় সুবীর মিত্র তাঁদের সংলাপ উচ্চারণে প্রশংসার দাবি রাখেন। সংগীতাংশে রমা মন্ডল, রবীন মুখোপাধ্যায় এবং প্রভাত ভঞ্জের গান চিত্তগ্রাহী। সংগীত পরিচালক ছিলেন রবীন মুখোপাধ্যায়।

শাপমোচন

স্বর্গের সভায় প্রথমে 'নহ মাতা নহ কন্যা' গান তারপর সাদা পোশাক পরিহিত একটি সম্মেলক স্বর্গীয় নৃত্য, এরপর উর্বশীর নাচ – এই নিয়ে অতি ধীর গতিতে রাগিণীর 'শাপমোচন' শুরু হল।



শাপমোচন

উর্বশীর ভূমিকায় ছিলেন সোনালি চট্টোপাধ্যায়, সৌর সেনের ভূমিকায় ছিলেন নির্মল বর্মন এবং মধুশ্রীর ভূমিকায় ছিলেন অরুন্ধতী ভট্টাচার্য। এঁদের ভূমিকা যথাযথ।

নৃত্য পরিচালক অসিত চট্টোপাধায় সম্মেলক নাচে কথক এবং ভরতনাট্যম ব্যবহার করলেও, নিজে আগাগোড়া ওড়িশী ঢঙে নেচে যান। এবং প্রত্যেকটি নাচের শেষে তিনি ত্রিভঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। যেটা একেবারে পুরুষোচিত মনে হয় না, খুবই দৃষ্টিকটু লাগে। গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায় কমলিকা চরিত্রের তুলনায় একটু বেশি ভারিক্কী; নৃত্যশৈলী ভাল হলেও নাচের কমপোজিশন ভাল নয়। তার ওপর তাঁর পোশাক এত ভারী ছিল যে নাচতে অসুবিধা হচ্ছিল। এই নৃত্যনাট্যে নায়ক-নায়িকা কখনো পরস্পরের মুখের দিকে তাকান না, একেবারে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকেন। পাশের দর্শকটি ফিসফিস করে তাঁর বান্ধবীকে বললেন, 'বোধহয় গ্রীনরুমে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে।'

নাচের তুলনায় গান ভাল লাগে। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় অরুণেশ্বরের গানগুলি গেয়েছেন, কমলিকার গানে ছিলেন বাণী ঠাকুর। যন্ত্রসংগীতে ছিলেন বিপ্লব মন্ডল, দীনেশ চন্দ্র, কুমারেশ চন্দ্র ও অমর চন্দ্র। মঞ্চসজ্জায় ছিলেন নির্মল বর্মন। তিনি তক্তপোশের ওপর একটি ম্যাড়মেড়ে সতরঞ্চি পেতে দেখিয়েছেন কি অসাধারণ মঞ্চসজ্জা করা যায়। গ্রন্থনায় পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ ও শচীন ভট্টাচার্য তাঁদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেন।

কনিষ্ক সেনের আলোকসম্পাত সম্বন্ধে কিছুই বলার নেই। বহু কসরৎ করে যথারীতি তিনি মঞ্চে অন্ধকার নামিয়েছেন।

অনামিকা

আহ্বানের নাট্যোৎসব

সম্প্রতি কলামন্দিরে ছ'দিনের এক নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিলেন 'আহ্বান'। 'আহ্বান' সংস্থাটি সদ্যোজাত। এই নাট্যোৎসবের মাধ্যমেই তাঁদের প্রথম প্রকাশ। প্রথমেই কিন্তু তাঁরা বেশ বড় কাজ দিয়ে শুরু করেছেন। নাট্যোৎসবের আগে তাঁরা এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁদের উদ্দেশ্যর কথা জানান। সংস্থার সভাপতি মহাশ্বেতা দেবী, সম্পাদিকা উর্মিমালা পুরি এবং ওই দিনের বিশেষ অতিথি শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের বক্তব্যে নাট্যোৎসবের নানা দিক তুলে ধরেন। এই নাট্যোৎসবের উদ্দেশ্য ছিল, প্রাপ্ত অর্থ 'অভিনেতৃ সঙ্ঘের' তহবিলে দান করা।

যে সংস্থা সদ্য গড়ে উঠেছে তাঁদের পক্ষে নামী-দামী দল এনে নাট্যোৎসব করাটা খুব সহজ নয়। এ ব্যাপারে সবরকম আর্থিক সাহায্য করেছেন ভি এস টি ইন্ডাস্ট্রি (চার্মস সিগারেট)। এঁদের পক্ষ থেকে কুমার মঙ্গলম জানালেন, শুধু বাণিজ্যিক প্রচার নয়, শিল্প সংস্কৃতির উন্নতিকল্পে তাঁরা এ কাজে এগিয়ে এসেছেন।

প্রথম দিন অভিনীত হয় বহুরূপীর 'আগুনের পাখি'। এ নাটকটি এখন নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে, বোধহয় সেই কারণেই নাট্যপ্রেমীরা ওইদিন নাটকটি দেখার তেমন তাগিদ অনুভব করেননি। প্রায়-ফাঁকা হলেই বহুরূপীর এই নাটকটি অভিনীত হল।

দ্বিতীয় দিনের তালিকায় ছিল ত্রি-তীর্থ-র 'জল'। মহাশ্বেতা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই নাটকটির একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। বালুরঘাটের দলটির অভিনয় তো এখানে সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। ছোটখাট কিছু ত্রুটি থাকলেও অভিনয়গুণে 'জল' সকলের হৃদয় জয় করেছে। কলকাতার বাইরে থেকে আসা এই দলটি কলকাতাবাসীর প্রশংসা আগের মতোই আদায় করেছে।

নাট্যোৎসবের তৃতীয় দিন ছিল পি এল টি-র 'এবার রাজার পালা'। নাটকটি পুরনো প্রযোজনা এবং বহু আলোচিত। তবুও এখনো দেখতে বসে একটা কথাই মনে হয় – নাটকের সবরকম দাবি মিটিয়েও, তাকে শিল্প ভেবে এর সংলাপে কি আমরা রুচিবোধের আশা করতে পারি না?

চতুর্থ দিনের চেতনার 'জগন্নাথ' এখনো মাঝে মাঝে অভিনীত হয়, জানা গেল তবুও এইদিন টিকিট বিক্রির হার সর্বাধিক। নাটকটির নিজগুণে, সন্দেহ নেই।

পঞ্চম দিনের সূচীতে ছিল সুন্দরমের 'সাজানো বাগান'। হল দেখে মনে হচ্ছিল এ নাটকটি আগে প্রায় সকলেই দেখেছেন। প্রথম অংশে একটু একঘেয়ে লাগলেও দ্বিতীয় পর্বে নাটকটি সকল দর্শককে ধরে রাখে।

উৎসবের শেষ দিন অভিনীত হয় চেনামুখের 'আগশুদ্ধি'। নাটকটি চেনামুখের নতুন প্রযোজনা। এর মধ্যে অবশ্য পুরস্কৃতও হয়েছে। নানা আকর্ষণেই নাট্যপ্রেমীদের ভিড় ওইদিন চোখে পড়ে। বিষয়বস্তু, নাট্যবিন্যাস ও তার বক্তব্য বিতর্কের সৃষ্টি করলেও অভিনয়, নির্দেশনা এবং স্টেজক্র্যাফট প্রশংসার দাবি রাখে।

নাট্যোৎসব শেষ হলেও তার উদ্দেশ্য কতটা সফল হল এ সংশয় থাকেই। হলের চেহারা দেখেই টিকিট বিক্রির হার অনুমান করা গিয়েছিল। যে তহবিলে অর্থসাহায্য করার উদ্দেশ্যে নাট্যোৎসব, সেখানেই যদি সেরকম কিছু না দেওয়া যায় তাহলে এত বড় আয়োজনই ব্যর্থ। নাটক নির্বাচনের ব্যাপারে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ছিল। নতুন সংস্থার অনভিজ্ঞতার দরুন আরো নানা ব্যাপারে ত্রুটি থেকে গেছে, যা নাট্যোৎসব আয়োজকদের কাছে অভিপ্রেত নয়। তবুও এঁরা ভাল কাজ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছেন, সেজনাই ধন্যবাদার্হ।

ঝুমুর কুমারী

যোগ-বিয়োগ

উনিশশো তিপ্পান্ন সালের দশ জুলাই কলকাতায় মুক্তি পেয়েছিল পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি 'যোগ-বিয়োগ'। তিন দশক পরে নিজের সেই ছবিই রিমেক করলেন পিনাকীবাবু, ঘটনাটা সবাক বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম। যৌথ পরিবারের প্রধান অবলম্বন ক্রমশ নিঃস্ব হতে থাকলে যে ভাঙন শুরু হয়, তারই পটভূমিতে আশাপূর্ণা দেবীর জমজমাট গল্পটা একেবারে টালিগঞ্জের মেজাজ ও মাপ-মতো। যে যে মালমশলা যতটুকু থাকলে সার্থক পারিবারিক বায়োস্কোপ তৈরি হয় বলে টালিগঞ্জের ধারণা, সেটা বেমালুম যোগ-বিয়োগ করে চমৎকার কাজে লাগিয়েছেন পরিচালক। কোনোরকম সেক্স, ভালগারিটি, চটুল নাচ-গান নেই। ছবি দেখতে বসে আপনার ঘুম পাবে না। বেরিয়ে এসে গাঁটের পয়সায় মাথা ধরার ট্যাবলেট কিনতে হবে না।

রায়বাহাদুর যামিনীমোহনের চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের দাপটের অভিনয়ের কথা মনে রেখেই বলছি, এবারে অনিল চট্টোপাধ্যায়ও অসাধারণ। তাঁর স্ত্রী সন্তোষিণীর ভূমিকায় মাধবী চক্রবর্তীও আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন গল্পের সঙ্গে। এই দেবতুল্য মামা ও স্নেহময়ী মামীর কাছেই ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছে গোবিন্দ (তাপস পাল)। লেখাপড়া শেখেনি, তাই আপিসে চাকরির যোগ্যতা নেই, ইচ্ছেও নেই। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এই হৃদয়বান যুবকটি তাই সাংসারিক বিচারে অপদার্থ। স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় করেছেন তাপস। বাড়িতে বিধবা বড়দি, তিন দাদা, দুই বউদির কাছে অপমানিত, অবহেলিত এই গোবিন্দর জন্য তার স্ত্রী গৌরীর মানসিক কষ্ট, অসহায়তা চমৎকার ফুটিয়েছেন মহুয়া রায়চৌধুরী। ভাল লাগল শকুন্তলা বড়ুয়া (মেজ বউ) ও তপতী ভট্টাচার্যর (ছোট মেয়ে গীতা) সাবলীল অভিনয়।

অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য এমনিতে টান টান, তবে কোনো কোনো জায়গায় নাটক আরো জমে ওঠার সুযোগ খামোকা হাতছাড়া হয়েছে। শেষ দৃশ্যেও স্বার্থপর দাদাদের মানসিক পরিবর্তন যেন হঠাৎই ঘটে গেল, পরিবর্তনটাও খুব স্পষ্ট নয়। গোবিন্দর ক্লাবের শারীরিক কসরতের দৃশ্য আরো আকর্ষণীয় করে তোলার সুযোগ ছিল। মামার বাড়ি থেকে বউ সমেত বিতাড়িত গোবিন্দর কারখানায় শ্রমিকের ভূমিকায় হাতুড়ি পেটানোর ভঙ্গি বেজায় মনোরম, চিত্রতারকা তাপস পালের গ্ল্যামারও এতটুকু টসকালো না!

রঙিন ছবিতে কী ধরনের মেক আপ ব্যবহার করতে হয়, সে ব্যাপারে রূপসজ্জাকার দুর্গা চট্টোপাধ্যায় তেমন ভাবনা-চিন্তা করেছেন বলে মনে হল না। রঙিন ফিল্ম কি শুধু ধ্যাবড়া-ধ্যাবড়া রঙ দেখানোর জন্য? ছবির কোনো দৃশ্যেই রঙের বাস্তব বা স্বাভাবিক টোন আনতে পারেননি ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণ চক্রবর্তী। সুনীল সরকারের শিল্প-নির্দেশনাও বড়ই কাঁচা হাতের। হায়, ইস্টম্যানসায়েব!

রবীন দাশের সম্পাদনা, ভি বালসারার আবহ সংগীত মন্দ নয়। কিন্তু কোনো গানেরই লাইন বা সুর, কখনো বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপও, বুঝতে পারিনি। কৃতিত্বটা সাউন্ড রেকর্ডিস্ট-এর, না কি বাংলা ছবিকে পথে বসাতে প্রেক্ষাগৃহের অপারেটর-এর মুনশিয়ানা (আমি ছবিটা দেখেছি 'উত্তরা' সিনেমায়), বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের স্বার্থে বিষয়টা তদন্ত হওয়া দরকার।

সুজয় সোম

এ পক্ষের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান

মঞ্চ

১ জুলাই : রবীন্দ্রসদনে বুধসন্ধ্যার অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে থিয়েটার কমিউন-এর নাটক, শিশির মঞ্চে অনুভব নাট্যগোষ্ঠীর নাটক,

২ জুলাই : শিশির মঞ্চে বর্ধমান নটরাজ ইউনিট-এর নাটক, মুক্তাঙ্গনে বিনোদন গোষ্ঠীর নাটক, বিজনে আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয়ের নাটক রক্তকরবী।

৩ জুলাই : রবীন্দ্রসদনে সংস্তব-এর নাটক, অ্যাকাডেমিতে চেনামুখ সংস্থার নাটক, মুক্তাঙ্গনে সপ্তক গোষ্ঠীর নাটক, বিজনে আরব্ধ নাট্য বিদ্যালয় নিবেদিত তৃপ্তি মিত্রের একক অভিনয় অপরাজিতা।

৪ জুলাই : রবীন্দ্রসদনে সম্বিৎ সাংস্কৃতিক সংস্থার অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে চার্বাক-এর নাটক।

৫ জুলাই : রবীন্দ্রসদনে সুরর্ষি সংস্থার অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে শূদ্রক-এর নাটক, মুক্তাঙ্গনে থিয়েটার টুডে গোষ্ঠীর নাটক ফেরা,

সংস্কৃতি সংবাদ ও আলোচনা

বিজনে সায়ক গোষ্ঠীর নাটক

৬ জুলাই : রবীন্দ্রসদনে রুদ্রবীণা সংস্থার অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে পি. এল. টি-র নাটক, মুক্তাঙ্গনে শৌভনিক-এর নাটক রামনাম কেবলম্।

৭ জুলাই : রবীন্দ্রসদনে সকালে পল্লবী সংস্থার অনুষ্ঠান – সন্ধ্যায় সার্বনিক-এর অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে সকালে নাট্যায়ন-এর নাটক – সন্ধ্যায় বহুরূপী গোষ্ঠীর নাটক।

৮ জুলাই : রবীন্দ্রসদনে রবিবিতান-এর অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে পঞ্চম বৈদিক-এর নাথবতী অনাথবৎ।

৯ জুলাই : রবীন্দ্রসদনে শিল্পী যাযাবর সংস্থার অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে চেতনা গোষ্ঠীর নাটক।

১০ জুলাই : রবীন্দ্রসদনে অনার্য গোষ্ঠীর নাটক, অ্যাকাডেমিতে নান্দীকার-এর নাটক।

১১ জুলাই : অ্যাকাডেমিতে থিয়েটার ওয়ার্কশপ-এর তিনদিন ব্যাপী নাট্যসন্ধ্যার প্রথম সন্ধ্যা।

১২ জুলাই : রবীন্দ্রসদনে ছন্দনীড়-এর অনুষ্ঠান, শিশির মঞ্চে থিয়েটার সেন্টার-এর নাটক বিষবৃক্ষ।

১৩ জুলাই : রবীন্দ্রসদনে ছন্দনীড়-এর অনুষ্ঠান।

১৪ জুলাই : রবীন্দ্রসদনে সকালে অন্নপূর্ণা সংস্থার অনুষ্ঠান – সন্ধ্যায় সুরমন্দার-এর অনুষ্ঠান,

১৫ জুলাই : অ্যাকাডেমিতে ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট আয়োজিত সাতদিন ব্যাপী ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম সন্ধ্যা।

বেতার

১ জুলাই : চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, আকবর খানের খেয়াল সকাল ৮-৩০, পূরবী মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত রাত ১০-৫০।

২ জুলাই : ত্রিবেণী সংস্থার রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, রাত ৯-৩০-এ কবিতা সিংহ প্রযোজিত অভিজ্ঞান অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধার্ঘ্য লেখক ও মানুষ প্রমথনাথ বিশী।

৩ জুলাই : অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সেতার সকাল ৮-৩০, পূরবী দত্তের নজরুলগীতি রাত ১০-৪০, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্যামাসংগীত রাত ১০-৫০।

৪ জুলাই : ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, হিমাংশু বিশ্বাসের সন্তুর বাদন সকাল ৮-৩০, অখিলবন্ধু ঘোষের আধুনিক গান রাত ১০-৫০।

৫ জুলাই : শিখা বসুর রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, রাত ৮টায় বাংলা নাটক – ছেলে বনাম জামাই, রচনা – হীরেন চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজনা – শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসুর আধুনিক গান রাত ১০-১০।

৬ জুলাই : চিত্রা সেনগুপ্তের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্যের সেতার দুপুর ১টায়।

৭ জুলাই : পূর্বা দামের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, দুপুর ২-৪৫-এ বাংলা নাটক – পোস্ট মর্টেম, কাহিনী – সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বেতাররূপ – শংকর দাশগুপ্ত, প্রযোজনা – সুভাষ দাস।

৮ জুলাই : চিত্রলেখা চৌধুরীর রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত রাত ১০-৫০।

৯ জুলাই : সুশীল মল্লিকের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরোদ সকাল ৮-৩০।

১০ জুলাই : গীতবিতান সংস্থার রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের খেয়াল সকাল ৮-৩০, সুবিনয় রায়ের রবীন্দ্রসংগীত রাত ১০-৫০।

১১ জুলাই : সুমিত্রা রায়ের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, দেবিকা দেবীর সেতার সকাল ৮-৩০, নিমাইচাঁদ বড়ালের আলাপ ও ধ্রুপদ রাত ৯টায়।

১২ জুলাই : চিত্রা রায়ের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, রাত ৮টায় বাংলা নাটক – মুচিরাম গুড়, কাহিনী – বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নাট্যরূপ – অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, পরিবেশনায় – পেটেন্ট থিয়েটার, অনিতা মজুমদারের আধুনিক গান রাত ১০-১০।

১৩ জুলাই : ধীরা মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, বকুল চট্টোপাধ্যায়ের খেয়াল দুপুর ১-০০, বিকেল ৩টায় বাংলা নাটক – মরুপথের যাত্রী, রচনা – শচীন ভট্টাচার্য, প্রযোজনা – অজিত মুখোপাধ্যায়।

১৪ জুলাই : বিভা সেনগুপ্তের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের খেয়াল সকাল ৮-৪০, দুপুর ২-৩৫-এ বাংলা নাটক – রক্তক্ষণ, কাহিনী – তপোবিজয় ঘোষ, প্রযোজনা – নির্মল গুহ।

১৫ জুলাই : অমল নাগের রবীন্দ্রসংগীত সকাল ৭-৪০, বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের সেতার দুপুর ১২-২০, গণপতি পাঠক ও সম্প্রদায়ের কালীকীর্তন রাত ১০-১৫।

'সুকন্যা'র পাতায় জ্যোতিষী অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

একদিন জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে পিতৃমাতৃহারা হলেন একালে স্বনামখ্যাত জ্যোতিষী অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। তখনই শুরু হলো তাঁর জীবন ও জ্যোতিষ সম্পর্কে এক অক্লান্ত অন্বেষণ। ভাটপাড়ার বিশিষ্ট জ্যোতিষী হরিচরণ ভট্টাচার্য ও ভদ্রেশ্বরের অনিল মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক প্রেরণায় অরুণকুমার জ্যোতিষের সত্যানুসন্ধানের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। ভদ্রেশ্বরের বাবুঘাটে (শ্মশান) গঙ্গার ধারে বসে তরুণ তাপস অরুণকুমার জ্যোতিষশাস্ত্রকে জানতে চেয়েছেন গবেষকের মত নিষ্ঠায়। দিনের পর দিন বিভিন্ন স্তরের মানুষের হাত দেখেছেন বিনা পারিশ্রমিকে। প্রায় চার বছর ধরে পনেরো হাজার মানুষের হাত দেখেছেন গবেষকের দৃষ্টিতে, লক্ষ্য করেছেন হাতের রেখার গতিপ্রকৃতি ও হাতের গঠন–আকৃতি। এই সঙ্গে অসংখ্য দেশী-বিদেশী গ্রন্থ পাঠও করেছেন।

জ্যোতিষী অরুণকুমার বিভিন্ন গুণের অধিকারী। একসময় সর্বোত্তম চট্টোপাধ্যায় এই নামে অভিনয় জগতেও বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। এছাড়া গীতিকার ও সুরকার হিসাবেও তাঁর এক পরিচিতি আছে। তাঁর গানের লং প্লেয়িং রেকর্ডও বেরিয়েছে। কিন্তু সবকিছুর উপর তাঁর জ্যোতিষসাধনায় প্রতিভা–স্ফুরণ সকলকে করেছে বিস্মিত। জ্যোতিষশাস্ত্র যে কত অভ্রান্ত তা অরুণকুমার একের পর এক বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রমাণ করেছেন।

হস্তরেখা বিজ্ঞান ও সংখ্যাতত্ত্ব এই দুইটি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্রের সাহায্যে প্রায় সাতাশ/আটাশ হাজার মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে তাঁর উক্তি আজও ভুল প্রমাণিত হয়নি।

'সুকন্যা'তে ১৬ জুলাই '৮৫ থেকে অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় শুরু করছেন জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর ধারাবাহিক কয়েকটি মূল্যবান রচনা, যা যে-কোনো পাঠক–পাঠিকাকে নিজের নিজের ভাগ্যের শুভাশুভ জানতে সাহায্য করবে। এছাড়া জ্যোতিষশাস্ত্রের শিক্ষার্থীরাও এই রচনায় পাবেন যথার্থ অনুশীলন পদ্ধতি।

জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে পেশাদারি বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে জ্যোতিষী অরুণকুমার 'সুকন্যা'র পাঠক–পাঠিকাদের জন্য দেবেন তাঁর সত্যসাধনালব্ধ কয়েকটি তথ্য, যা আজ পর্যন্ত অন্য কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

জ্যোতিষী অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় এ–যাবৎ যেসব খ্যাতনামা ও নাম্নীদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তাঁরা হলেন – চলচ্চিত্রে উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, মৃণাল সেন, রঞ্জিত মল্লিক, শর্মিলা ঠাকুর, অমিতাভ বচ্চন। খেলার জগতে পি কে ব্যানার্জি, সুনীল গাভাসকর, অরুণ ঘোষ, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সমরেশ চৌধুরী, বিদেশ বসু, শ্যাম থাপা, গৌতম সরকার ও অনেক খেলোয়াড়। সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, পূর্ণেন্দু পত্রী, প্রবোধবন্ধু অধিকারী প্রমুখ। নাট্যকার রাসবিহারী সরকার, ভৈরব গাঙ্গুলি ও ব্রজেন দে।

এছাড়া সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে সফল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে। এঁদের মধ্যে আছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, চরণ সিং, জগজীবন রাম সহ একাধিক মন্ত্রী। বিদেশে রাশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ব্রেজনেভ, ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার প্রমুখ।

আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ গায়ক মাইকেল জ্যাকসন

আলোলিকা মুখোপাধ্যায়

সত্তর দশকের প্রথম দিকে রেকর্ডে এবং টেলিভিশনে একটি কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর যে গান গেয়ে সারা আমেরিকায় সাড়া জাগিয়েছিল, সে গানের নাম – "Never can say good-bye." কিশোরটির নাম মাইকেল জ্যাকসন। এখন তাঁর বয়স ২৭ বছর। মার্কিন পপ ও রক সংগীত জগতে এখনও তিনি সমানভাবে জনপ্রিয়। সাদা-কালো নির্বিশেষে অসংখ্য তাঁর অনুরাগী শ্রোতা। আমেরিকার সংগীত জগতের মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার "Grammy Award"-এর সাম্প্রতিক উৎসবে তিনি এক বছরে আটটি পুরস্কার লাভ করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। পুরস্কারগুলি হল যথাক্রমে :





মাইকেল জ্যাকসন

১। গত এক বছরে রেকর্ড অ্যালবামগুলির মধ্যে মাইকেল জ্যাকসনের "Thriller" পেয়েছে "Album of the year" পুরস্কার।

২। তার "Beat it" গানটি হয়েছে "Record of the year."

৩। "Beat it" গেয়ে পেয়েছেন "Best Rock Performances"এর পুরস্কার।

৪। "Billie Jean" গেয়ে পেয়েছেন "Best new rhythm and blue songs"-এর পুরস্কার।

৫। "Billie Jean". গানের জন্য "Best male rock and band permormance"-এর পুরস্কার।

৬। "E.T. The Extra Terrestrial" গান এবং পাঠের জন্যে, "Best Children's Album"-এর পুরস্কার।

৭। "Thriller Single"-এর জন্য "Best male pop performance"-এর পুরস্কার।

৮। "Thriller"-এর জন্যে মাইকেল পেয়েছেন যৌথভাবে "Best producer of the year"-এর পুরস্কার।

১৯৮৩ সালের হিসেব পর্যন্ত মাইকেল জ্যাকসনের গাওয়া রেকর্ডের বিক্রির সংখ্যা পৌঁছেছে ১০০ মিলিয়নে। আর্থিক সাফল্যের মাপকাঠি অনুযায়ী তিনি আক্ষরিক অর্থেই "মিলিয়নেয়ার"।

মাইকেল জ্যাকসনের জন্ম ১৯৫৮ সালের ২৯ আগস্ট ইন্ডিয়ানা স্টেটের এক নিম্নমধ্যবিত্ত কালো পরিবারে। নয় ভাইবোনের সঙ্গে অভাব, দারিদ্র্যের মধ্যেই সে বড় হয়ে উঠছিল। বাবা জোসেফ প্রথম



জীবনে পেশাদার গিটারবাদক ছিলেন। কিন্তু সংসার প্রতিপালন করার তাগিদে শ্রমসাপেক্ষ চাকরি করতে করতে সুর একরকম তাঁর জীবন থেকে হারিয়েই যাচ্ছিল। আশা ছিল, সন্তানদের মধ্যে দিয়ে যদি সুরের জগৎকে ফিরে পেতে পারেন। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে গিটার নিয়ে গান গাইতে বসতেন। দু বছর বয়সে মাইকেল তার দাদাদের সঙ্গে গলা মেলাবার চেষ্টা করত। পাঁচ বছর বয়সে তার সুর শুনে সকলের ধারণা হয়েছিল, পরিবারের মধ্যে সেই হবে প্রকৃত গায়ক। পাঁচ ভাই মিলে দল তৈরি করল, নাম দিল "জ্যাকসন ফাইভ"। শুরু হল দল বেঁধে গিটার বাজিয়ে নেচে নেচে পপ গান গাওয়া। বাবার তত্ত্বাবধানে তারা নিয়মিত পপ গানের চর্চা শুরু করেছিল। খেলাধুলোর সময় নেই, অন্য কোনো আমোদ-প্রমোদের অবকাশ নেই, শুধু গান নিয়ে সময় কাটানো দেখে তাদের বন্ধুরা বিদ্রূপ করত। জ্যাকসনদেরও মাঝে মাঝে ধৈর্যচ্যুতি ঘটত, রেওয়াজে ভাটা পড়ত। কিন্তু বাবার অসীম ধৈর্য আর তালিম দেবার উৎসাহে তারা আবার গানের চর্চায় মনোযোগী হত। গান, বাজনা শেখার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল নাচের মহড়া। সাত বছর বয়সে মাইকেল নেচে সবাইকে অবাক করে দিত। কেউ তাকে নিয়ম করে নাচ শেখায়নি। কোথা থেকে সে



শৈশবে মাইকেল জ্যাকসন

এক মৌলিক ঢং আবিষ্কার করেছিল – যা দেখে তার বাবা-মাও আশ্চর্য হয়ে যেতেন। তবে গায়ক James Brown, যাঁকে ষাটের দশকে "God father of soul" (কালোদের নিজস্ব গান Soul Music) বলা হত, – তাঁর প্রভাব অবশ্যই জ্যাকসনদের ওপর ছিল। তাঁর নাচে নতুন ধরনের পদক্ষেপ, Split (দু পা দুদিকে ছড়িয়ে বসে পড়া), অদ্ভুত ভঙ্গিমায় হাঁটা, দেহসঞ্চালন মাইকেলকে তার নাচের ভঙ্গিমা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। এছাড়া আমেরিকার সর্ববৃহৎ নিগ্রো ব্যবসা সংস্থা "Motown Record Corporation"-এর দ্বারাও তারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ওই কোম্পানির কাজ ছিল অল্পবয়স্ক শিল্পীকে আবিষ্কার করে তার গানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল – যুবসমাজের জন্য যুবশিল্পী সৃষ্টি। জ্যাকসনরা একদিন ওই কোম্পানির সুনজরে পড়বে এই আশায়, তাদের নিজস্ব শিল্পীদের নাচ, গান, পোশাক-আশাক সবই গ্রহণ করার চেষ্টা করত।

ইতোমধ্যে স্থানীয় এক রেকর্ড কোম্পানির দৌলতে জ্যাকসনদের দুটি গান রেকর্ড হল। সেরকম কিছু প্রচার হল না, তবে মোটামুটিভাবে জনপ্রিয় হল। এদিকে শহরের মধ্যে তো বটেই, বাইরের নানা অনুষ্ঠানে, নাইট ক্লাবে তাদের ডাক আসতে লাগল। পারিশ্রমিক ছিল অনুষ্ঠান পিছু মাত্র আট ডলার। কিন্তু মাইকেল আর তার দাদা মার্লন নেচেই অনেক উপার্জন করতে লাগল। তাদের Split আর Spin (মাটিতে বসে বনবন করে ঘোরা), বিশেষ কায়দায় হাঁটা (Moon Walk) দেখে মুগ্ধ দর্শকরা ৩০০ ডলার পর্যন্ত মঞ্চে ছুঁড়ে দিত। এই ভাবেই জ্যাকসন পরিবারে আর্থিক সাচ্ছল্য এল। স্কুলে তিন ঘণ্টা করে পড়াশোনা আর বাকি সময় নাচ, গানের অনুষ্ঠান – এই ছিল তাদের জীবনযাত্রা। বড় বড় শহরে নামকরা শিল্পীদের একক অনুষ্ঠানের আগে জ্যাকসনরা উদ্বোধনী গান গাইবার আমন্ত্রণ পেল। চতুর্দিকে তাদের নাম ছড়িয়ে পড়ছিল সে সময়। ফলে Motown কোম্পানি থেকে ডেট্রয়েটে রেকর্ডের অডিশনের জন্যে ডাক এল। তারা উত্তীর্ণ হয়ে বিশেষ শিক্ষার জন্য নির্বাচিত হল। বিখ্যাত কালো গায়িকা ডায়ানা রস তাদের সে সময়ে খুব সাহায্য করেছিলেন। মাইকেলকে গান শেখানোর ভার নিলেন তিনি। বাকি ভাইরা ক্যালিফোর্নিয়াতে কোম্পানির তত্ত্বাবধানে ও খরচে নাচ, গান ও শিল্পীসুলভ আদব-কায়দা শিখতে লাগল।

Motown থেকে প্রকাশিত "জ্যাকসন ফাইভ" বা "জে ফাইভ"দের প্রথম রেকর্ড "I want you back" দারুণভাবে জনপ্রিয় হল। রেডিওতে, নাইটক্লাবে, সারা আমেরিকার ঘরে ঘরে তখন এই গান। ১৯৭০ সালে গাওয়া চারখানা গানই রাতারাতি "জ্যাকসন ফাইভ"-কে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দিল। গানের কথা, সুর, গাওয়ার ভঙ্গি – সব কিছুর মধ্যেই যেন নতুনত্বের স্পর্শ ছিল। "ABC", "The love you save" "I'll be there" – হয়ে উঠল সবার প্রিয় গান। "জে ফাইভ" যেন আমেরিকার যৌবনের কণ্ঠস্বর। Motown খুব সতর্কতার সংগে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করত। সহজে সংবাদপত্র বা প্রচারমাধ্যমের সংগে যোগাযোগ করতে দিত না। এদিকে জ্যাকসন-ভক্তদের চিঠি পর্বতপ্রমাণ হয়ে জমা পড়ছিল রেকর্ড কোম্পানির অফিসে। পত্রপত্রিকাগুলিতে ছাপা হচ্ছিল তাঁদের নিয়ে মেয়েদের নানা প্রশ্ন, কৌতূহলপূর্ণ চিঠি। তাঁদের সংগে বহু মেয়েকে জড়িয়ে মুখরোচক গুজবও প্রকাশিত হচ্ছিল সেখানে। 'বিটলস', 'মংকিস'-দের পরেই 'জ্যাকসন ফাইভ' ছিল সে সময়কার সবচেয়ে জনপ্রিয় দল। তাদের বিশেষত্ব হল – এই প্রথম একটি কৃষ্ণাংগ দল শুধু তাদের জগতে নয়, সকল বর্ণের মানুষের কাছেই নিজেদের প্রতিভার জন্যে সমাদৃত হয়ে উঠেছিল। কিছুকাল পরে তাঁরা সপরিবারে ইন্ডিয়ানা ত্যাগ করে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ছোট শহরে চলে গেলেন। বাবা মায়ের হলিউডে থাকার ইচ্ছে ছিল না। নতুন পরিবেশে শান্ত অঞ্চলটিতে তখনও ভক্তদের ভিড় শুরু হয়নি। জ্যাকসনরা স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে পারতেন।

জ্যাকসন ফাইভদের জনপ্রিয়তা দেখে সে সময় ইউটা স্টেটের অসমন্ড পরিবার, পাট্রিজ পরিবার ইত্যাদিও শুরু করল সপরিবারে দল বেঁধে গান গাওয়া। জ্যাকসনদের অনেক মৌলিক সৃষ্টি রাতারাতি তারা রপ্ত করে নেবার চেষ্টা করল।

১৯৭০ সাল ছিল জ্যাকসনদের চূড়ান্ত সাফল্যের বছর। তারপর তাঁদের আর কোনো সমবেত রেকর্ড প্রথম স্থান অধিকারের মর্যাদা পায়নি। তবে বহু রেকর্ড প্রথম দশের মধ্যে স্থান পেয়েছে। "Mama's Pearl", "Never can say good-bye" দুটিই দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। "Sugar Daddy" লাভ করেছে দশম স্থান। ওই সময়ে মাইকেলের একক রেকর্ড "Got to be there" বাজারে সবচেয়ে বেশি হিট গান হিসেবে বিখ্যাত হয়। তাঁদের কনসার্টগুলিতে শ্রোতার সংখ্যা যাবতীয় পুরনো রেকর্ডকে অতিক্রম করে গেল – এমন টিকিট বিক্রি হায়। লস অ্যাঞ্জেলস ফোরামে ১৮ হাজার শ্রোতা, নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে ১৯ হাজার শ্রোতা বিপুল হর্ষধ্বনিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত – এমনই জনসমাদর।

মা-বাবার মনে সবসময় চিন্তা – এত অল্প বয়সে, অতিরিক্ত অর্থ, নাম, যশ লাভ করে ছেলেদের কোনো ক্ষতি না হয়। দৈনিক ঈশ্বর উপাসনা, নিয়মিত স্কুলের পড়া শেষ করা, টেলিফোনে গল্প করার সময় পাঁচ মিনিটের বেশি নষ্ট না করা – এই সব নিয়ম তাঁদের মানতে হত।

১৯৭১ সালের গ্রীষ্মে জ্যাকসন ফাইভ' প্রথম টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেল। অনুষ্ঠানের নাম – "Going back to Indiana." তাঁদের শৈশবের বাড়িটিতে শুটিং হয়েছিল। টেলিভিশন অনুষ্ঠানের পর প্রচারমাধ্যমের দৌলতে তাঁদের পথে-ঘাটে বেরোনো কঠিন হয়ে পড়ল। মাইকেলকে ঘিরে সাদা-কালো মেয়েদের মিছিল। লাজুক, প্রিয়দর্শন, শান্ত চেহারার কালো ছেলেটি ঘরে বন্দী হয়ে বসে থাকে। আপন মনে গান লেখে, বাকি সময় মঞ্চে নাচ, গান করে। জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে তার সামাজিক জীবন, বন্ধুত্ব কোনো কিছুই গড়ে ওঠে না। হাজার হাজার উচ্ছ্বসিত মেয়ের ভিড়ে মনের মতো কাউকে খুঁজে নেবারও অবকাশ হয় না। ১৯৭২ সালে তাঁর একক গান "Ben" প্রথম স্থান অধিকার করল। আমেরিকার পপ গানের অনুরাগী মহলে জে ফাইভের চাহিদা ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। তিন বছরের মধ্যে তাঁদের দশটি গানের অ্যালবাম নিঃশেষ হয়ে



'জ্যাকসন ফাইভ' একটি অনুষ্ঠানে গান গাইছেন

লন্ডনের ওয়াক্স মিউজিয়ামে নিজের প্রতিমূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে মাইকেল জ্যাকসন



গেল। বিট্‌ল্‌সের সিনেমা "ইয়েলো সাবমেরিন"-এ জ্যাকসনদের নিয়ে কার্টুন চিত্র, বাজারে জে ফাইভ ছবি রং করার বই, জে ফাইভ পুতুল ভীষণভাবে বিক্রি হতে লাগল।

শিল্পী জীবনের প্রথম পাঁচ বছরে জ্যাকসনদের যে বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল, ক্রমশ সেটি কমে আসার সূত্রপাত হল। ১৯৭৫ নাগাদ তাঁদের সে চাহিদায় ভাটা পড়ল। কারণ, প্রথমত, গানের সুরের পুনরাবৃত্তি। পুরনো হিট গানগুলির সুরের প্রভাব আবার নতুন গানগুলিতে ফিরে আসায় শ্রোতারা নতুনত্বের অভাব অনুভব করলেন। দ্বিতীয়ত, ডিস্‌কো গানের চাহিদা। ১৯৭৩ সালে ডিস্‌কো মিউজিক সারা আমেরিকাতে সাড়া জাগাল। নাইট ক্লাবে, নাচের পার্টিতে হাততালি, Bass Drum-এর তালের সঙ্গে ওই নাচের বৈশিষ্ট্য লোকদের আকর্ষণ করল। Motown জ্যাকসন ফাইভকে দিয়ে ডিস্‌কোর রেকর্ড করাল কিন্তু ফল আশানুরূপ হল না। ডিস্‌কোর মধ্যে একটি সার্বজনীন আবেদন আছে। একটি বিশেষ বিখ্যাত পপ দল হিসেবে জ্যাকসনরা তার যথার্থ রূপ দিতে সক্ষম হলেন না। তবে অনেক পরে মাইকেল নিজের চেষ্টায় ডিস্‌কোর মেজাজটি ধরতে পেরে একা যে রেকর্ডগুলি করেছিলেন, তার বেশ চাহিদা হয়েছিল। তৃতীয়ত, Motown তখন সিনেমা তৈরিতে ব্যস্ত। 'জে ফাইভ'-এর ভবিষ্যৎ তার নিয়ন্ত্রণে, অথচ তাদের প্রতি কোম্পানির মনোযোগ দেবার সময় নেই। দায়সারা গোছের গানের রেকর্ড প্রকাশিত হচ্ছে। এদিকে অন্য শিল্পীদের রেকর্ড অ্যালবামের মান অনেক উঁচুদরের হয়ে বাজারে বিখ্যাত হচ্ছে। জ্যাকসনদের বাজার পড়তির মুখে। তাঁরা নিজেরাও খুবই বিচলিত। তাঁদের ইচ্ছে, এবার থেকে গানের কথা, সুর তাঁরাই সৃষ্টি করবেন। কিন্তু Motown সেটি



'সৌভাগ্যের প্রতীক' সাদা দস্তানা হাতে মাইকেল



হতে দেবে না। ফলে জ্যাকসনদের মনে বিক্ষোভ দেখা দিল। বিটল্‌স্‌, কমোডোরস্‌ ইত্যাদি দল নিজেদের তৈরি কথা, সুর দিয়ে শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছে, অথচ এঁদের কোনো স্বাধীনতা নেই।

নিরুপায় জ্যাকসন ফাইভ রেকর্ড বিক্রির ওপর ভরসা না করে টেলিভিশন ও সর্বসাধারণের জন্যে অনুষ্ঠানগুলির ওপর গুরুত্ব দিল। লাস ভেগাসে তাদের অনুষ্ঠানে ভিড় উপচে পড়ল। ১৯৭৩ সালে শীতকালে তাঁরা আফ্রিকায় গান গাইতে গেলেন। সেনেগালে অনুষ্ঠান করার পর একদা ক্রীতদাসদের দ্বীপ গোরি আইল্যান্ডে গিয়ে তাদের ভীষণ মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ১৭00 সালে যেখান থেকে হাত-পা বেঁধে কালো ক্রীতদাসদের আমেরিকায় পাঠান হত, সেখানকার কুঠরি, শিকল দেখে এঁরা এত বিচলিত হয়েছিলেন যে, ১৯৭৭ সালে তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকার গানের ট্যুর বন্ধ করে দেন।

এর মধ্যে Motown-এর প্রেসিডেন্টের মেয়ের সঙ্গে মাইকেলের দাদা জারমেইনের বিবাহ হল। সকলের প্রত্যাশা – ক্রমশ জারমেইন ওই কোম্পানির সর্বেসর্বা হবেন এবং দুই পরিবারের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক দৃঢ় হবে। কিন্তু তখনই হল প্রকৃত অশান্তির সূচনা। আগে জ্যাকসনদের রয়্যালটি ছিল রেকর্ড বিক্রি পিছু ১৬ সেন্ট। অর্থাৎ এক মিলিয়ন অ্যালবাম বিক্রি হলে ১৬0,000 ডলার। কিন্তু এখন তাঁরা আরও বেশি রয়্যালটি চাইলেন। ফলে শুরু হল বড়রকম বিবাদ। দীর্ঘ তিক্ততার পর ১৯৭৫ সালে তাঁরা Motown-এর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। Motown তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করল। তিন বছর বাদে মীমাংসা হল। চুক্তিমুক্ত হবার জন্যে জ্যাকসন ভাইদের ৬00,000 ডলার ওই কোম্পানিকে ফেরত দিতে হল। জ্যাকসন ফাইভ নামও তারা আর ব্যবহার করতে পারবে না। বরং Motown আবার নতুন দল গড়ে ওই নাম দিতে পারবে। সবচেয়ে সমস্যায় পড়লেন জারমেইন। দুই পরিবারের অশান্তির জন্যে তাঁর যথেষ্ট মানসিক চাপ ছিল সে সময়। তিনি শ্বশুরের ব্যবসায় থেকে গেলেন। জ্যাকসনরা নতুন নাম নিলেন – "জ্যাকসনস্‌" এবং EPIC রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হলেন। শেষবার তাঁরা সবাই একসঙ্গে গান গেয়েছিলেন লাস্‌ ভেগাসের নাইট ক্লাবে।

EPIC-ও প্রথমদিকে জ্যাকসনদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিল। নতুন নতুন কবি, সুরকারদের সঙ্গে তাদের আপস করতে হত। শুধু দুটি গান তাঁদের লেখার অধিকার ছিল। ক্রমশ সেই গানগুলি এত জনপ্রিয় হল যে, EPIC তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিল। মাইকেলই বেশিরভাগ গান লিখতেন। "Destiny" রেকর্ড তাঁদের শিল্পীজীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান। "Shake your body down to the ground" তাঁদের প্রথম মৌলিক সৃষ্টি এবং হিট গান হিসেবে মিলিয়ন সংখ্যক বিক্রি হল। মাইকেলের একক রেকর্ডও EPIC প্রকাশ করতে শুরু করেছিল।

এই সময়ে সিনেমা থেকে মাইকেলের ডাক এল। বহুদিন ধরেই তিনি হলিউডের আমন্ত্রণ পেয়েছেন। কিন্তু মনঃস্থির করতে পারেননি। ১৯৭৭ সালে বিখ্যাত সিনেমা "The Wizard of OZ" অবলম্বনে নিউইয়র্কের ব্রডওয়ে থিয়েটারে ব্রডওয়ে মিউজিক্যাল "The Wiz" হত। তারই চিত্ররূপ "The Wiz" এ মাইকেল Scare crow-র ভূমিকায় অংশ নিলেন। এছাড়া পরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গের E.T.-র Story book Album-এ মাইকেল গান গেয়েছেন এবং গল্প বলেছেন। স্পিলবার্গের তাঁকে বিশেষ পছন্দ। তাঁর ভবিষ্যতের কোনো ছবিতে মাইকেলের অংশ নেবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। তবে মাইকেল গভীর বক্তব্যবাহী কোনো মিউজিক্যাল নাটকে ভূমিকা পেলে তবেই মনঃস্থির করবেন বলেছেন।

EPIC-এর সঙ্গে মাইকেলের প্রথম একক রেকর্ড "Off the wall" ১৯৭৯ সালে সাত মিলিয়ন সংখ্যক বিক্রি হয়েছে। এই অ্যালবামের প্রথম গান "Don't stop till you get enough" লিখে তিনি প্রথমবার Grammy Award পেয়েছিলেন। অন্যদিকে ভাইদের সঙ্গেও সমবেত রেকর্ড করে যাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে "Triumph" রেকর্ড অ্যালবামে গেয়ে তিনি রেকর্ডের চাহিদা বাড়িয়ে দিলেন। ১৯৮১ সালে তাঁরা সারা আমেরিকায় গান গাইতে বেরোলেন। ৩৬টি শহরে তাঁদের অনুষ্ঠানে মোট ৫.৫ মিলিয়ন টিকিট বিক্রি হয়েছিল। অ্যাটলান্টার কালো শিশুদের দারিদ্র্য দূর করতে তাঁরা এই চারিটি শোগুলি করেছিলেন। "Thriller" হচ্ছে তাঁর সাম্প্রতিককালের একক গানের অ্যালবাম। ইতোমধ্যে ২১ মিলিয়ন সংখ্যক বিক্রি হয়ে গেছে। ১৯৮১ সাল থেকে আমেরিকায় Music Television অর্থাৎ মিউজিক ভিডিওর চ্যানেল শুরু হওয়াতে শিল্পীদের প্রচার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম দিকে Music Television-এ কালো শিল্পীদের অনুষ্ঠান বিশেষ প্রাধান্য পেত না। কারণ ধরে নেওয়া হয়েছিল – সাদা টিন এজার দর্শকসংখ্যাই বেশি এবং তারা কালোদের গান সেরকম পছন্দ করবে না। কিন্তু মাইকেল জ্যাকসন তার ব্যতিক্রম হয়ে উঠলেন। তাঁর বিখ্যাত গান "Beat it"-এ দেখানো হয়েছে – দুটি সাদা-কালো দল লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত। পরস্পরকে আঘাত করার ঠিক আগের মুহূর্তে মাইকেল জ্যাকসন এলেন এবং নাচের মাধ্যমে দুই দলকে সন্ধির জগতে নিয়ে গেলেন। তিনি এমন গান গেয়ে আসছেন, যেখানে সব জাতের সব ধর্মের মানুষ একত্রে তাঁর সুর উপলব্ধি করতে পারেন। বয়সের প্রভেদ, বর্ণের প্রভেদ কোনো কিছুই তাঁর অন্তরায় হয় না। তাঁর দ্রুত তালের রক গানগুলি কিশোর-কিশোরীদের নাচের উৎকর্ষ এনে দেয়। আবেগপ্রবণ গভীর কথা ও সুরের গানগুলি পরিণত বয়সের মানুষকে মুগ্ধ করে। বহু গানেই আছে অর্থবহ মানবিক আবেদন। আছে আদর্শ এবং মনুষ্যত্বের জয়গান। মাইকেলের গানের মূল বক্তব্য – বিশ্বভ্রাতৃত্ব। তাঁর Destiny গানের অ্যালবামের ওপর আছে ময়ূরের ছবি। ময়ূর যেমন তার পাখায় সব বর্ণকে ধারণ করে অপরূপ হয়ে ওঠে, মাইকেল জ্যাকসনও তাঁর গানের মধ্যে দিয়ে সব বর্ণের মানুষকে প্রীতির বন্ধনে বেঁধে দিতে চান। রাজনীতি যদি বিশ্বে শান্তি না এনে থাকে, সংগীত যেন সে চেষ্টা থেক বিরত না হয়।

লন্ডনের ওয়াক্স মিউজিয়মে পৃথিবীর তাবৎ বিখ্যাত মানুষদের মূর্তির পাশে মাইকেলের মূর্তি স্থান পেয়েছে। দরিদ্র একটি কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর আজ জীবনের অপরিমেয় প্রাপ্তিতেও অহংকারকে প্রশ্রয় দেয়নি। বিনয়ের সঙ্গে বলেছে – "আমার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেন হয় ভগবানের ইচ্ছে পূর্ণ করা। আমি তো নিজে শিল্পীজীবন বেছে নিইনি। ঈশ্বর আমাকে সেই ভূমিকা দিয়েছেন। তাই যথাসাধ্য তার উৎকর্ষ বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাব।"

এত বিপুল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও মাইকেল জ্যাকসন আগের মতই লাজুক, অন্তর্মুখী ও ভগবানের প্রতি পরম নির্ভরশীল। তিনি বলেছেন, "I get down my knees every night and thank God and ask him to lead the way." মাইকেল জ্যাকসন হাতে একটি সাদা দস্তানা পরেন। তিনি মনে করেন এই দস্তানা তাঁর সৌভাগ্যের প্রতীক। এছাড়া চোখে একটা কালো চশমাও পরেন তিনি। এসবই তাঁকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট করে তুলেছে। তিনি সম্প্রতি Teenager drunk driving-এর বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিবাদ চালাচ্ছেন। এই মহান প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে সংবর্ধিত করেন প্রেসিডেন্ট রেগন। এই উপলক্ষে হোয়াইট হাউসে একটি সভার আয়োজন হয়। সেখানেও তিনি চশমা ও দস্তানা পরে যান।

মাইকেলের একটি আত্মজীবনী বেরোবে। এর জন্যে তাঁকে তিন লক্ষ ডলার অগ্রিম দেওয়া হয়েছে। বইটি সম্পাদনা করছেন প্রয়াত প্রেসিডেন্ট কেনেডির স্ত্রী, বর্তমানের জ্যাকলিন ওনাসিস।



সুরের জাদুকর মাইকেল জ্যাকসন

তারার আলোঃ দেব আনন্দ



বছরটা ১৯৪৮ কিংবা '৪৯। স্হান – বম্বে মহানগর। চার্চগেটের বড় রাস্তা যেখানে এসে মেরিন ড্রাইভে মিশছে, ঠিক তার কোণটিতে "প্যারিসিয়ান ডেয়ারি" নামক রেস্তোরাঁয় (অধুনা টক অব দি টাউন) এক কাপ চা সামনে নিয়ে একটি যুবক বসে আছে এবং অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। এত বড় শহরে তার বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কেউ নেই, সে নিঃসঙ্গ। তার নির্দিষ্ট কোনো থাকার জায়গাও নেই। তাই প্রতিদিন সন্ধেবেলা সে 'প্যারিসিয়ান ডেয়ারি'তে এসে কিছুটা সময় কাটিয়ে যায়। প্রিয়দর্শন এই যুবকটি বেকারও বটে, তাই বোধহয় তাকে এত অন্যমনস্ক দেখায়। সে অবশ্য জানে না যে, আর কয়েক বছরের মধ্যে চুপচাপ কাটানোর মতো এক মিনিট সময়ও তার হাতে থাকবে না, সে হবে বম্বের সবচেয়ে ব্যস্ত ও বিখ্যাত তারকাদের একজন। যুবকটির নাম দেব আনন্দ।

দেব আনন্দের জীবনকাহিনী গলি থেকে রাজপথে উত্তীর্ণ হওয়ার কাহিনী। বিশ্বাস করবেন যে তিনি ছিলেন উদ্বাস্তু? দেশ বিভাগের ঠিক আগে লাহোর থেকে তিনি এসে পড়েছিলেন সিমলায় এবং সেখানকার পোস্ট-অফিসে কেরানির চাকরি যোগাড় করতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন! তাঁর ভাই চেতন তখন আছেন বম্বেতে, 'আঁধিয়াঁ' বলে একটি ছবি পরিচালনা করছেন, ছবির সুরকার রবিশঙ্কর। কী মনে হলো দেবের, কেরানির চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন বম্বেতে ভাগ্যান্বেষণে।

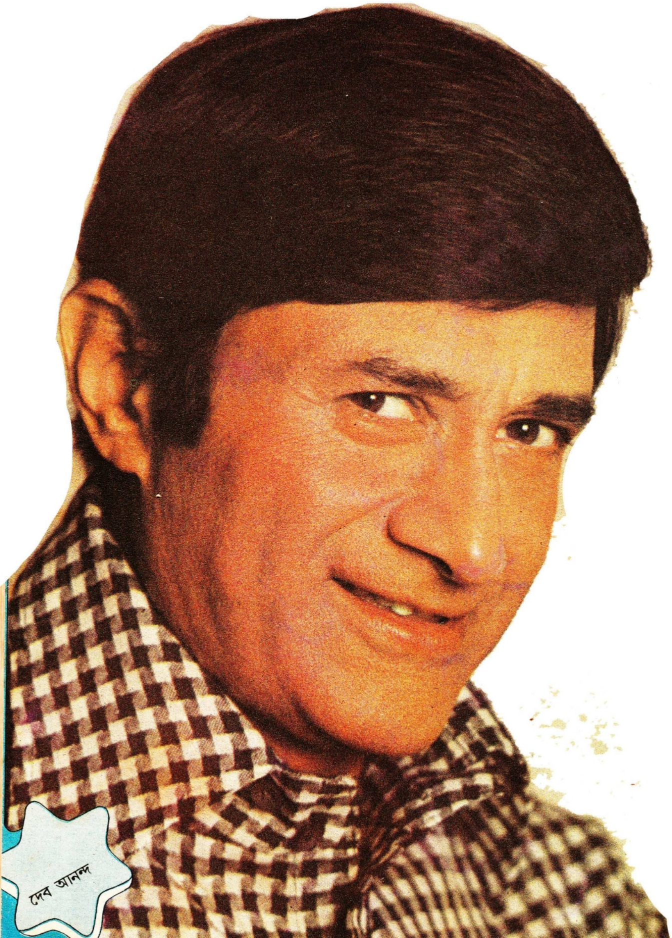
ভাগ্য যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বরণ করে নিল তা নয়। অনেকের দরজায় ঘুরলেন, অনেকগুলো সন্ধে একা একা কাটালেন 'প্যারিসিয়ান ডেয়ারি'তে, তারপর পুনের প্রভাত টকিজ থেকে তাঁর ডাক এল। 'হাম এক হ্যায়' নামক ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্র করতে হবে। অন্য একটি প্রধান চরিত্র পেলেন আর এক নবাগত অভিনেতা – নাম রেহমান। দেবের মাসিক বেতন অবশ্য অনেক বেশি – তিনশো টাকা – আর রেহমানের একশো। একখানা ঘর ভাড়া করে দুই অভিনেতা বাস করতে লাগলেন, সঙ্গে যোগ দিলেন এক তৃতীয় পার্টনার – ওই ছবিরই সহকারী নৃত্য পরিচালক। এই তৃতীয় ব্যক্তির নাম গুরু দত্ত। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই দেব কিনলেন তাঁর জীবনের প্রথম বাহন – একটি সাইকেল।

নিজের জীবনযাত্রা নিয়ে দেব বেশি কথা বলেন না, তবু স্বীকার করেন তাঁর জীবনে অনেক নারী আসা-যাওয়া করেছে এবং তাদের কথা তাঁর মনে পড়ে। বিবাহিত জীবন যে খুব সুখের হয়নি, একথাও তিনি স্বীকার করেন।



'হাম এক হ্যায়' ছবির বিষয়বস্তু ছিল হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এবং ছবিটি হিট করল। দেব রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। এই খ্যাতির পুঁজিটুকু সম্বল করে দেব এবার এলেন বম্বেতে ভাগ্য পরীক্ষা করতে। তখন তাঁর ট্যাকসির ভাড়া দেওয়ার মতো পয়সাও নেই। খবর পেলেন পাই বলে এক প্রযোজক তাঁর 'জিদ্দি' ছবির জন্য নতুন মুখ খুঁজছেন। পায়ে হেঁটে একদিন তাঁর ঘুপসি অফিসে হাজির হলেন দেব। বাইরে কাঠের বেঞ্চে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হলো, তারপর ভিতরে ডাক পড়ল। প্রযোজকের সঙ্গে তাঁর কী সংলাপ হয়েছিল জানা যায় না, তবে দেব তাঁর সুপ্রসিদ্ধ স্মিতহাস্য দিয়ে ভাবী প্রযোজককে সংবর্ধিত করেছিলেন। ব্যস, দেব আনন্দের জয় হলো। 'জিদ্দি' ছবি দিয়ে বম্বের আকাশে নবীন এক তারকার জয়যাত্রা শুরু হলো।

তারপর 'ট্যাক্সি ড্রাইভার' ছবিতে নায়কের ভূমিকা করতে গিয়ে সত্যি সত্যি কল্পনা কার্তিকের প্রেমে পড়লেন। প্রণয় থেকে পরিণয়। আজ আর কল্পনাকে অবশ্য দেখতে পাবেন না। পর্দায় তো নয়ই, দেবের জীবনেও নয়। নিজের জীবনযাত্রা নিয়ে দেব বেশি কথা বলেন না, তবু স্বীকার করেন তাঁর জীবনে অনেক নারী আসা-যাওয়া করেছে এবং তাদের কথা তাঁর মনে পড়ে। বিবাহিত জীবন যে খুব সুখের হয়নি, একথাও তিনি স্বীকার করেন। তাঁর আইরিস পার্কের বাড়িতে – যেখানে স্ত্রী


দেব আনন্দ

ও পুত্রকন্যারা থাকেন – নিজে বেশি যাতায়াত করেন না। তিনি বলেন, "পরিবার আপনার নিজের, তার মানে এই নয় যে সারাদিন তাদের সংগে কাটাতে হবে এবং পরস্পরকে bore করতে হবে।" সুরাইয়ার নাম করুন, দেব এই ষাট বছর বয়সেও একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাবেন। একদিন তাঁর জন্য পাগল হয়েছিলেন, আজ মনে করেন বিয়ে যে করেননি ভালই হয়েছে।

দেব আনন্দের অভিনয়-জীবনে ফিরে যাই। পাঁচের দশকে একের পর এক ছবি সুপার হিট এবং সেই সংগে ফিটফাট, মৃদুভাষী ও স্বাভাবিক মর্যাদাবোধের অধিকারী ওই নায়কের জনপ্রিয়তা উঠল তুংগে। ১৯৫২ সালেই তিনি নিজের সংস্থা 'নবকেতন' গঠন করেছিলেন, এবার ছয়ের দশকের গোড়াতে খুব বড় করে আয়োজন শুরু করলেন একসংগে ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় 'গাইড' ছবির জন্য। নায়িকা হলেন ওয়াহিদা রহমান, চিত্রনাট্য ও কলাকৌশলের কাজে সহায়তা করতে এলেন স্বনামধন্যা পার্ল বাক, টেড ড্যানিয়েলভস্কি এবং ভ্রাতা বিজয়। ইংরেজী 'গাইড' ছবির প্রিমিয়ার হলো খোদ নিউ ইয়র্কে। ছবি চলল না।

প্রযোজক হিসেবে দেব অনেকবারই ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর 'ফ্লপ' ছবির তালিকাটা একবার দেখুন না! প্রেম পূজারী, ইশ্‌ক ইশ্‌ক, দেশ পরদেশ, আনন্দ্ অওর আনন্দ্। অন্যদিকে অভিনেতা হিসেবে তাঁর সাফল্যটা একবার খতিয়ে দেখুন। তাঁর নিজের চরিত্রের সংগে মিলিয়ে যখনই প্রিয়ভাষী, নিঃস্বার্থ, সাধারণভাবে জটিলতামুক্ত রোল তাঁকে দেওয়া হয়েছে, তিনি 'হিট' করেছেন। তাঁর 'পার্সোনা' অর্থাৎ অভিনেতৃ-সত্তার বিরোধী ভূমিকায় আবার তিনি অসার্থক। জেমিনীর 'ইনসানিয়ৎ' তার একটি উদাহরণ।

সাফল্যে হোক, ব্যর্থতায় হোক, দেব কিন্তু এগিয়ে চলায় বিশ্বাস করেন। চুপ করে বসে থাকা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। এখনও দিনে ১৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করেন। ছবির কাজ তো আছেই, এ ছাড়া বই পড়েন, দেশ-বিদেশ বেড়ান। পাহাড় খুব ভালবাসেন তিনি; স্বীকার করেন পাহাড়ে বরফ পড়া দেখতে তাঁর দারুণ ভাল লাগে। আর নানা জায়গায় বেড়িয়ে মানুষকে পর্যবেক্ষণ করতে চান – "ঐটাই তো আমার কাজ।" অন্য কাজের মধ্যে আজকাল একটু রাজনীতিও করছেন। ১৯৭৭ এবং ১৯৮৫ দুবারের লোকসভা নির্বাচনে রাম জেঠমালানির পক্ষে কংগ্রেস (ই)-র বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছিলেন। যে ধরনের লোক সম্প্রতি ক্ষমতায় আসছেন তাতে দেব বিশেষ ক্ষুব্ধ। "আগেও ভাবতাম এবং এখনও পর্যন্ত তার কোনো পরিবর্তন হয়নি যে, শুধুমাত্র বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত লোকদেরই দেশ শাসন করতে দেওয়া উচিত।"

দেবের একটি দুঃখ, 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' ছবিতে তাঁর কন্যা দেবিনা নামতে রাজি হয়নি,' পরে ওই রোলটি করেই বিখ্যাত হয়ে যান জীনত আমন। কন্যা দেবিনার মতো আর কেউ দেব আনন্দের এতখানি স্নেহ, এত সময় এবং এতটা নজর কেড়ে নিতে পারেনি।



এত ব্যস্ত জীবনযাপন করেও দেব কিন্তু মূলত এক শান্তিপ্রিয় মানুষ। জুহুতে তাঁর 'সিলভার বীচ' বাড়ির অদূরে 'সান-এন-স্যান্ডস' হোটেলে ঠিক সমুদ্রের উপরে একটি সুইট তিনি নিয়ে রেখেছেন – সেখানে ঢাকা বারান্দায় ছোট্ট টবের বাগান করেছেন। বাড়িতে ফেরেন সন্ধে হতে না হতেই, খাদ্য ও পানীয় বিষয়ে তিনি কঠোর কড়াকড়িতে বিশ্বাসী, আর শয্যা গ্রহণ করেন রাত ন'টা বাজার সংগে সংগে। তাই তো এই বয়েসেও এমন ফিগার রাখতে পেরেছেন।

চার দশক ধরে জনপ্রিয়তার শীর্ষে থেকেও দেব অন্যের প্রশংসায় কৃপণ নন। তাঁর নিকটতম বন্ধু তাঁর সময়ের সেই দুই দিকপাল দিলীপকুমার ও রাজ কাপুর, একালের শিল্পীদের মধ্যে পদ্মিনী কোলহাপুরে, রতি অগ্নিহোত্রী থেকে শুরু করে নাসিরুদ্দিন শাহ, রাজ বব্বর ও কুলভূষণ খারবান্দার প্রশস্তিতে তিনি পঞ্চমুখ। তাঁর একটি দুঃখ 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ' ছবিতে তাঁর কন্যা দেবিনা নামতে রাজি হয়নি, পরে ওই রোলটি করেই বিখ্যাত হয়ে যান জীনত আমন। কন্যা দেবিনার মতো আর কেউ দেব আনন্দের এতখানি স্নেহ, এত সময় এবং এতটা নজর কেড়ে নিতে পারেনি।

এস এন খোসলা

"ছেলের এজেণ্ট হব না" ঃ দেব আনন্দ

বাড়িটা বাইরে থেকে দেখায় শক্তসমর্থ একটা দুর্গের মত। গেটে গুরখা দ্বারপাল মোতায়েন – আমার নাম বলতেই তার হাতের তালিকাটা দেখে নিল। হ্যাঁ, আমি ভিতরে যেতে পারি, মালিক আছেন। মালিক বলতে দেব আনন্দ। তাঁর চেহারা ও তাঁর বাড়ির মত দেবের প্রাত্যহিক কর্মসূচিও নিখুঁতভাবে তৈরি। প্রতিদিন ভিজিটরদের একটি তালিকা পূর্বাহ্নেই তিনি দরজায় টাঙিয়ে দেন।

মাত্র কিছুদিন আগে বাথরুমে পড়ে গিয়ে শিরদাঁড়ায় বড় রকমের চোট পেয়েছিলেন দেব, মাসখানেক শয্যাশায়ীও ছিলেন, তবু তিনি আজও এভারগ্রীন। বয়স দেখায় [illegible] জোর ৩৫। তাঁর এই যৌবনের [illegible]



তা অবশ্য তিনি ফাঁস করলেন না। "দুর্ঘটনাটা শাপে বর হয়েছে মনে হচ্ছে", সুপরিসর লনে চেয়ারে আরাম করে বসে দেব বললেন। "বাড়িতে এমন সুন্দর একটা লন আছে এখনই যেন জানলাম। ভোরে পাখির কাকলি শুনে ঘুম ভাঙছে। যদি আমার কোনো একটা ফিল্মে এই বাংলোটাকে ধরে রাখতে পারতাম! এতদিন দিনে ১৬–১৭ ঘণ্টা কাজই করেছি, বাড়ি ফিরেই বিছানায় পড়েছি আর ঘুমিয়েছি। দুর্ঘটনার পর থেকে হাতে একটু অবসর এসেছে।

"বাথরুমে যখন ছিটকে পড়ে গেলাম প্রথমেই মনে হলো এই অবস্থায় – মানে কাপড়চোপড় তো গায়ে নেই; কি করে ঘরে নিয়ে যাবে আমাকে? কোনমতে একটা

তোয়ালে জড়িয়ে আমার স্ত্রী মোনা এবং মেয়ে দেবিনাকে ডাকলাম। ওরাই নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল।"

নানা ধরনের রোল করা অর্থাৎ চরিত্রাভিনেতা হওয়ার তেমন কোনো ইচ্ছে দেবের নেই। উনি পালটা প্রশ্ন করলেন, "বুড়োদের রোল কে করতে চায়? হ্যাঁ, খুব সুযোগ আছে, অ্যাওয়ার্ড-উইনিং রোল দিন – বুড়ো হলেও করব। নাহলে সাদা দাড়ি লাগিয়ে জবুথবু বুড়োর রোল করতে যাব কেন? আজকাল সবাই করছে বলে? আমি যে ধরনের ভূমিকা করে থাকি যতদিন দর্শক সেটা গ্রহণ করবে আমি অন্য কিছু করতে যাব কেন বলুন তো?"

দেব আনন্দ এবারে কিছু স্পষ্ট কথা বললেন। "সুনীলকে বলে দিয়েছি না দেখেশুনে যেন ছবি না নেয়। ওর ব্যাপারে আমি নাক গলাতে যাব না। কিছু স্টার-ছেলের স্টার-বাবারা যা করেন আমি মোটেই তা করব না। সত্যি। যদি সে কোনো সমস্যা নিয়ে আসে, আলাদা কথা। তার বাবা হিসেবে এবং এতদিনের অভিজ্ঞ চিত্রনির্মাতা হিসেবে তাকে নিশ্চয় পরামর্শ দেব। কিন্তু শুনে রাখুন, আমি ছেলের এজেন্ট হব না। ফিল্মে অভিনেতা হিসেবে ওকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। বাপ হিসেবে ওকে আমি ফিল্মে সুযোগ করে দিয়েছি। ব্যাস্।"

'আনন্দ অওর আনন্দে'র নায়িকা নাতাশার সঙ্গে সুনীলের প্রণয়ে দেব বিরক্ত হয়েছিলেন একথা কি সত্যি? "এরকম অবস্থায় যে কোনো বাবাই বিরক্ত হতেন। সুনীলকে বলেছিলাম যে তোমার কেরিয়ার সবে শুরু হচ্ছে – এখনই বিয়েটিয়ে সেরে ফেলার বয়স তোমার হয়নি। হট করে কিছু একটা যদি করে বসত তো দুদিন বাদে উম্মাদনা কেটে গেলে ওকেই পস্তাতে হত।

"ওকে বললাম আগে তোমার কেরিয়ারের কথা ভাবো। একবার যদি টপে উঠতে পারো তো কেউ তোমায় সরাতে পারবে না আর দেখবে কত মেয়ে এসে একেবারে গড়িয়ে পড়বে। আমার কথাই ধরুন। যখন সবে একটু একটু উঠছি, ফিল্মে একটু জায়গা করে নেবার জন্য লড়তে হচ্ছে তখন সুরাইয়ার প্রেমে পড়ে গেলাম। ভালই হয়েছিল যে বিয়েটা করিনি। সুনীলের অবস্থাও ওইরকম। আমার ধারণা ও ক্রমে বুঝতে পারবে, বুঝেসুজে চলবে।"

সাধারণভাবে নায়িকাদের প্রসঙ্গ উঠল। দেব বললেন, "নেপালে 'হরে রাম হরে কৃষ্ণ'-এর লোকেশনে যাবার আগে জীনাত কয়েক সপ্তাহ সেটে এসে শুধু দেখত অন্যেরা কে কেমন অভিনয় করে – মমতাজ, গৌতম এদের। ক্রমে জীনাত বেশ মানিয়ে নিল ইউনিটের সঙ্গে এবং আমার পক্ষে ওর কাছ থেকে যতদূর সম্ভব ভাল কাজ আদায় করা শক্ত হল না। বিশ্বাস করতে পারেন যে 'দেশ পরদেশ' ছবিতে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে টিনা একেবারে কেঁপে-টেপে অস্থির? সেই টিনা যেদিন শুটিং শেষ হলো আর আসতে হবে না শুনে কেঁদেছিল!"

দেবের মতে ১৯৮৬ সাল নাগাদ একদল নতুন ও তরুণ স্টার হিন্দি ফিল্মে এসে পড়বে। বললেন, "এখনকার বড় বড় তারকাদের দিন ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। বলুন না এমন কে স্টার আজ আছে যে, বিশ-তিরিশ বছর ধরে অনুরক্ত দর্শকদের আকৃষ্ট করে রাখতে পারে? আজকের স্টার টপে থাকে পাঁচ কি ছ বছর। তাই তো সকলেই ভাবছে আমার কী হবে?"

দক্ষিণ ভারতে হিট হিন্দি ছবির যে সব রূপান্তর হচ্ছে দেবের তা খুব অপছন্দ। "রিমেক করার কথা ভাবতেই পারি না, কারণ তাতে নতুন কোনো সৃষ্টির সুযোগ নেই। কপি করা আমার পোষায় না। সর্বদাই চেষ্টা করেছি চিরাচরিত ঢঙের বাইরে একটু নতুন কিছু করার।" দেব উদাহরণ দিলেন 'ইশ্‌ক্ ইশ্‌ক্', 'তেরে মেরে সপ্‌নে' প্রভৃতি ছবির। "পুনরাবৃত্তি আমার চলবে না। নতুন কিছু করতে চাই।"

দেব আনন্দ তাঁর পরবর্তী ছবির কাজকর্ম লেখা-জোখা শুরু করে দিয়েছেন। সাংলি কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক দিলীপ পরদেশী এবার তাঁর চিত্রনাট্যকার। কাহিনীর ভিত্তি কলেজীয় প্রণয়। দেব মধ্যবয়স্ক এক অধ্যাপকের ভূমিকা করছেন, নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে নবাগত দুই তরুণ-তরুণীকে। এদের পরিচয় ফাঁস করতে দেব এখনই রাজি নন। "যখন ছবি করি তখন কিছু জিনিস একটু রেখে-ঢেকে রাখতে হয়। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রেস কনফারেন্স করে সবই জানিয়ে দেব, ততদিন বরং অপেক্ষা করুন।"

দেব এ ছবির প্রযোজক ও পরিচালক। এছাড়া আর একটা ছবির প্রস্তুতিও চলছে যাতে সুনীল অভিনয় করবে এবং দেবের ভাই বিজয় আনন্দের হাতে পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে। "একটা কম বাজেটের ছবি করে দেখব ভাবছি, ভিডিও এসে চলচ্চিত্র-প্রযোজকদের অর্থনীতি সব ওলট-পালট করে দিয়েছে তো!"

কলেজ ক্যামপাস হবে এবং পুণার মত গথিক ঢঙে বাড়িঘর থাকবে – তাঁর কলেজীয় ছবির জন্য দেব এইরকম লোকেশন খুঁজছেন। তাঁর সুবিধে ছবির প্ল্যান নিয়ে তাঁকে প্রযোজকদের দরজায় দরজায় ঘুরতে হয় না। "ঈশ্বরের কৃপায় আমার অনুরক্ত দর্শক আমি যা দিই তাই গ্রহণ করে। কোনো বিষয় যদি একবার আমার ভাল লেগে যায় তো ব্যস হয়েই গেল – অমনি ঠিক করে ফেললাম যে ছবি করব।"

অন্য প্রযোজকদের হয়ে ছবি করতে দেব খুব উৎসুক নন। "দেখুন না, দুখানা ছবি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। কেন তা জানি না। গোলডি অর্থাৎ বিজয় আনন্দের 'এক দো তিন চার' বন্ধ হয়ে আছে। শোনা যাচ্ছে যে অমিত খান্না 'নয়া জনি' ছবির কাজ আবার শুরু করবে, লম্বা শুটিং হবে শ্রীলঙ্কায়। ওদিকে 'অব মেরি বারি' বলে একটা ছবি ছিল, পরিচালনা করার কথা মহেশ ভাটের, 'অর্থ' করারও আগে। কই, সে টাকা মহেশ অন্য জায়গায় খরচ করে বসে আছে আর এই ছবিটা আটকে আছে। মহেশ তো আজকাল দশদিনে পনেরোদিনে ছবি শেষ করছে শুনছি।"

আজকের অনেক বিখ্যাত তারকা দেব আনন্দের আবিষ্কার, কিন্তু দেব তাদের হাত-পা বেঁধে রাখেননি। "যখন চুক্তি সই হয় তাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করি না আবার একথাও মনে করি না যে, চিরকাল তারা আমার বশংবদ হয়ে থাকবে। জীনাত আমাদের দুটো ছবি করেছে, টিনাও করেছে দুটো, নাতাশা এ পর্যন্ত একটা। চুক্তি তাই ছিল। নাতাশা এখন অন্য লোকের হয়ে ছবি করছে, তার মানে এই নয় যে, নবকেতনের বা আমার সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। সে আমার অনুমতি নিয়েই অন্য লোকের ছবি করতে গেছে। আমার দিক থেকে আমি শুধু বলেছি সে যেখানে খুশি ছবি করুক।"

দেব আনন্দের সঙ্গে ঘন্টা দেড়েক ধরে কথাবার্তা বললাম। এবার উঠতে হয়। তরতাজা জোয়ানের মত টপ করে দেব চেয়ার ছেড়ে উঠে লঘু পায়ে চললেন আমাকে এগিয়ে দিতে। আমিও বেরুচ্ছি আর সুনীল আনন্দও বাড়ি ঢুকছেন। ঘড়িতে সন্ধে সাড়ে আটটা – ইংরেজরা যাকে বলে যামিনী এখন তরুণী। কিন্তু সুনীলের বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেছে। বোঝা গেল, তিনিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন, তাঁরও আদর্শ আত্মসংযম।

জ্বালামুখী

এক তীর্থযাত্রা

ঝরা বসু

লেখিকার বান্ধবীর স্বামী কনজেনিটাল অ্যায়োটিক স্টেনোসিসে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন। কলকাতার বিশিষ্ট হৃদরোগ চিকিৎসকগণ তাঁকে পরীক্ষা করে হার্ট সার্জারি করবার পরামর্শ দেন। লেখিকার বান্ধবী এবং তাঁর পরিবারের লোকজন ভয় পেয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার পথ বেছে নেন। কিন্তু রোগের উপশম না হয়ে নানান উপসর্গ দেখা দেয়। দশ বছর কষ্টভোগের পর ভেলোরের খ্রিস্টিয়ান মেডিক্যাল কলেজের থোরাসিক সার্জারি বিভাগে অপারেশনের ব্যবস্থা হয়। গত এপ্রিল মাসে লেখিকা তাঁর বান্ধবীর স্বামীর অপারেশনের সময় থেকে হাসপাতাল, রোগী ও স্থানীয় মানুষজনদের যেভাবে দেখেছেন গল্পচ্ছলে তারই মানবিক বিবরণ বর্তমান লেখাটি।

রীতার ট্রাংককল পেয়ে আমরা রওনা দিলাম। গন্তব্যস্থল ভেলোর। মাদ্রাজের কাছেই। মাদ্রাজ থেকে ১৫০ কি মি দূরত্বে। শহরটি পুরনো ও অনেক অতীত ঘটনার ঐতিহাসিক সাক্ষী, বর্তমানে শহরটি অন্য কারণে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। এখানকার খ্রিস্টান মেডিক্যাল কলেজ মানুষকে অনেক দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি দিচ্ছে। মস্তিষ্কের অসুখ, কিডনির অসুখ ও হৃদরোগ সবই ভাল হয়ে যাচ্ছে উচ্চমানের শল্যচিকিৎসার দ্বারা। এককালে কলকাতা যেমন ছিল। নানা জায়গা থেকে রুগীরা আসত রোগীমুক্তির আশায় এই কলকাতায়। এখন চিকিৎসায় কলকাতা পিছিয়ে পড়েছে অনেক। মণিপুর, নাগাল্যান্ড, আসাম, নেপাল, বিহার, জামশেদপুর কিংবা বাংলাদেশ থেকে যেমন প্রচুর লোক চিকিৎসা করাতে যায় ওখানে, তেমনি কলকাতা থেকেও দলে দলে বাঙালিরা এখানে আসেন চিকিৎসার জন্যে।

রীতার স্বামী রণি অ্যায়োটিক স্টেনোসিসে অনেক দিন থেকে কষ্ট পাচ্ছিল – বুকে ব্যথা, হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়া, যখন তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলা। কলকাতায় স্পেশালিস্টদের দেখানো হয়েছিল। তাঁরা সকলেই বলেছিলেন অপারেশন করাতে হবে – ওপেন হার্ট সার্জারি। কলকাতায় এ অপারেশন কিছু কিছু হচ্ছে – কিন্তু তেমন সুবিধার নয় তাই ভেলোরে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন সবাই। কিন্তু বংগসন্তানগণ একেই রক্তপাত দেখলে মূর্ছা যায় তার উপর হার্ট সার্জারি! ভয়ে এতদিন রণি আর কোনো সার্জেনের কাছে যায়নি। হোমিওপ্যাথ করাচ্ছিল। কিন্তু সম্প্রতি কষ্টের মাত্রা বেড়ে গেল। সাহসে বুক বেঁধে অপারেশন করা মনঃস্থির করে ওরা ভেলোরে গেছে। অপারেশনের দিন ঠিক করে রীতা আমাদের ট্রাংককল করেছে। ওর একমাত্র ছেলে পিন্টুর বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে – তাকে নিয়ে যেতে হবে। আমি আর মিনু যাচ্ছি – আমাদের রিজার্ভেশন আছে। পিন্টুর নেই। তা আর কী হবে আমার বার্থে পিন্টুকে নিয়ে শুয়ে পড়ব। ট্রেনে উঠে টিকিট কেটে নিলেই হবে। বিকেল ৪.২৫ মি হাওড়া থেকে করমণ্ডল এক্সপ্রেস ছাড়ল। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী আমরা। সহযাত্রীরা কেউ আসামের, কেউ ওড়িশার, কেউবা তামিলনাড়ুর। লম্বা চওড়া, দাড়ি চাঁছা চুল কাটা পাঞ্জাবি ছিলেন একজন। উঠেই তিনি সিট নিয়ে এত গোলমাল শুরু করলেন যে, প্রথম দিকে হাসি পেলেও পরে একটু ভয় পেয়ে গেলাম। কারণ তিনি আমার পাশের সিটটি দাবি করছিলেন। এই লোকের পাশে সারারাত্রি কাটাতে হবে – একে তো খুব নিরীহ বলে মনে হচ্ছে না। রাত্রে



ভেলোর সেবায়তনের প্রতিষ্ঠাত্রী সেবাব্রতী ডাঃ স্কাডার

বার্থ পাওয়া গেল না পিন্টুর জন্য। উপরন্তু বেশ মোটা রকমের ফাইন দিয়ে ওর টিকিট নিতে হল। পিন্টুর বয়স সাত কিন্তু বড়সড় চেহারা হয়ে গেছে। আমার আবার হাত পা ছড়িয়ে শোওয়া অভ্যেস। রাত্রে পিন্টু দুবার মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি গেল। সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি সেই পাঞ্জাবির বার্থে পিন্টু পরম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে – আর বার্থের মালিক ঘাড় গুঁজে বসে আছে। এবারে আমার লজ্জা পাওয়ার পালা। সারাটা দিন ট্রেনে কাটানো খুব বোরিং লাগবে ভেবেছিলাম – কিন্তু পিন্টু মাতিয়ে রাখল। সবাই ওর কাকু। পাঞ্জাবি কাকুর থেকে কমিকস, মণ্টু কাকুর থেকে টফি, পিটার আংকলের কাছ থেকে সুন্দর ছবিওয়ালা স্টিকার নিয়ে পিন্টু এক দানের ভাণ্ডার গড়ে তুলল। সন্ধে সাড়ে সাতটায় আমরা মাদ্রাজে পৌঁছলাম। সেই রাত্রিটা মাদ্রাজে থেকে গেলাম। ওখান থেকে ভেলোরে বাস কিংবা ট্রেনে দুভাবেই যাওয়া যায়। বাসে যাওয়াই ভাল রাত এগারটা পর্যন্ত বাস পাওয়া যায়। ট্রেনে এলে ঝামেলা বেশি। কাঠপাড়ি স্টেশনে নেমে রিকশা কিংবা অটো করে আবার ৫ কি মি যেতে হবে। মোটর গাড়িতে তিন ঘণ্টার রাস্তা। আমরা পরের দিন বিকেলে ভেলোরে উপস্থিত হলাম।

হোটেলে মালপত্র রেখে সোজা হাসপাতালে গেলাম। গিয়ে দেখলাম খোলা ছাদে পেশেণ্টরা হাওয়া খাচ্ছে। আত্মীয় বন্ধু নিয়ে গোল হয়ে গল্প করছে। রণিও নিজের দলবল নিয়ে আড্ডা জমিয়েছে। আমাদের দেখে রণি খুব খুশি – চোখেমুখে অপারেশনের ভয়ও আর নেই। রণি দেখাল – ওই যে শ্রীবাস্তব, জামশেদপুর থেকে এসেছে। বয়স ৬৫। তিনদিন আগে অপারেশন হয়েছে। ওপেন হার্ট। আজকে দেখুন হুইল চেয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এই বাচ্চাটির আড়াই বছর বয়স। ওর হার্টটি ছিল উল্টো পজিশনে। ওরও অপারেশন হয়েছে দশ দিন আগে, কেমন ভাল হয়ে গেছে, হাসিখুশি। আর এই মহিলার চল্লিশ বছর বয়স। ছয় বছর আগে হয়েছিল ক্লোজহার্ট অপারেশন, এবারে হবে ওপেন হার্ট। কালকে ওর অপারেশন হবে। – সব দেখে শুনে মনে হল, এ যে দেখছি টনসিল অপারেশনের মতো। আর কলকাতা থেকে আমরা কত ভয়ে আশঙ্কিত হচ্ছিলাম। আসলে হার্টের বাইপাশ, ভাল্‌ব চেঞ্জ ব্যাপারগুলি এঁরা খুব সাধারণ অপারেশন বলে মনে করেন। থোরাসিক সার্জারি ডিপার্টমেণ্টে দুটি ইউনিটে অসাধারণ অভিজ্ঞ ডাক্তাররা অতি নিপুণভাবে হার্টের ক্ষত ও ক্ষতির জায়গাগুলি মেরামতি করে থাকেন। হৃদপিণ্ড থেকে বিশুদ্ধ রক্ত ছড়িয়ে পড়ে যে পথে – রণির সে পথটি অর্থাৎ অ্যায়োটার মুখে ক্যালসিয়াম জমে গিয়ে প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। ওর ওই অ্যায়োটিক ভাল্‌বটি কেটে বাদ দিয়ে নতুন একটি কৃত্রিম ভালব লাগাতে হবে। ডঃ স্টানলি জোন ও ডঃ জয়রাজ – এই কাজে সুদক্ষ, হৃদরোগ মুক্তির ইতিহাসে

প্রবাদপুরুষ হয়ে গেছেন। ভগবানকে দেখা যায় কিনা জানি না –ভেলোরে কিন্তু ডাক্তারদেরই স্বয়ং ঈশ্বর বা ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলে মনে হচ্ছিল।

ভেলোরে হাসপাতালকে ঘিরে হোটেল ব্যবসা বেশ জমে উঠেছে। কারণ শুধু রুগীরা নয় – তাদের সংগে কম করে ছয় সাত জন লোক আসে। ব্লাড এখানে কিনতে পাওয়া যায় না। লোকাল ডোনার কিছু আছেন – কিন্তু প্রফেশনাল ডোনারদের কাছ থেকে রক্ত না নেওয়াই ভাল। ওদের রক্তে ম্যালেরিয়া কিংবা জন্ডিসের ভাইরাস আছে কিনা তা জানা নেই। তাছাড়া বারটি ও টি তে এতগুলি অপারেশনের জন্য অত ডোনারই বা কোথায় পাওয়া যাবে। কাজেই যে যার দেশ থেকে চেনাজানা ডোনার নিয়ে আসে। প্রতি রুগীর সংগে এক একটি ছোট দল, রণির জন্য দরকার ছয় বোতল রক্ত। রণির ব্লাড গ্রুপ এবি পজিটিভ – ওর নিজের গ্রুপের তিন বোতল আর অন্য গ্রুপের তিন বোতল।

রীতা সাতপাঁচ ভেবে দুম করে একটা বাড়ি ভাড়া করে বসল। ওর শ্বশুর বাড়ি ও বাপের বাড়ির শুভানুধ্যায়ীর দল বিরাট। রীতা ও রণি আত্মীয় ও বন্ধুমহলে খুব ভালবাসার পাত্র। আর সেই জন্য আমরা সবাই দলে দলে এসে রীতার বাড়িতে প্রায় ছোটখাট জনতা তৈরি করে ফেললাম। আমাদের বাঙালিদের বাঙালপনা আর যাবে না। রীতার বিপদের সাথী হতে গিয়ে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম পনের জন লোকের বোঝা। রীতা যেখানে বাড়ি ভাড়া করেছে - জায়গাটার নাম সত্যুয়াবারী। এখানে অনেক সুন্দর সুদৃশ্য – বাড়ি তৈরি হয়েছে। লাখপতিরা সব কিনেছেন। একটা সুন্দর নতুন কলোনি গড়ে উঠছে। এ সব বাড়িগুলিতে অনেক কিডনির রুগীরা ভাড়াটে আছেন। ভেলোরে কিডনি পেশেন্টদের জাত ভিন্ন। হার্ট পেশেন্টরা যেমন সবার সংগে সবার মাঝে রুগী হয়েও রোগ চিহ্নবিহীন এরা সেরকমভাবে থাকতে পারে না। কিডনি অপারেশনের পরও খুব ইনফেকশনের ভয় থাকে। খুব সাবধানে থাকতে হয়। বিশুদ্ধ হাওয়া, বিশুদ্ধ জল, লবণবিহীন সেদ্ধ খাওয়া, জৈনদের মতো নাকে মুখে একটা কাপড়ের ফ্লানেল বেঁধে চলা। মনে হয় এরা যেন নতুন কোনো সাধু সম্প্রদায়। আধুনিক শল্য চিকিৎসার জীবনমন্ত্রের সাধক এরা। মৃত্যুকে জয় করবে বলে পণ করেছে। কারও একটা কিডনি কেটে বাদ দিয়েছে, মা মেয়েকে কিডনি দিয়েছে – কেউবা ভাইয়ের কিডনি নিয়ে ভাল হয়ে উঠেছে। এরা সব একালের দধীচিদের দানে জীবন ফিরে পাচ্ছে। আজকের দিনে দধিচীরা কখনও চোখ, কখনও হৃদপিন্ড, কখনও মূত্রগ্রন্থি ইত্যাদি ত্যাগ করে আর এক জীবনের বরমাল্য সাজাচ্ছে। এ সব অপারেশনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। রণির জন্য হাসপাতালেই জমা দিতে হয়েছিল কুড়ি হাজার টাকা। কিডনি অপারেশনে আরও অর্থের প্রয়োজন। অপারেশনের পর কিডনি পেশেন্টদের প্রায় বছরখানেক ভেলোরে থাকতে হয়। রোগমুক্তির পরও চেক আপের জন্য ভেলোরে আসা যাওয়া করতে হয়। কাজেই এরা অনেকে এখানেই জীবিকার আয়োজন করে নিয়েছেন। রোগমুক্ত রুগীরা কেউ রেস্টুরেন্ট, কেউ লন্ড্রি, কেউ মনোহারী দোকান চালাচ্ছেন। জীবন ও জীবিকা দুইয়েরই ব্যবস্থা হয়েছে ভেলোরে।

ওই রকমই এক কিডনি পেশেন্ট মিঃ ব্যানার্জি – তাঁর বাড়ি আমরা ভাড়া নিয়েছি ৫00 টাকায়। পাহাড়ের কোলে বাড়িটি। এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ফ্যান নেই ঘরে – ইঁদারা থেকে জল তুলে কাজ করতে হয়। সকাল থেকে পাহাড়মশাই গরম হয়ে লাল হতে থাকেন আর তার তীব্র তেজে সত্যুয়াবারীর নতুন নতুন ইট চুন সিমেন্টের বাড়িগুলিকে তেজোময় হিট চেম্বারে পরিণত করেন। হাসপাতালে রণির দেখাশোনা করার সংগে সংগে রীতা ব্যস্ত হয়ে উঠল ঘরে ফ্যান ফিট করার জন্য। কুয়োতে পাম্প লাগাবার জন্য – যতটুকু আতপ নিবারণের ব্যবস্থা করা যায়। ঘরের কাজ করার জন্যও একটি সেবিকার প্রয়োজন। পাশের বাড়িতে আছে একটি তামিল পরিবার। তাদের সাহায্য চাওয়া হল। সতের আঠারো বছরের একটি ছেলে বারান্দায় বসে পড়ছে। ইংরেজি ভাষায় ওকে জানালাম ওর মাকে ডেকে দিতে। আধাবুড়ি এক মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সম্পূর্ণ মূকাভিনয় করে ঘরে ঢুকে গেলেন – কিছুক্ষণ বাদে এল ওঁর মেয়ে চব্বিশ পঁচিশ বছরের এক যুবতী। হাত নেড়ে জানাল হিন্দি ও ইংরেজি কোনোটাই সে জানে না। কোনো চিন্তা নেই ন্যাশানাল ইন্টিগ্রিটি, হিন্দির প্রসার চুলোয় যাক। আমরা মানবিক ভাষায় কথাবার্তা শুরু করলাম। এ ভাষায় কিছু ধ্বনি উচ্চারিত হয় আর সেই সংগে হাত, চোখ, মুখ, মাথার নানা অংগভংগির সংগত চলে। ডাইনে বাঁয়ে মাথা দুলুনি সমানে চলল। মহিলার নাম কুবেরেন্দ্রা – বড় বড় চোখ, দুই নাকে সুদৃশ্য নাকছবি, হীরের হতে পারে। গলায় সোনার মোটা মংগলসূত্র – ওদের ওখানে ছিনতাইবাজরা এখনও যায়নি। মাথা ভর্তি কালো চুলের বন্যা। স্বামী হাসপাতালে জিনিসপত্র সাপ্লাই দেয়। নিজেদের ট্রাক আছে দুটো। কুবেরেন্দ্রা আমাদের অসুবিধা বুঝতে পেরেছে। আর ঘন ঘন মাথা ঝুঁকিয়ে বলছে 'সারভেন্ট ইল্লে'। বোধ বুদ্ধির সোশাল ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝে গেলাম 'ইল্লে' মানে আছে। ঠিকে ঝি পাওয়া যাবে, কুবেরেন্দ্রা নিয়ে আসবে। তৎক্ষণাৎ রীতাকে জানালাম, ওর কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা হয়েছে। রীতা বলল, মিসেস ব্যানার্জি যেটি ঠিক করেছেন তাকে বারণ করে দিচ্ছি তাহলে। তাই হল। ইতিমধ্যে 'ইল্লে' শব্দটি দু একবার কানে এল। সকাল থেকে কারেন্ট নেই লোডশেডিং হয়েছে। কী ব্যাপার : কুবেরেন্দ্রা জানাল, 'কারেন্ট ইল্লে' – কারেন্ট নেই। হে ভগবান ইল্লে মানে তাহলে না, নেই ! ঠিকে কাজের লোক পাওয়া যাবে না। একটু নার্ভাস বোধ করলাম। কিন্তু কুবেরেন্দ্রা খুব মায়াবতী মহিলা। মুখে বার বার কষ্ট কষ্ট উচ্চারণ করে ছেলে কোলে উত্তর-দক্ষিণ, পূব-পশ্চিম ছোটাছুটি করে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে যে বস্তি সেখানে থেকে নিয়ে এল গৃহকর্মে পটিয়সী কানডামাঈকে। কানডামাঈ আমাদের ভাষার একবর্ণও বোঝে না – কিন্তু কাজের হিসেব বুঝে নিয়ে সেবায় নিযুক্ত হল ৪0 টাকার বিনিময়ে। চিরকাল কুবেরেন্দ্রাকে আমার মনে থাকবে। বাঙালি-তামিল সম্পর্ক ভাল নয় জানি – কিন্তু এসব দরদী নারীদের স্নেহের উৎসারে বাইরের কোনো সম্পর্ক বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। এদের কাছে কোনো জাত-পাঁতের বালাই নেই – শরৎ সাহিত্যের নারীদের মত দুবেলা সে নিজস্ব পদ্ধতিতে আমাদের দেখ ভাল করত।

ডঃ স্ট্যানলি জোন অপারেশন পিছিয়ে দিয়েছেন এক সপ্তাহ। ও টি খালি পাওয়া যাচ্ছে না। অপারেশনে প্রচুর রক্তক্ষরণ হবে –



ভেলোর খ্রিস্টান মেডিক্যাল কলেজ

রণির শরীরেও আরো তাগদ দরকার। দিনে ৩টি ডিম, চিকেন, মাখন, মাছ, দুধ, কলা প্রচুর পরিমাণে ওকে ডায়েট হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। হার্টে ক্ষতি হবে মনে করে বেচারা এক দশক ডিম খায়নি। কিন্তু এখন তিনটি খেয়েও দিব্যি আছে।

ওদিকে আমাদের কোনো কাজ নেই। রীতার নতুন কাপল নিয়ে আছি। শোনা গেলো ভেলোরে সরকারি ফিশারি আছে। মাছ খুব সস্তা। ৯ টাকা কিলোয় দারুণ রুই কাতলা পাওয়া যায়। হাসপাতাল থেকে কিছু দূরে আছে ভীম রেড্ডির তৈরি একটি বিশাল ফোর্ট। এটি সবচেয়ে প্রাচীনতম স্থান ভেলোরের। ফোর্টের ভিতর এখন অফিস কাছারি ও সরকারি নানা সংস্থা। ভীম রেড্ডির তৈরি পুরনো মন্দিরও ফোর্টের ভেতর আছে। আর ফোর্টের চারপাশে পরিখা। এই পরিখার জলেই মাছ চাষ হয়। জেলেরা প্ল্যাস্টিকের তৈরি ছোট বোট নিয়ে মাছ ধরে আনছে – ওখানেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে পাইকারি দরে। স্থানীয় লোক ছাড়া আমাদের মত কিছু বাঙালি ও বিহারী এসেছে মাছ কিনতে। রীতার সেক্রেটারি ও জামাইবাবুর সব ব্যাপারেই খুব উৎসাহ। ওরা এসেছে জামশেদপুর থেকে রণিকে রক্ত দেবে বলে, কলকাতায় দিদার কাছে তিন বছরের শিশুকে রেখে এসেছে। যারা রক্ত দেবে তাদেরও ভাল খাওয়া দরকার। কাজেই চার কিলো মাছটাই তুলে নিল ওরা। কেটে বেছে রান্না করে খেয়ে উঠতে বিকেল গড়িয়ে এল। রণিও ভাগ পেল।

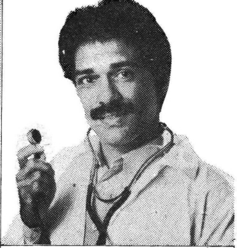
সময় কেটে গেল দেখতে দেখতে। রীতা যেমন ডাক্তারদের পেছনে দৌড়াদৌড়ি করছিল তা চালিয়ে গেল। সত্যি এই বিশাল হাসপাতালে এক বিভাগের সঙ্গে আর এক বিভাগের যোগাযোগ করার জনাই একজন লোক দরকার হয়। ত্রিশটি ওয়ার্ড, আটচল্লিশটি ক্লিনিক আছে এখানে। পাঁচশ ষাটজন ডাক্তার আর সাতশ নার্স দিবারাত্রি রুগীদের সেবায় নিযুক্ত ভাবলেও নিশ্চিন্ত হই – অসুখ হলে আমাদের ভারতেই এমন জায়গা মিলবে। ধন্য সেই সেবাব্রতী মহিলা, আমেরিকান মিশনারী, যিনি ১৯০২ সালে ৪০টি বেড নিয়ে এই কর্মযজ্ঞের উদ্বোধন করেছিলেন। তিনি ডাঃ স্কুডার দয়াবতী। সেবার কাজ শেখাবার জন্য মেয়েদের ডেকে নিলেন। ১৯১৮ সালে মেডিক্যাল শিক্ষণ শুরু হল। প্রায় শতাব্দী কালের সাধনায় সেটি আজ অতি বিখ্যাত খ্রিস্টান মেডিক্যাল কলেজ সংক্ষেপে C. M. C. H এঁদের কর্মজীবনের মূলমন্ত্র 'Not to be served, but to serve' – সত্যি সেবা – নিঃস্বার্থ সেবা করে চলেছেন এঁরা। সবাঙ্গীন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলাবোধ, কর্তব্যবোধ ওঁদের সেবাকে আরো সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলেছে।

অপারেশনের দিন স্থির হয়ে গেল। বিহার থেকে এসেছে লছমন সিং – অনেকদিন থেকে অপারেশনের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু দেশ থেকে ওঁর ব্লাড ডোনাররা এখনও এসে পৌঁছায়নি। কাজেই ওর ডেট পিছিয়ে গেল। রণির ডেট এগিয়ে এল। প্রয়োজনের বেশি ব্লাড ডোনাররা রণিকে পরিবৃত হয়ে আছে – নিঃশেষে প্রাণ কে করিবে দান। তিনজনকে বাছাই করা হল। ওরা রক্ত দিল সকালে। এরা সেমগ্রুপের ব্লাড ডোনার। আগে অন্য গ্রুপের রক্ত দিয়েছে আরো তিনজন। ছয় বোতল রক্ত ওর লাগবে। দুপুর বারোটায় রণিকে ও টি-তে ঢোকালো। সব জেনেশুনেও আমাদের প্রাণে আশঙ্কা। রীতার চোখমুখ শুকিয়ে গেছে। আজ বাড়িতে অরন্ধন। আমরা সবাই এসে ওয়েটিং রুমে বসে আছি আর ঠাকুরের চরণে রণির কল্যাণ প্রার্থনা করছি। বিকেল পাঁচটায় বেরিয়ে এলেন ডঃ জোন – বললেন অপারেশন ভাল হয়েছে। এখনো হার্ট লাঙস মেশিনে রক্ত চলাচল করছে। সাতটায় রণিকে ইনটেনশিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে গেল ওখানে আটচল্লিশ ঘণ্টা ডাক্তাররা সারাক্ষণ ওকে পর্যবেক্ষণ করেছেন – কনসট্যান্ট মনিটারিং, ব্লাড দেওয়া, ব্লাড গ্রুপিং, তিন ঘণ্টা অন্তর রক্তে ক্লটিং ও ক্রশ ম্যাচিং পরীক্ষা করে দেখা, রক্তকে তরল রাখার জন্য ওষুধপত্র দেওয়া – সব মিলিয়ে যেন দুদিন ধরে এক বিরাট যজ্ঞ অনুষ্ঠান চলল। এই যজ্ঞের হোতা ডাক্তাররা – যারা মানুষ দেবতার সেবায় উৎসর্গ করেছে নিজেদের। অপারেশনের পরের দিন সকালে রণি উঠে বসেছে। ব্রাশ দিয়ে দাঁত মেজেছে। হাত নেড়ে বলেছে – ভাল আছি। দরজার ফাঁক দিয়ে আমরা দেখেছি। ওকে দেখে আমার মহাকাশের রাকেশ শর্মাকে মনে পড়ল। হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ করে দিয়ে অপারেশনের পর আবার কাজ চালু করে দিয়ে মানুষকে জীবনে ফিরিয়ে আনার সফলতা আর মহাকাশচারীদের সফলতা দুটি আশ্চর্য কর্মই আমার কাছে এক মনে হল।

ভগবানের কৃপায় অপারেশন খুব ভাল হয়েছে বলে ওকে আর সেমি ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখবার দরকার হল না। সরাসরি ওকে পুরনো বেডে এনে রাখল। হাঁটা চলা, সলিড খাবার সবই শুরু হয়ে গেল। কিন্তু প্রথম কয়েকটা দিন মেপে জল বা দুধ খেতে দিত বলে ওর গরমে খুব কষ্ট হতে লাগল। এপ্রিলের ভোরের গরম মরুভূমির তাপকেও লজ্জা দিতে পারে। রণিকে একদিন আবিষ্কার করা হল বাথরুমের শাওয়ারের তলায় – ধারাস্নানে শয্যাশায়ী।

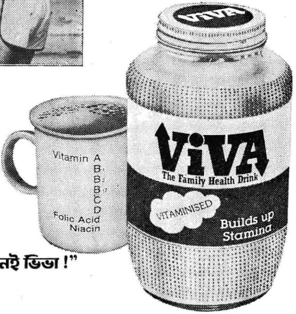
এবারে আমরা ভেলোর ত্যাগ করব। রণিরা আসবে আরো দুদিন বাদে। যাবার আগে দেখা করতে গেলাম ওর সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছ? কাল ঘুম হয়েছিল তো? বৃষ্টি হওয়াতে তো একটু ঠান্ডা হয়েছে। রণি হেসে বলল, 'অপারেশনের পর হৃদপিণ্ডটা বড্ড বেশি দাপাদাপি করছে। এতদিন ধমনী মজে ছিল বলে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত যেত – আর এখন বন্যার জলের বেগে হু হু করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। লাব্‌ডাব্‌ ধ্বনির তুমুল আওয়াজে যে আর ঘুম আসে না।'





ভিটামিন

আমাদের
সুস্থ ও সক্রিয় রাখতে
এদের প্রয়োজন
সবচেয়ে বেশি।



ভিভা ! আপনার শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত ভিটামিনে ভরপুর। গম, বার্লির মল্ট ও ক্রীমযুক্ত দুধে তৈরী। ভিভা নিমেষে গুলে যায় এবং সহজে হজম হয়। আর এই সমস্তর যোগফল......

স্ট্যামিনা—যা আপনাকে তরতাজা রাখে।

তাইতো লক্ষ লক্ষ পরিবারের পরম প্রিয় ভিভা। শক্তি ও স্ট্যামিনা যোগায়···সবসময়।

"স্ট্যামিনা বজায় রাখো সদা তোমার তুলনা নেই ভিভা !"

JiL জগৎজিত ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড

ASP/JIL-1/84 BEN A



ঘরের কাজে আমরা এমন একজনকে চাই, যে ছুটি চাইবে না, দেশে যাবে না, কোনো ব্যাপারে প্রতিবাদ করবে না, মেশিনের মতো কাজ করবে, অসুখ করবে না, অতিথি এলে হাসিমুখে আপ্যায়ন করবে, মায়ের থেকে দরদ নিয়ে বাচ্চাদের সামলাবে, বিশ্বাসী হবে, ভদ্র হবে, রাতে সবার শেষে শোবে, ভোরে সবার আগে উঠে না বলতেই কাজে লেগে যাবে ইত্যাদি। কিন্তু দিন বদলাচ্ছে......

কাজের লোক

ঘরের মধ্যে ঘরছাড়া

মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়

ঘরের কাজের লোক রাখার প্রথা সুদূর প্রাচীন যুগ থেকেই চলে আসছে। যখন থেকে মানব সমাজে কৃষি কাজ শুরু হল বলতে গেলে তখন থেকেই দাস প্রথার উদ্ভব। যুদ্ধ বন্দীদের মেরে না ফেলে তাদের দিয়ে কৃষিকাজ করানো হত। অতি প্রাচীন কাল থেকেই তাদের দিয়ে কৃষিকাজ করানো হত। অতি প্রাচীন কাল থেকেই মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন, সুমের প্রভৃতি স্থানে ক্রীতদাস প্রথার ব্যাপক চল ছিল। অতীত দিনে গ্রীস বা রোমে যে ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ছিল তা ইতিহাস এবং সাহিত্য থেকে জানতে পারি। সেই সময়কার ক্রীতদাস প্রথার প্রমাণ আজও বিদ্যমান। পম্পিয়াই, হারকুলেনিয়াম প্রভৃতি স্থানের ভগ্ন স্তূপ থেকে পাওয়া ক্রীতদাসদের মূর্তি মিউজিয়ামে সাজানো রয়েছে। এই মূর্তিগুলি দেখলে শুধু ক্রীতদাস প্রথার কথাই জানা যায় না, আরও জানা যায় গৃহস্বামীদের ক্রীতদাসদের প্রতি ব্যবহার। প্রভুরা ভৃত্যদের উপর অকথ্য অত্যাচার করতেন এমনকি গৃহস্বামীরা ভূমিকম্পের ভয়ে পালাবার সময়ও ক্রীতদাসদের লোহার শিকলে বেঁধে রেখে গিয়েছিলেন। এই সব প্রাণ ভয়ে ভীত অসহায় ক্রীতদাসদের মুখের অভিব্যক্তি দেখলে আজ প্রায় দুহাজার বছর পরেও আমাদের মন ক্ষোভে ভরে ওঠে।

দাসপ্রথার ইতিহাস ভারতেও বেশ প্রাচীন। সিন্ধু সভ্যতায়ও দাসপ্রথার নজির পাওয়া গেছে। উপনিষদে রাজার ঋষিকে দাস উপহার দেবার উল্লেখ দেখা যায়। রামায়ণ এবং মহাভারতে দাসদাসীর উল্লেখ আছে। তখনকার দিনে দাস ছিল আজ্ঞার পাত্র এবং একান্তভাবে প্রভুর সম্পত্তি। তাদের হোম-যজ্ঞ করার অধিকার থাকত না। বৌদ্ধ সাহিত্যেও দাসের উল্লেখ আছে। তাদের পীড়ন করা, কারাগারে নিক্ষেপ করার বর্ণনাও পাওয়া যায়। দাস বিভিন্ন প্রকারের হত। যেমন কৌটিল্যের মতে ছয়প্রকার, মনুর মতে সাত প্রকার আর নারদের মতে পনেরো প্রকারের দাস হত। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি এইরকম – যুদ্ধে পরাস্ত, ক্রীত, পণে বিজিত, গৃহজ, ভক্তদাস, অন্নদাস, ঋণদাস, দণ্ডদাস ইত্যাদি। মুসলিম ভারতে দাসত্ব প্রথা ছিল, তবে প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে কঠোরতা বা সামাজিক ব্যবধান তেমন প্রবল ছিল না।

মধ্য যুগে স্পেনই প্রথম উপনিবেশে দাসত্ব ব্যবসার প্রবর্তন করে। ইংরাজ ব্যবসায়ীরা আফ্রিকার গ্রামে আগুন লাগিয়ে পলায়নপর অধিবাসীদের ধরে ইউরোপীয় উপনিবেশে চালান দিত। ক্রমশ এই হীন প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে এবং আন্দোলন শুরু হয়। ফলে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবে এই আইন বিধিবদ্ধ হয়ে কার্যকর হয়েছিল ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। আমেরিকায়ও একইভাবে দাসত্ব প্রথা চালু হল এবং পরে আন্দোলনও শুরু হয়েছিল। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে হ্যারিয়েট বীচার স্টো লিখিত কাহিনী 'আঙ্কল টম'স কেবিন' যুক্তরাষ্ট্রে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তুলেছিল। তারপর নানা আন্দোলনের মাধ্যমে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে এই প্রথার বিলোপ সাধন হয়।

এ তো গেল অতীতের কথা। বর্তমানে সমাজ ব্যবস্থা অনেক বদলেছে। প্রভুর অত্যাচারী মনোবৃত্তি এখন আর দেখা যায় না। ভৃত্যেরাও আগের মতো নিরীহ নেই, তাঁরাও সব কিছু জানতে বুঝতে শিখেছেন। সামাজিক ব্যবস্থা বদলালেও ঘরের কাজের লোকের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। আজ আমরা তাদের সুখ সুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে শিখেছি এবং সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি পাছে তাঁরা চলে যান। বাজার করা, রেশন আনা, কেরোসিনের জন্য লাইন দেওয়া, গ্যাসের দোকানে যাওয়া, বাসন

'কাজ করার কি আর অভ্যাস আছে ভাই। আর সত্যি কথা বলতে কি শীতের দিনে ভোর থেকে উঠে জল ঘাঁটা, গরমের দিনে উনুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা কি আর আমাদের কম্মো? কিন্তু কী করি বল সংসার তো শোনে না। দাওনা ভাই একটি নরমশরম লোক যোগাড় করে, আর তো পারি না।'

প্রায় সময়েই আত্মীয় বন্ধুর বাড়ি গেলে এই ধরনের কথা শুনতে পাওয়া যায়। আপনি হয়তো জিজ্ঞেস করলেন, আপনার লোকটিতো বেশ ছিল, গেল কেন?

'ভগবান জানে। এখন তো ওদেরই দিন। খাওয়া, পরা, মাইনে, সিনেমা দেখার পয়সা, টি ভি দেখার ছুটি, তাও ওনাদের মন টেকে না।'

কথাগুলি পরম সত্য, প্রায় প্রত্যেকের জীবনে। ঘরের কাজের লোক না হলে আমাদের চলে না অথচ মনের মতন কেন সাধারণ একজন লোক পাওয়াও মুশকিল। বর্তমান যুগে ঘরে কাজের লোকের প্রয়োজন আগের থেকে প্রকট রূপ নিয়েছে বলা চলে, কারণ যৌথ পরিবার ভেঙে এখন ছোট ছোট সংসার হয়েছে অর্থাৎ স্বামী, স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে। বেশিরভাগ স্ত্রীই আজকাল কোনো না কোনো কাজ করেন, তাঁদেরও স্বামীদের মতোই সময়ে কাজের জায়গায় যেতে হয়, ছেলেমেয়েদের স্কুল কলেজে পাঠাতে হয় – কাজেই তাঁদের পক্ষে ঘরের সব কাজ করা সম্ভব নয়। সারাদিনের খাটুনি তারপর ট্রাম, বাসের কষ্ট সহ্য করে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে কাজ করার শক্তি বা ইচ্ছা কোনটাই থাকে না। এসব ক্ষেত্রে একজন রাতদিনের ঘরের কাজের লোক না থাকলে চলে না।

যদি কোনো মহিলা চাকরি নাও করেন তাও কি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সময় আছে শুধু সংসার দেখার? নেই। কত কাজ রয়েছে ছড়ানো – যেমন ধরুন বাজার করা, ব্যাঙ্কে যাওয়া, ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা, কোথাও বা সাঁতার কাটতে নিয়ে যাওয়া, কেউ-বা গান শেখাতে নিয়ে যান, কেউ কেউ-বা যোগব্যায়াম করান। এমনি কত শত বাইরের কাজ আছে। তাই এইসব ক্ষেত্রেও ঘরের কাজের লোকটির প্রয়োজন একই।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কাজের লোকের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও লোক না পাওয়ার কারণ শিল্পের প্রগতি। লোকেরা ঘরের কাজের থেকে কলকারখানায় বা কুটির শিল্পে কাজ করতে আগ্রহী। তাই গৃহভৃত্যের অনটন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং কাজের লোকের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও লোক না পাওয়ার কারণ শিল্পের প্রগতি। লোকেরা ঘরের কাজের থেকে কলকারখানায় বা কুটিরশিল্পে কাজ করতে আগ্রহী। তাই গৃহভৃত্যের অনটন।

মাজা, রান্না করা, কাপড় কাচা, বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসা ইত্যাদি সংসারের দৈনন্দিন কাজগুলি কারোর একার পক্ষেই করা সম্ভব নয়। তার পরে যদি গৃহিণী চাকুরে হন তবে তো কথাই নেই।

অনেকেই হয়তো পশ্চিমী দেশের উদাহরণ দিয়ে বলবেন সেখানে তো ঘরের কাজের লোক থাকে না বললেই হয়, তাদের চলে কী করে? ঠিক কথা, সে দেশে এইভাবে ঘরের কাজের লোক থাকে না, কিন্তু তাদের রোজনামচা কি আমাদের সঙ্গে মেলে? না জীবন ধারাই এক রকম? সেখানে প্রাত্যহিক জীবনের কাজ অনেক সরল করে নেওয়া হয়েছে, যেমন, খাবার জিনিস বাজারে এমন ভাবে পাওয়া যায় যাতে সেগুলি শুধু গরম করে খেলেই চলে, ভাজা, কষার দরকার হয় না। ঠান্ডার দেশ বলে অপেক্ষাকৃতভাবে জামা কাপড় কম অপরিষ্কার হয়, তাই সপ্তাহে একদিন জামা কাপড় মেশিনে কেচে নিলে চলে। আত্মীয় বা বন্ধু এলে আমাদের মতো আপ্যায়নের প্রাণান্তকর ঘটা নেই। গ্যাসের ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে ঠিকই বা ইলেকট্রিকের সাজসরঞ্জামও, কিন্তু কখন যে কোনটি উধাও হবে তা আপনি নিশ্চিত করে বলতে পারেন না।

কাজেই আমাদের ঘরের কাজের লোকের উপর নির্ভর করতেই হবে। অথচ এখন 'পুরাতন ভৃত্যে'র 'কেষ্ট'-কে খুঁজে পাওয়া দূরের কথা কোন ভৃত্যকেই পুরাতন করা যাচ্ছে না। বিংশ শতাব্দীর প্রগতি তাঁদের জ্ঞানচক্ষু কিছুটা খুলে দিয়েছে, তাঁরা বুঝতে শিখেছেন এই কাজের কোন ভবিষ্যৎ নেই, কোন নিশ্চয়তা নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘর ঝাড়ু দিয়ে, বাসন মেজে, কাপড় কেচে বা বাচ্চা ভুলিয়ে শুধু গ্রাসাচ্ছাদন এবং হাতে কটা টাকা হতে পারে, তার বেশি নয়। এই কাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। প্রতিটি মুহূর্ত মনিবের অঙ্গুলি হেলনে নির্দিষ্ট হচ্ছে। একমাত্র খেয়ে পরে বেঁচে থাকাই যে জীবনের সব কিছু নয়, এটাও এখন তাঁরা উপলব্ধি করেছেন, তাই ঘরের কাজের থেকে শ্রমসাধ্য হলেও কলকারখানায় বা অন্যত্র কাজ করতে চান।

আবার অন্য দিকে আমরাও এমন একজনকে চাই, যে ছুটি চাইবে না, দেশে যাবে না, কোনো ব্যাপারে প্রতিবাদ করবে না, মেশিনের মত কাজ করবে, অসুখ করবে না, অতিথি এলে হাসি মুখে আপায়ন করবে, মায়ের থেকে দরদ নিয়ে বাচ্চাদের সামলাবে, বিশ্বাসী হবে, ভদ্র হবে, রাতে সবার শেষে শোবে, ভোরে সবার আগে উঠে না বলতেই কাজে লেগে যাবে ইত্যাদি। কিন্তু দিন বদলাচ্ছে, ঘরের কাজের লোকটি ভাবতে শিখেছে। তাঁরা ঘর ছেড়ে এসে ঘরের স্নেহ পেতে চাইছেন। চাকর বললে অনেকেই ভাবেন এটা অপমানকর। কারণ চাকর শব্দের অধিকারীর না আছে কাজের নির্দিষ্ট সময় না আছে ছুটির বাঁধা নিয়ম, না প্রমোশন না ইনক্রিমেন্টের আশা। এই সব কারণেই বোধ হয় তাঁরা চাকর নামটি শুনতে চান না বা কোথাও স্থায়ী ভাবে থাকার আগ্রহও অনুভব করেন না। চাকর নামটিতেই তাঁদের ঘৃণা।

সামাজিক ব্যবস্থা বদলালেও ঘরের কাজের লোকের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। আজ আমরা তাঁদের সুখসুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে শিখেছি এবং সন্ত্রস্ত হয়ে থাকি পাছে তাঁরা চলে যান।



তবু এখনও ঘরের কাজের লোক পাওয়া যায় এবং ভৃত্য রাখা অব্যাহত আছে। আট দশ বছরের ছেলে মেয়ে থেকে শুরু করে বৃধ বৃধা পর্যন্ত সবাই কাজ পান। তবে অনেকেরই নজর থাকে কমবয়সীদের ওপর, কারণ মাইনে কম, খায় কম তাছাড়া তাদের মধ্যে তখনও জ্ঞানের উন্মেষ হয় না।

ঘরের কাজের মানুষদের নিজস্ব একটা জগৎ আছে। তাঁরা নিজেদের বাড়ির বা পাড়ার প্রায় সব খবরই রাখেন। রাত্রে কাজ সেরে অনেক সময় এক পাড়ার লোকেরা একসঙ্গে বসে গল্প করেন, যার বিষয়বস্তু প্রধানত নিজ নিজ মনিব........

বিকেলে পথেঘাটে বেরুলে বেশ কিছু ঘরের কাজের লোকের দর্শন পাওয়া যায়, তাঁরা 'বাবা' বা 'বেবী'দের প্র্যামে চড়িয়ে বা হাঁটিয়ে রাস্তার ফুটপাথে বা নিকটস্থ পার্কে ঘুরে বেড়ান। এঁদের অধিকাংশই 'আয়া' শ্রেণীর। এই সময়টুকু গৃহস্বামিনীদের চোখের বাইরে তাঁদের একান্ত নিজস্ব সময়, মন খুলে কথা বলা বা প্রাণ খুলে হাসার।

ঘরের কাজের মানুষদের নিজস্ব একটা জগৎ আছে। তাঁরা নিজেদের বাড়ির বা পাড়ার প্রায় সব খবরই রাখেন। রাত্রে কাজ সেরে অনেক সময় এক পাড়ার লোকেরা একসঙ্গে বসে গল্প করেন, যার বিষয়বস্তু প্রধানত নিজ নিজ মনিব, নাহলে সিনেমার কথা কিংবা দেশের কথা। অনেক সময় তাস খেলাও চলে, যা পরে জুয়াতে দাঁড়ায়।

পশ্চিমবাংলায় বিশেষত কলকাতা শহরে যারা ঘরের কাজ করেন তাঁদের অধিকাংশই আসেন মেদিনীপুর, বিহার, উড়িষ্যা ইত্যাদি স্থান থেকে। অবশ্য দক্ষিণ ভারতের থেকে প্রচুর লোক আসেন ঘরের কাজের জন্য। একজন কাজ করার পর দেশে ফিরে গিয়ে আত্মীয় বা বন্ধুদের নিয়ে ফিরে আসেন কাজে লাগিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এঁদের মধ্যে অনেকে আবার কাজ করিয়ে দেবার জন্যে মোটা রকম কমিশনও নিয়ে থাকেন।

সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী এখনও অনেক দিন আমাদের ঘরের লোকের ওপর নির্ভর করতে হবে। এই অবস্থায় আমাদেরও সস্নেহে ভাবতে হবে গৃহছাড়া মানুষগুলির কথা। সহানুভূতি দিয়ে বিচার করতে হবে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা, বিবাহিত জীবনের কথা, তাঁদের ছেলেমেয়েদের কথা, বৃধ অবস্থায় তাঁদের সচ্ছলতার কথা। আমরা যদি তাঁদের মানবিকতার দৃষ্টি দিয়ে দেখি এবং স্নেহ মমতা দিই তাহলে বোধহয় এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। আবার তাঁরাও যদি বুঝতে চেষ্টা করেন বাড়ির সদস্য হয়ে থাকলে আর্থিক লাভ কারণ ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে বিদেশে একা থেকে রোজগারের থেকে খরচই বেশি হয়। তাই এ সমস্যার সমাধান একক চেষ্টায় হবে না, দুজনকেই সচেষ্ট হতে হবে।



ফটো : সঞ্জীব রুদ্র

সাঁওতাল নেত্রী ঃ মুংগলি

শিউড়ির ট্রাইবাল অফিসে মুংগলির নাম শুনেছিলাম। মুংগলি মুর্মু, জাতিতে সাঁওতাল – মাত্র ২৬ বছর বয়সেই সাঁওতালদের নেত্রী হয়ে গেছে। সাঁওতাল মেয়ে পুরুষ ওর নাম শুনলেই সম্ভ্রমে মাথা নোয়ায়। সাঁওতাল ছাড়াও শিউড়ির সমস্ত সরকারি অফিসেও মুংগলি পরিচিত। সবাই ওকে রীতিমত ভয় পায়। খোদ ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসেও ওর অবাধ গতিবিধি। ম্যাজিস্ট্রেটের ড্রাইভার বাসকি তো ওর নাম শুনে চমকে উঠেছিল। পরে শুনেছিলাম, বাসকি তার বউকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। খোরপোশ দিত না। মুংগলি এই খবর জানতে পেরে বাসকিকে কোর্টের কাঠগড়ায় তুলেছিল। বিচারের রায়ে বাসকি ছেড়ে দেওয়া বউকে প্রতি মাসে ১২৫ টাকা করে দিতে বাধ্য হয়।

এমনই অনেক ঘটনার নায়িকা মুংগলি। সমস্ত অন্যায়ের প্রতিবাদে সে লড়াইয়ে নেমেছে।

শিউড়ি থেকে কিছু দূরে রাজনগর সাঁওতাল বস্তিতে মুংগলির বাস। আশপাশের সমস্ত সাঁওতালই এক ডাকে ওকে চেনে।

শালবনের নিবিড় মায়ার আড়ালে মুংগলিদের বস্তি। সব মিলিয়ে পঁয়তাল্লিশটা ঘর, দুশো জন বাসিন্দা। মুংগলির বাবার নাম সোম, ভাইয়ের নাম বামেশ্বরম। বাড়িতে প্রৌঢ়া মা ও ভাইয়ের বউ রয়েছে। ওদের পরিবারে আর রয়েছে চারটে গরু, দুটো ছাগল, আটটা কুকুর, আটটা মুরগি। এছাড়া আছে শখের একটি বুলবুলি পাখি।

বস্তিতে ঢুকতেই বিস্মিত মানুষগুলো এগিয়ে এল। মুংগলির কথা জিজ্ঞেস করতেই ওর বাবা সোম বললেন, মুংগলি স্নান করতে গেছে।

আজকের নেত্রী এই মুংগলিকে নিয়ে কম হাঙ্গামা পোয়াতে হয়নি ওর বাবাকে। পনের বছরের মুংগলির ওপর বদনাম চড়িয়ে বিহারের যোগপাহাড়ীর মাহা সম্প্রদায়-এর কিছু বদমাশ হামলা করতে এসেছিল ওদের বাড়িতে। সেটা ১৯৭৪ সাল। মুংগলির দৃঢ়তায় যদিও ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল তারা। সেই সময় রাজনীতি করা মানুষ ফটিক মাহা ওদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ধরেছিল।

সেই ঘটনা মুংগলির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। সে রাজনীতির সংস্পর্শে এসে পড়ে।

ওপর থেকে নরম মনে হলেও মুংগলির মধ্যে একটা গোঁ ছিল ভীষণ। রুখে দাঁড়াবার একটা স্বভাবজ প্রবৃত্তি তাকে রাজনীতিতে টেনে নিয়ে এল। একদিন তাই ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলে মুংগলি মিছিলের শামিল হল। মুংগলিকে দেখে অন্যান্য সাঁওতাল মেয়েরাও তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মুক্তির আলোয়।

আজ ওখানকার যে-কোনো বিচার সভায় মুংগলির যোগদান অপরিহার্য।

যেখানে বিচার হয় সেখানেই আমায় বসতে হল। স্নান সেরে মুংগলি এল। ছোটখাট মেয়েটার এ অঞ্চলে এমন দাপট তা ওকে দেখে বোঝা যায় না। কিন্তু একান্তে আলাপ করতেই ওর ভেতরের দীপ্তি যেন ফুটে উঠল।

'৭৮ সাল থেকে মুংগলি ওই চত্বরের পঞ্চায়েত সমিতির নমিনি সদস্যা। সেই থেকেই পঞ্চায়েতের বিচারে ওর ডাক পড়ে। ডাক পড়ে গ্রামের অন্যান্য বিচারেও।

সেদিন বিচার ছিল বাবুজান টুডুর বোনের স্বামীর। সে নিজের বউকে ছেড়ে অন্য এক মেয়ের আশনাইয়ে পড়েছে। কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটি হাজির হয়েছে তার শ্বশুরবাড়ি বিহারের ঘাট পাড়ুলিয়া গ্রাম থেকে – সঙ্গে জোর করে স্বামীটাকেও ধরে আনা হয়েছে।

বাবুজানের মা মুংগলির হাত ধরে বলেছে, অনেক টাকা খরচ করে বিয়ে দিয়েছিলাম মেয়ের। সে সুখী হল না। ওরা মেয়েকে মারধোর করে – মুংগলি তুমি বিচার করে দাও।

শুরু হল বিচার। সব শুনে মুংগলি দৃঢ়তার সঙ্গে লোকটিকে বলল, তুমি আমাদের মেয়ের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছ, বউ থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না। এই রায় না মানলে আদালতের বিচারে দাঁড়াতে হবে।

কেঁচোর মুখে নুন পড়ল। ছেলেটি নির্বিবাদে রায় মেনে নিল। মুংগলির সঙ্গে একান্তে কথা বলে বুঝেছি, সে অনেক চিন্তা করে। সে চায়, এই দেশের তামাম ব্যবস্থার সংশোধন।

যদিও রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজের দলের লোকদের প্রতিও ওর অনেক অভিযোগ। সামান্য সুযোগ পেলেই নেতৃস্থানীয় মানুষরাও গরিবদের প্রাপ্যতে হাত বসাচ্ছে। অশিক্ষিত মানুষগুলোকে মদ গিলিয়ে যা খুশি তাইতে টিপ ছাপ দিয়ে বৈধ চুরির রাস্তা খুঁজছে। মুংগলি বলল, মহাজনী সাহারা আজ সাঁওতালদের বিরুদ্ধে খাপ্পা। তার কারণ আমরা আর সুদে টাকা ধার নিই না। ব্যাঙ্কের লোনই গ্রহণ করি। ব্যাঙ্কের বাবুরাও সুযোগ পেলেই আমাদের লোকদের ঠকায়।

মুংগলি কীভাবে সাঁওতালরা দিনের পর দিন শোষিত হচ্ছে সব দেখাল।

ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছে মুংগলি। রাত্রে স্থানীয় বয়স্ক শিক্ষা কোর্সের মাস্টারি করে। এতে মোট চুরাশি টাকা পায় রাহাখরচ সমেত। মুংগলি আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু অন্য শিক্ষকরা আসে না। সরকারি মাইনে নেয় অথচ ভিন গাঁয়ে পড়ে থাকে। মুংগলি এখন দাবি তুলেছে ট্রাইবাল স্কুলে ট্রাইবাল শিক্ষক দিতে হবে। না হলে শিক্ষকরা এত ফাঁকি দিলে ছেলেরা শিখবে কী?

গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের কাছ থেকে জানা গেল, মুংগলির প্রচেষ্টায় ৮/১০টা গ্রামের ছেলেদের মদ খেয়ে মেয়েদের গায়ে হাত তোলার অভ্যাস পালটেছে। বউ বদল বন্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় বিবাহ করলেই মুংগলি মামলা ঠুকছে। খোরপোশ দেবে এত পয়সা কোথায়? ফলে সবাই সাবধান হয়ে গেছে।

সাঁওতাল পরিবারগুলির মেয়েরাই নয়, ছেলেরাও মুংগলির সব কাজে সাহায্য করে। সবাই ওর চাপে পড়ে লেখাপড়া শিখছে। আজ তাদের চোখে মানুষ হবার স্বপ্ন, চাকরি পাবার স্বপ্ন দেখা দিয়েছে। এ সবই হয়েছে মুংগলির গুণে।

মুংগলির নিজের মনে কিন্তু এত পরিশ্রম করেও শান্তি নেই। শাল মহুয়ার ছায়ায় ছায়ায় ওকে মনে হয় ভীষণ একাকী। নিজের সংসারের অভাব ঘোচে না। মাঝে মাঝে মনে হয় এসব কাজ সে ছেড়ে দেবে। নিজের ঘর বাঁধার স্বপ্ন হয়তো ছিল কিন্তু তা আর বাস্তব হল কই?

কুসংস্কার ভরা একটা জাতির সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করা যে কত কঠিন সে ওর কথাতেই বোঝা গেল। ওই জানাল, এখনো সমাজে ডাইনী বিশ্বাস প্রচলিত আছে। আছে আরো অনেক কুসংস্কার।

তবু আজ মুংগলির মতো কিছু মেয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতি সচেতন হয়ে সমাজের চেহারাটা পালটাতে চাইছে নিজেকে নিবেদন করে। এটাই আশার কথা, এর মধ্যে দিয়েই একদিন একটা জাতির নবজাগরণ আসবে যা নিঃসন্দেহে ভারতের কল্যাণ সাধন করবে।

অমলেন্দু কুণ্ডু



মুংগলি মুর্মু

ফটো ঃ লেখক


নেস্টাম বেবি সিরিয়্যাল। আদর্শ, শুরু
করার জন্য। বেড়ে ওঠার পক্ষে অনন্য।
নেস্টাম আর দুধ—পুষ্টির দিক থেকে এক পরিপূর্ণ খাবার।
আপনার বাচ্চার চার মাস বয়েস হলেই দুধের সংগে সংগে তার শক্ত খাবারেরও দরকার। নেস্টাম বেবি সিরিয়্যাল দিয়ে ওকে শক্ত খাবার ধরান—শিশুদের সহজে হজম করার উপযোগী করে বিশেষভাবে এটি তৈরী।
আগে থেকে ফোটানো কুসুম কুসুম দুধে নেস্টাম শুধু মিশিয়ে নিন। সংগে সংগেই পুষ্টিকারক খাবার তৈরী। শিশুকে মোটাসোটা আর প্রাণোচ্ছল করে তুলতে সাহায্য করে।
টিনের গায়ে লেখা নিয়মাবলী ঠিকমত মেনে চলুন।
নেস্টাম ও আপনার প্রস্তুত প্রণালী—শিশুর খাবারে অসংখ্য রকমারিত্ব।
আপনার বাচ্চা যেমন যেমন বড় হবে তেমনি আপনিও তাকে নানারকম স্বাদের খাবার তৈরী করে দিতে পারেন। নেস্টামের সংগে চটকানো সব্জী, সেদ্ধ করা ফল ও ডাল মিশিয়ে নতুন নতুন স্বাদের খাবার ওকে দিন। এমনি করেই ও বাড়ির সবার সংগে মিলে নানারকম খাবার খেতে শিখবে।
নেস্টাম®
রাইস
আয়রণ ও ভিটামিনে ভরপূর
দুধে মিশিয়ে নিন
এখন পাওয়া যাচ্ছে নতুন প্যাকে
Nestlé
Nestum
baby cereal
Rice
mix with milk
বিনামূল্যে!
খাবারে রকমারী স্বাদ আপনার বাচ্চাকে খুশি করবে। সুতরাং বিনামূল্যে নেস্টাম রেসিপি পুস্তিকার জন্যে নীচের ঠিকানায় লিখুন:
নেস্টাম পোস্ট বক্স নং ৬০১৬, নিউ দিল্লী ১১০০০৮
Nestlé
FSL/N/3800BN

জীবন প্রস্তুতির দুটি হাতিয়ার

গান শিখতে হলে একেবারে গোড়াতেই দরকার স্বরসাধনা — সা, রে, গা, মা — ইত্যাদি স্বর গলায় তুলে নিতে হয় ঠিকভাবে। তারপর একটু একটু করে এগোতে হয়। সন্তানের শিক্ষাতেও একেবারে শুরুতে দরকার ইন্দ্রিয়গুলির চর্চা। প্রথমেই শিক্ষার্থীর চোখ, কান, নাক প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে সজাগ এবং তীক্ষ্ম করে তুলতে হয়। কারণ আমাদের জ্ঞান, বোধ ইত্যাদি মস্তিষ্কে পৌঁছয় ইন্দ্রিয়গুলির পথ ধরে। মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে। মনটিকেও জ্ঞান আহরণ এবং জ্ঞান সঞ্চয় করবার জন্য একাগ্রতা শেখাতে হয়।

মনসহ এই ইন্দ্রিয়গুলির চর্চার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের বোধটি পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট করে তুলতে হবে। জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান প্রকাশের এই মাধ্যমটি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সঙ্গী হয়ে থাকবে।

ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতাসাধন

সন্তানের ইন্দ্রিয়গুলিকে তীক্ষ্ম করে তোলা না হলে শিক্ষার ব্যাপারে সে অনগ্রসর থেকে যায়। শিশুকে শেখাতে হবে তার চারপাশে যে নানা রঙ, নানা শব্দ, নানা গন্ধ, নানা স্বাদ, নানা স্পর্শ সেগুলির বিশেষত্ব। সেই বিশেষত্ব তাকে মনে রাখতে হবে। কোকিলের ডাক-এর সঙ্গে অন্য কোনো পাখির মিষ্টি আওয়াজের তফাত অথবা নীল, গাঢ় নীল, ফিকে নীল-এর তফাত, অথবা নিমের মতো তেতো আর উচ্ছের মতো তেতো, তুলোর মতো নরম আর পশমের মতো নরম — এসবের পার্থক্য তাকে বুঝতে হবে। নানা জিনিসের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে সেগুলো লক্ষ্য করতে শিখিয়ে সন্তানদের ইন্দ্রিয়গুলির উৎকর্ষ সাধন করা যায়। আমরা ছেলেমেয়েদের এই প্রধান ইন্দ্রিয়গুলির চর্চা করতে-যথেষ্ট সহায়তা করি না। অত্যন্ত সচেতনভাবেই পিতামাতা এবং শিক্ষককে এ-কাজ করতে হবে। দশটি ছেলেমেয়েকে কিছুক্ষণ আগে যে দৃশ্য দেখানো হয়েছে — সেই দৃশ্য যদি তাদের বর্ণনা করতে বলা হয়, তাহলে দেখা যাবে দশজন দশরকম বলছে এবং অনেকেই অনেক প্রধান বিষয় লক্ষ্য করেনি। এর কারণ এদের ইন্দ্রিয়গুলির যথোচিত চর্চা হয়নি।

ইন্দ্রিয়ের চর্চায় মনোযোগ বিশেষ দরকার। মনোযোগ ছাড়া ঠিকভাবে কিছু দেখা যায় না, শোনা যায় না স্পর্শ করে ঠিকমত অনুভবও করা যায় না।

মনের কাজ হল পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্থাৎ দেখে, শুনে, ঘ্রাণ নিয়ে, স্বাদ নিয়ে, স্পর্শ করে যে ধারণা হল, সেই ধারণাটিকে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেওয়া।

তাই মনোযোগ দিতে না শিখলে কোনো জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করা যায় না। কিছু সঠিকভাবে জানতে বা শিখতে হলেই মনোযোগ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মনোযোগ ছাড়া তো স্মৃতিশক্তির কথা ভাবাই যায় না। শিশু যা করছে, যা শুনছে, যা পড়ছে সব কিছুই সে মনোযোগের সঙ্গে করবে — এ শিক্ষাটা গোড়াতেই দিতে হবে। যে শিক্ষার্থীর মনোযোগ যত বেশি, তার শিক্ষাও তত অগ্রসর। মনোযোগ দেবার শিক্ষা দেওয়া হয় না বলেই ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার কথা শুনতে পারে না। বাড়িতে বসেও মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে পারে না। অমনোযোগীরা যে কেবল লেখাপড়া বা শিক্ষণীয় বিষয়ে অমনোযোগী তা নয়, এরা খেলার মাঠে, সিনেমা দেখতে গিয়ে, বক্তৃতা শুনতে গিয়ে সর্বত্রই অমনোযোগীর পরিচয় দেয়। শৈশবে যাদের মনোযোগ অভ্যাস হল না, তারা গুরুজনের কথা, বন্ধুজনের কথা বেশিক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারে না। এই মনোযোগ সম্পর্কে একটা সুন্দর উদাহরণ আছে মহাভারতে। যেখানে অর্জুনের মনোযোগ একেবারে চরমে পৌঁছেছে। আচার্য দ্রোণ কুরুপাণ্ডবদের অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়েছেন। এবার একদিন তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। গাছের উপর বসে-থাকা একটা ভাসপাখির মাথাটা তীর ছুঁড়ে কেটে ফেলতে হবে। দ্রোণাচার্য ছাত্রদের নিয়ে গাছের পাশে দাঁড়িয়ে একে একে জিজ্ঞাসা করছেন — কি দেখছ? সাদাসিধে যুধিষ্ঠির উত্তরে বললেন, 'আমি আপনাকে দেখছি, ভাইদের দেখছি, গাছ, পাখি, আকাশ সব দেখতে পাচ্ছি।' অর্থাৎ তার মনোযোগের কোনো বালাই নেই। একে একে সব ভাইরাও অনেকটা তাঁর মতোই উত্তর দিলেন। অবশেষে আচার্য অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, 'শিরঃ পশ্যামি ভাসস্য, ন তু গাত্রম্' — অর্থাৎ আমি ভাসপাখির মাথাটিই শুধুই দেখতে পাচ্ছি, তার দেহটাও দেখতে পাচ্ছি না। এই হল মনোযোগের চরম দৃষ্টান্ত। এরই নাম একাগ্রতা। ভাসপাখির মুণ্ডচ্ছেদ যাকে করতে হবে তীর দিয়ে, তার পক্ষে তীর-ধনুক হাতে করে আর কিছুই দেখা সম্ভব নয়!

স্বামীজী বলেছেন — সর্বপ্রকার জ্ঞান লাভের জন্য পরম প্রয়োজন হচ্ছে একাগ্রতা। মন যতই একাগ্র হয়ে উঠবে, ততই শিক্ষার্থী তার জ্ঞাতব্য বিষয়কে নিবিড় করে অধিকার করতে পারবে। একাগ্রতার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে স্বামীজী বলেছেন :

'The world is ready to give up its secrets if we only know how to knock, how to give the necessary blow. The strength and force of the blow comes through concentration.' অর্থাৎ আমরা যদি ঠিকমত আঘাত করতে পারি তাহলে দুনিয়া অবশ্যই তার গোপন রহস্য উন্মোচন করে দেবে। একাগ্রতার দ্বারাই এই প্রচণ্ড আঘাত করা যায়।

মাতৃভাষার যথার্থ শিক্ষা

ইন্দ্রিয়গুলির চর্চার পরেই আসছে শিক্ষার মাধ্যমটি আয়ত্তে আনার কথা। এই মাধ্যম হচ্ছে মাতৃভাষা। ইন্দ্রিয়গুলি বেশ সক্ষম হয়ে উঠলেই মাতৃভাষার চর্চা শুরু করা যেতে পারে। সাধারণত এই চর্চা শিশুর ছয়-সাত বছর বয়স থেকে করা উচিত। অবশ্য এর আগে কিছু মুখে মুখে ছড়া শেখানো যেতে পারে।

এ যুগের শিশুরা অনেক সপ্রতিভ। তাই অর্থহীন 'হাট্টিমা-টিম্ টিম্/তারা মাঠে পাড়ে ডিম' — গোছের ছড়ায় বেশিদিন না কাটিয়ে শিশুবোধ্য কবিতায় চলে আসা উচিত। এবং এ-সব কবিতায় কিছু নীতি কথা থাকলে তা যথা বয়সে জীবনের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। ছড়া ও কবিতার সঙ্গে কিছু গান — যার সুর সোজা, বক্তব্য সোজা, শিশুকে শেখানো যেতে পারে।

পুস্তকহীন শৈশবের পর যথা-সময়ে আসবে পড়া এবং পড়ার কিছুকাল পর লেখা। আমরা মুখে বলি লেখাপড়া, তাই পাঁচবছরে হাতেখড়ি দিয়েই সন্তান গলদঘর্ম হয়ে স্বরব্যঞ্জন লিখতে শুরু করে। লেখানোর জন্য এই ব্যস্ততা একেবারেই অর্থহীন।

মাতৃভাষা শেখানোর ব্যাপারে একটি কথা মনে রাখতে হয়। কবি কালিদাস সম্পর্কে প্রচলিত গল্পে এই কথা সুন্দর ফুটে উঠেছে। সামনে পড়ে থাকা শুকনো একটা গাছ দেখে মহাকবি কালিদাস বলেছিলেন, 'নীরসঃ তরুবরঃ', আর একই দৃশ্য দেখে কবি বররুচি বলেছিলেন, 'শুষ্কং কাষ্ঠং'। দুজনেই ঠিক ভাবটি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু শব্দের প্রয়োগে কী নিদারুণ প্রভেদ! একটি কত সুন্দর, অপরটি মারমুখো! এ কাহিনী থেকে বোঝা যাচ্ছে 'ভাষা লালিত্যপূর্ণ থাকা প্রয়োজন।' ভাষার লালিত্য উপভোগ ও তার প্রয়োগ করতে শৈশবেই শেখানো যায়। তাতে মাতৃভাষার চর্চা আনন্দময় হয়ে ওঠে।

এই কাহিনী থেকে বোঝা যাচ্ছে, ভাষাকে শুদ্ধ হতে হবে। এই লালিত্য আর শুদ্ধতা — মাতৃভাষা শেখানোর সময় অভিভাবককে লক্ষ্য রাখতে হবে।

মাতৃভাষা শেখানোর ব্যাপারে উপযুক্ত সাহিত্যের কথা আসছে। সন্তানের শিক্ষায় সাহিত্য-রসের যোগান থাকা দরকার। শিশু যখন নিজে পড়তে পারে না তখন থেকেই এই যোগান শুরু হতে পারে। পাঁচ-ছ বছর বয়স থেকে যখন তার কবিতা মনে রাখবার ক্ষমতা হয়েছে, তখন তাকে যোগীন্দ্র সরকারের 'হাসিখুশি', সুকুমার রায়ের নানা কবিতা, রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' রসিয়ে শেখানো যায়। এই পড়া, গান প্রভৃতি উপলক্ষ করে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে অভিভাবকরা যোগ দেন, তাহলে বাড়িতে ছোটবড়র মধ্যে যে যোগাযোগের অভাববোধ — সেটাও উভয়পক্ষের কেটে যায়।

শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম যে মাতৃভাষা এ সম্পর্কে পৃথিবীর মনীষীদের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। মাতৃভাষার মাধ্যমেই আমরা সার্থকভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারি। আমাদের মাতৃভাষা — শিক্ষা রুগ্ন হলে ভেতরের মানুষটিও রুগ্ন, বিকৃত হয়। মাতৃভাষায় অধিকার না থাকলে শুধু প্রকাশশক্তি নয়, চিন্তাশক্তিও দুর্বল হতে বাধ্য। আমি বেঁচে আছি এটা যেমন সত্য, তেমনি আমার সঙ্গে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মাতৃভাষা রয়েছে এটাও সত্য। এমন আমরণ সঙ্গীকে শুদ্ধ, সবল, সুন্দর করে তোলার শিক্ষা শৈশব থেকেই শুরু হওয়া প্রয়োজন।

ডঃ সুখময় সেনগুপ্ত

পরবর্তী সংখ্যায় প্রকৃতি, সাহিত্য, সংগীত

প্রসঙ্গ বিবিধ ভারতী



অস্বীকার করে লাভ নেই কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম যখন বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্যে বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান শুরু হল তখন অনেকেই একে কোনো মর্যাদা দিতে চাইতেন না। বিশেষ করে তথাকথিত রুচিশীল শ্রোতারা। তাঁরা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মুখ ফুটে বলতেনও ওটা পান বিড়ির দোকানের জন্য নিছক চিত্ত বিনোদনের অনুষ্ঠান।

কিন্তু আজ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়েই বলছি বিবিধ ভারতীর কোনো না কোনো আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান শোনেন না এমন রুচিশীল শ্রোতা খুব কমই আছেন।

স্বভাবতই বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে তরুণ-তরুণী বা সাধারণ শ্রোতার কৌতূহলও অনেক বেড়েছে। আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে কখন আপনার দেখা পাব। আবার অনেকে ফাংশনে গাইবার জন্য অল ইন্ডিয়া রেডিওতে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করে। তাদের অনেকেই জানতে চায় বিবিধ ভারতীর প্রোগ্রামগুলো কারা করেন; বেতার কেন্দ্রের সাধারণ অনুষ্ঠানের মত সেখানেই তাদের স্টুডিওতে এবং তত্ত্বাবধানেই এগুলো তৈরি হয় কিনা ইত্যাদি নানান প্রশ্ন।

শুনেছি অনেক তরুণ লেখক বা অভিনেতা-অভিনেত্রীও বিবিধ ভারতীতে অংশগ্রহণের ইচ্ছায় সরাসরি বেতার কেন্দ্রে চলে যান। অনেক সময় শ্রোতাদের চিঠিও তাদের দপ্তরের ঠিকানায় যায়।

শুরুতেই বিবিধ ভারতী প্রসঙ্গে যে কথা বলেছিলাম, তথাকথিত শ্রোতারা তখন এই অনুষ্ঠানগুলিকে কিছুটা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন, সেটা যে একেবারে অযৌক্তিক ছিল তা নয়। মূলত বিবিধ ভারতীতে তখন শুধু গান বা এমন কিছু হালকা প্রোগ্রাম হত, যে তার শিল্পমান নিয়ে গর্ব করার মতো তেমন কিছু ছিল না। বিবিধ ভারতীকে সেই অবস্থা থেকে আজ শিক্ষিত, নানা বয়সের রুচিশীল শ্রোতাদের কাছে পৌছে দেবার অনেকটা কৃতিত্বই আমরা দাবি করতে পারি।

রেডিওর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন আমরা বহুদিন ধরেই সিলোন থেকে শুনতে অভ্যস্ত। কলকাতায় ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি বিবিধ ভারতী শুরু হয়। প্রচুর হিন্দি গান এবং রেডিও-বিজ্ঞাপন চট করে জনপ্রিয়

রেডিওর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন এদেশে নতুন ছিল বলেই বিজ্ঞাপনগুলি তৈরি করবার সুযোগ-সুবিধে খুবই কম ছিল বললেই চলে। কলকাতায় কোনো প্রোডিউসার বা স্টুডিও ছিল না। কলকাতার প্রথম স্টুডিও কাজ শুরু করে ১৯৬৮-র জুলাই-আগস্ট মাসে। নাম লিভিং সাউন্ড। সেই সময় থেকেই স্টুডিওর সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়ি এবং আজও জড়িয়ে আছি।

প্রথম থেকেই ওই স্টুডিওতে যেসব Jingle/Spot তৈরি হয়েছিল, সেই মানের Jingle/Spot এখনো কলকাতায় খুবই কম হয়। আপনাদের হয়তো আজও মনে আছে 'জবাকুসুম তেল আমাকে অনেক সুন্দর স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়' ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেকে হয়তো আজও জানেন না Jingle জিনিসটা কী। রেডিওর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দু রকমের হয়। এটা হল ১৫ বা ৩০ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপন, যাকে বলা হয় Spot, এই Spot যখন গানে গানে বলা হয় তাকে বলে Jingje; আবার যে বিজ্ঞাপনে গান ও কথা দুই থাকে তাকে বলা হয় Jingle-Spot. Technically কিন্তু Radio-র খাতাপত্রে Jingle-কেও Spot বলা হয়।

এবার আপনাদের জানাই এই ধরনের ১৫ বা ৩০ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপন করতে আকাশবাণী কিরকম টাকা নেয়। একটা ১৫ সেকেন্ডের Spot করতে খরচ পড়ে A Time-এ ১৬০ টাকা। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে কোনো A Time-এই Spotটি বাজবে একবার। ৩০ সেকেন্ডে লাগে ৩২০ টাকা। A Time ছাড়াও অন্য Time-ও আছে : B Time, Super A ইত্যাদি। Fixed Time Spot যদি কেউ নেন তাহলে আপনি যে সময়ে চাইবেন রোজ ঠিক একই সময়ে বাজবে। খরচ অবশ্য লাগবে ২৫% বেশি।

সাধারণত যারা রেডিও – সময় কেনেন তারা কোনো না কোনো এজেন্সির মাধ্যমে তা নেন। এজেন্সিকে আকাশবাণী এজন্য ১৫% কমিশন দেয়। আপনি যদি সরাসরি নিজেই এই রেডিওর সময় কিনতে চান – এই ১৫% ছাড় পাবেন না।

এ ছাড়াও Sponsored Programme-এর মাধ্যমেও বিজ্ঞাপন করা যেতে পারে। Sponsored Programme আধঘণ্টা, ১৫ বা ১০ মিনিটের হয়। রেডিও বিজ্ঞাপন এখন বেশ একটা ভাল প্রফেশন।

এবারে আসা যাক বিবিধ ভারতীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাটকের বিষয়ে। গতানুগতিক অনুষ্ঠানের বাইরে নতুন কী করা যায় যখন মনে মনে ভাবছি ঠিক তখনই আমাদের এক সাহিত্যিক দাদা বললেন, তোমরা নাটক করছ না কেন? বাংলাদেশ নাটক প্রধান দেশ। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখা গল্প বা উপন্যাস থেকেও নাটক করে নিতে পার। অনুষ্ঠানের ভেতর তখনো বিবিধ ভারতীতে আধ ঘণ্টার কোনো প্রোগ্রাম শুরু হয়নি। সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারিত ছিল পনেরো মিনিট। তাই ভদ্রলোকের প্রস্তাবটি মন্দ না লাগলেও একটা সন্দেহ প্রকাশ করলাম আমরা। রেডিওতে ধারাবাহিক কোনো নাটক সপ্তাহে একদিন পনেরো মিনিট করে শুনতে উৎসাহী হবে কেন শ্রোতারা?

উনি বললেন, সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক উপন্যাসের তিন চার পৃষ্ঠা করে যারা পড়ে তারাই শুনবে।

যুক্তিটা অস্বীকার করা গেল না। তখনই একটা প্রস্তাব এল বিবিধ ভারতীতে নাটকের প্রোগ্রাম করতে চান কোনো একজন বিজ্ঞাপনদাতা। শুরু হল কলকাতা বেতার কেন্দ্র বিবিধ ভারতী থেকে একটি নতুন অনুষ্ঠান – বরণীয় লেখকের স্মরণীয় গল্পের নাটকের আসর। বলতে দ্বিধা নেই সেদিন থেকেই যেন শুরু হল বিবিধ ভারতীর এক নতুন অভিযান। রাতারাতি শ্রোতাদের ভেতর শুরু হল এক গভীর আলোড়ন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আগের গন্ডি ভেঙে বিবিধ ভারতী পৌছে গেল রুচিশীল বিদগ্ধ শ্রোতাদের ঘরে।

এরপর থেকেই আমাদের অনুসরণ করে অন্যান্য প্রযোজকরাও শুরু করলেন বিবিধ ভারতীতে নাটক।

আমরা তাই কিছুটা দিক পরিবর্তন করে নাটকের সঙ্গেই পরীক্ষামূলক ভাবে শুরু করলাম অন্য কিছু বিচিত্র ও ভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান। যেমন 'মুশকিল আসান', 'কিছু কথা কিছু গান', 'মনের মত গান, মনে রাখা কথা' ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং শ্রোতাদের কাছ থেকে এর প্রতিটি অনুষ্ঠানেই আশাতীত সাড়া পাওয়ায় আমাদেরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর সাহস ও উৎসাহ বেড়ে যাওয়ায় আমরা সব সময়ই খুঁজে যাচ্ছি নতুন, আরো নতুন কোনো অনুষ্ঠান সূচীর কথা।

এই অনুষ্ঠানগুলির কোনোটাই কিন্তু সরাসরি বেতার কেন্দ্র থেকে তৈরি হয় না। এবং তাদের নির্ধারিত কলাকুশলী বা শিল্পীরাও তাতে অংশ নেন না। পুরোটাই তৈরি হয় বেতার কেন্দ্রের বাইরে। তৈরি করেন বিভিন্ন প্রযোজক।

যে ব্যবসায়িক সংস্থা বেতারে তাঁদের পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করতে চান, তাঁরা যে-কোনো প্রযোজকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কী ধরনের অনুষ্ঠান করতে চান, যাকে বলা হয় ফরম্যাট, সেটা ঠিক করার পর অনুষ্ঠানটি তৈরি করার পুরো দায়িত্ব থাকে সেই প্রযোজকের ওপর।

এইভাবেই সম্পূর্ণ বাইরে থেকে তৈরি অনুষ্ঠান রেকর্ড করে পাঠানো হয় বেতার কেন্দ্রে। সেখানে ভারপ্রাপ্ত অফিসার পরীক্ষা করে দেখেন প্রোগ্রামে আপত্তিকর বা নিয়ম বহির্ভূত কিছু আছে কিনা। থাকলে সেটা যথা সময়ে জানিয়ে দেন প্রযোজককে বা নিজেরাই কেটে দিয়ে প্রচারের জন্য ছাড়পত্র দেন এবং সেই অনুষ্ঠানই আপনারা শুনতে পান বেতার থেকে।

আজ বিভিন্ন প্রচার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে যাঁরা বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান তৈরি করছেন তাঁদের ভেতর আছেন সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাট্য জগতের প্রথম সারির একাধিক শিল্পী, গায়ক ও লেখক।

বিবিধ ভারতী আজ তাই শুধু প্রচার সূত্রই নয়, উপভোগ্য শিল্পও।

শ্রাবন্তী মজুমদার



কুরুশে বোনার পদ্ধতি

আজকাল কুরুশে বোনার খুব প্রচলন হয়েছে। কুরুশে বোনার পদ্ধতি সম্বন্ধে সুকন্যায় আগেও আলোচনা করা হয়েছে। তবে পাঠিকাদের মধ্যে হয়তো কেউ কেউ সেই সংখ্যা সংগ্রহ করতে পারেননি। তাই অনেকের অনুরোধে আবার নতুন করে এ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হল।

চেন : কুরুশে বোনার প্রথম কথা হল চেন। এটিই প্রারম্ভিক স্টিচ। একে বনিয়াদও বলা যায়। এর জন্য প্রথমে কুরুশের মুখের সাহায্যে একটি ফাঁস তৈরি করে আরম্ভ করে তারপর কুরুশে সুতো জড়িয়ে ঐ ফাঁসের ভেতর দিয়ে টেনে বার করে নিতে হয়।

ডবল ক্রোশে : কোনো স্টিচের (ঘরের) ভেতর কুরুশ ঢুকিয়ে তারপর কুরুশে সুতো জড়িয়ে ঐ ঘরের ভেতর দিয়ে ফাঁস টেনে নিতে হয়। এরপর আবার কুরুশে সুতো জড়িয়ে ঐ দুটি ফাঁসের ভেতর দিয়ে একটি ফাঁস টেনে নিতে হয়।

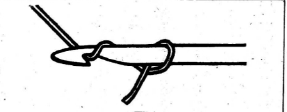
ট্রেবল : কুরুশে সুতো জড়িয়ে নিয়ে কোনো স্টিচের ভেতর ঢোকান। তারপর আবার কুরুশে সুতো জড়িয়ে ঐ স্টিচের ভেতর দিয়ে একটি ফাঁস টেনে নিন। এখন কুরুশে তিনটি ফাঁস থাকল। কুরুশে সুতো জড়িয়ে প্রথম দুটি ফাঁসের ভেতর দিয়ে একটি ফাঁস টেনে নিন। আবার কুরুশে সুতো জড়িয়ে নিন। এখন কুরুশে যে দুটি ফাঁস থাকল তাদের মধ্যে দিয়ে একটি ফাঁস টেনে নিন।

ডবল ট্রেবল : কুরুশে দুবার সুতো জড়িয়ে নিয়ে কুরুশকে স্টিচের ভেতর ঢোকান। এবারে কুরুশে সুতো জড়িয়ে একটি ফাঁস ঐ ঘরের ভেতর দিয়ে শুধুমাত্র টেনে নিন। এতে কুরুশে চারটি ফাঁস থাকল। এরপর কুরুশে সুতো জড়িয়ে প্রথমে দুটি ফাঁসের ভেতর দিয়ে একটি ফাঁস টেনে নিন। আবার সুতো জড়িয়ে কুরুশে যে তিনটি ফাঁস থাকল তার মধ্যে প্রথম দুটি ফাঁসের মধ্যে দিয়ে একটি ফাঁস টেনে নিন। আবার কুরুশে সুতো জড়িয়ে শেষ দুটি ফাঁসের ভেতর দিয়ে একটি ফাঁস টেনে নিন।

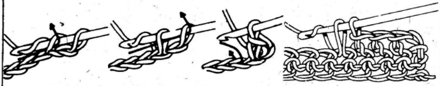
হাফ ট্রেবল : কুরুশে সুতো জড়ান। কোনো স্টিচের ভেতর কুরুশ ঢোকান। এবারে কুরুশে সুতো জড়িয়ে ঐ স্টিচের ভেতর দিয়ে একটি ফাঁস টেনে নিন। কুরুশে সুতো জড়িয়ে এবার একসঙ্গে কুরুশের তিনটি ফাঁসের ভেতর দিয়েই একটি ফাঁস টেনে নিন।

স্লিপ স্টিচ : কুরুশ স্টিচের ভেতর ঢোকান। তারপর সুতো জড়িয়ে নিয়ে ঐ ঘরের এবং কুরুশের ফাঁসটির মধ্যে দিয়ে একসঙ্গে একটি ফাঁস টেনে নিন।

এ তো গেল স্টিচগুলি সম্বন্ধে আলোচনা। আসলে এখন তো সব কিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে – তাই এই স্টিচগুলি বা বোনার পদ্ধতির নামগুলিরও পরিবর্তন হচ্ছে। এর আগে সাধারণত আমরা যাকে 'লঙ বলে জানতাম তাকেই এখন 'ট্রেবল' বলা হচ্ছে। আগে আমরা যাকে 'হাফ লঙ' বলে জানতাম এখন তাকেই 'ডবল ক্রোশে' বলা হচ্ছে। সেইজনাই হয়তো অনেকের বুঝতে অসুবিধা হয়।



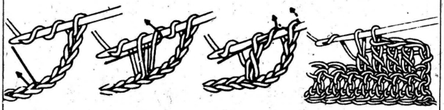
চেন।



ডবল ক্রোশে



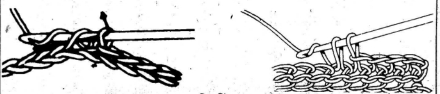
ট্রেবল



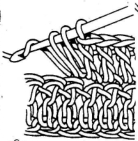
ডবল ট্রেবল



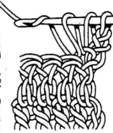
হাফ ট্রেবল



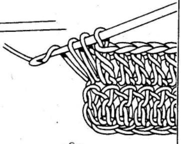
স্লিপ স্টিচ



ছবি ১

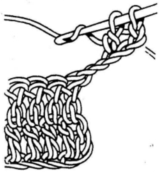


ছবি ২

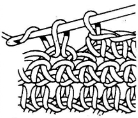


ছবি ৩

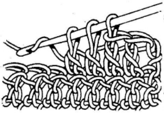
যাই হোক এবারে বোনার মধ্যে প্রয়োজনীয় আরও কতকগুলি বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে। এগুলি অবশ্য আগে করা হয়নি। তার মধ্যে একটি হল ঘর বাড়ানো। এর মধ্যেও আবার ধরুন বুনতে বুনতে অর্থাৎ কোনো একটি লাইনেই ঘর বাড়াতে হল। তার জন্য কখনও একই ঘরের মধ্যে দুবার বুনে নিতে হয়। যেমন ১নং ছবিতে দেখানো হয়েছে। আবার কখনও বোনার প্রথমেই এক ঘর বাড়াতে হয়। তখন ঘুরিয়ে নিয়ে পরের লাইন শুরু করার সময় সাধারণত প্রথম ঘরটি ছেড়ে দেওয়া



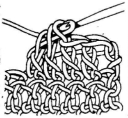
ছবি ৪



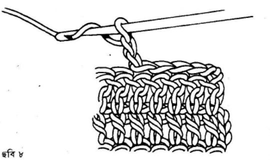
ছবি ৫



ছবি ৬



ছবি ৭



ছবি ৮

হয় (অবশ্যই প্রয়োজনমত চেন বুনে নিয়ে) এখন তা না করে ঐ প্রথম ঘরেই বুনতে হবে। যেমন ২নং ছবিতে দেখানো হয়েছে। আবার লাইনের শেষে যদি বাড়াতে হয় তখন আগের লাইনের ঘোরানোর সময় বোনা চেনের মধ্যে একবার না বুনে দুবার বুনতে হয়। ৩নং ছবি দেখুন। এ ছাড়াও আছে বোনার প্রথমে অনেকগুলি ঘর বাড়ানো। তখন একসঙ্গে অনেকগুলি চেন বুনে নিয়ে তার ওপর দিয়ে বোনা আরম্ভ করতে হয়(ছবি ৪)।

তারপরের ব্যাপার হল কমানো। এরজন্য যদি ডবল ক্রোশের লাইন হয় তাহলে আগের লাইনের একটি ঘর বাদ দিয়ে বুনে যেতে পারেন (ছবি ৫)। যদি ট্রেবলের লাইন হয় তবে পরপর দুটি ঘরকে অসম্পূর্ণ রেখে কুরুশের তিনটি ফাঁসের ভেতর দিয়ে একবারই ফাঁস টেনে নিলে একটি ঘর কমে যাবে (ছবি ৬ ও ৭)।

আবার যদি লাইনের প্রথমেই অনেকগুলি ঘর কমাতে হয়, তাহলে যতগুলি ঘর কমাতে হবে তার ওপর দিয়ে শুধু স্লিপ স্টিচ বুনে যেতে হয় (ছবি ৮)। যদি লাইনের শেষের দিকে অনেকগুলি ঘর একসঙ্গে কমাতে হয় তবে যতগুলি ঘর কমানো হবে ততগুলিকে না বুনে ছেড়ে দিয়ে ঐখান থেকেই আবার ঘুরিয়ে নিতে হয় পরের লাইনের জন্য। এরকম বাড়ানো-কমানো প্রয়োজন হয় তখনই — যখন আপনি একসঙ্গে গায়ের খন্ডের সঙ্গে হাতও বুনে ফেলতে চান বা বগলের জন্য ঘর কমাতে চান। এইসব ক্ষেত্রে এগুলি বিশেষ কাজে লাগে।

পুতুল খান্না



রেখা দাশগুপ্ত

কলকাতার বাঙালি প্রতিষ্ঠান হিসেবে যে কয়েকটি নাম আজও টিকে আছে 'ক্যালকাটা কেমিক্যালস' তাদের একটি। এই 'ক্যালকাটা কেমিক্যালস'-এর একজন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর রেখা দাশগুপ্ত।

বাবা সুশীল সেন ছিলেন ভারত সরকারের সলিসিটার জেনারেল। ভবানীপুরের বাড়িতে তাই ছোটবেলা থেকেই ব্রিটিশ আবহাওয়ায় বড় হয়েছেন। পিতৃকুলে তিন পুরুষ ধরেই আইনের ব্যবসা – ঠাকুরদা ছিলেন অ্যাটর্নি, দুই দাদার একজন ব্যারিস্টার, একজন অ্যাটর্নি।

গোখলে মেমোরিয়ালে স্কুলের পাঠ শেষ করে আশুতোষ কলেজ থেকে স্নাতকের ডিগ্রি পান রেখা দাশগুপ্ত। যদিও বি এ পরীক্ষা দেওয়ার দু'মাস আগে মাত্র উনিশ বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়।

শ্বশুর খগেন্দ্র দাশগুপ্ত স্বদেশী করতেন, বহুবার জেলে গেছেন। এমনকি নিজের বিয়ের দিনও তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যাপনার কাজ করতে করতে বিদেশ পাড়ি দেন। তিনি অপরের সাহায্য নেবেন না আবার নিজের কাছেও অত টাকা নেই, তাই জাহাজের কেবিন বয় হয়েই বিদেশ পৌঁছে যান। ওখানে পড়াশুনা এবং কিছুকাল ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেন। দেশে ফিরে এসে তাঁর স্বদেশচেতনাই 'ক্যালকাটা কেমিক্যালস' গড়ে তোলার প্রেরণা যোগায়।

নিজের কথা বলতে গিয়ে রেখা বললেন, 'অল্প বয়সে বউ হয়ে এলেও আমার শ্বশুরমশাই তখন থেকেই আমাকে প্রায়ই অফিসে নিয়ে যেতেন। আমার নিজের খুব আগ্রহ ছিল সুগন্ধির ব্যাপারে। তাই শ্বশুরমশাই আমাকে নিয়ে গেলেন মিঃ আর এন মৈত্রর কাছে। ওঁর কাছে আমি পারফিউমারি ব্লেনডিং শিখতে লাগলাম। তারপর সংসারের কাজে এবং ছেলেমেয়েদের মানুষ করা নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে কিছুদিন আমি নেপথ্যেই ছিলাম। অবশ্য নানা ব্যাপার নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতাম এবং মতামতও দিতাম। ১৯৭৪-এ আমি কোম্পানির বোর্ড মেম্বার হয়ে জয়েন করি। তখন আমি দেখাশোনা করতাম পাবলিসিটি অ্যান্ড অ্যাডভাটাইজমেন্ট এবং প্রোডাক্ট ডেভলপ-মেন্ট। ১৯৭৮-এ আমি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হই। সেইসময় থেকেই আমাকে নিয়ে একটু গোলমাল বাধে। আমাদের কোম্পানির একজন ডিরেক্টর চাননি কোনো মহিলা কোম্পানিতে থাকুন। সুতরাং তিনি সর্বদাই চেষ্টা করতে লাগলেন কী করে আমাকে সরানো যায়। এর ফলে ধীরে ধীরে ম্যানেজমেন্টের গন্ডগোল আরম্ভ হয়। কোনো কোম্পানির ম্যানেজমেন্টে গন্ডগোল বাধলে তা অন্য সকলকে ধাক্কা দেবেই। তখন থেকেই শুরু হল কর্মী অসন্তোষ এবং আরো নানা ঝামেলা। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৭৯ সালে আমার স্বামী মারা যান। যার ফলে আমার দায়িত্ব আরো বেড়ে যায়। কোম্পানির অসন্তোষ বাড়তে বাড়তে অবশেষে লক আউট হয়। সেই সময় সাত-আট মাস কোম্পানি বন্ধ থাকে। তার ফলে যে ক্ষতি হয় সেটা সত্যিই অপূরণীয়। এখন যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা – তা হলো ফিন্যানস। নতুন মেশিনারি, আধুনিক সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি নানা কাজে এখন ফিন্যানস দরকার অথচ কোম্পানির তা নেই। আমি দিনরাত ভেবে চললাম কী করে কোম্পানিকে বাঁচানো যায়। কোনোভাবেই একে নষ্ট হতে বা বন্ধ হতে দেওয়া যায় না। এতগুলো লোকের ভাগ্যও যখন এর সঙ্গে জড়িত। শুধু ব্যবসা নয় এর সঙ্গে আমার ইমোশন, সেন্টিমেন্ট এমনভাবে মিশে আছে যে, যে-কোনো উপায়ে একে বাঁচিয়ে তোলার চিন্তা আমাকে পেয়ে বসল। আমি ভাল করে ভেবে দেখলাম যদি কোনো বড় কোম্পানির সঙ্গে টাগ করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কোম্পানিটা অন্তত বেঁচে যায়।

যাই হোক সব দিক বিবেচনা করে 'শ ওয়ালেস'-এর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলাম। প্রথম দিকে ওঁরাও যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেন। তখন অবশ্য আমাদের কোম্পানির ডিস্ট্রিবিউটর আপত্তি তোলেন এবং এ নিয়ে কোর্ট-কাছারিও করতে হয়। এত কান্ড করেও কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কোম্পানির কোনো উপকারই হয়নি। 'শ ওয়ালেস' কাগজে কলমে টেক ওভার করলেও এখনো পর্যন্ত একটা পয়সাও আমরা ওঁদের থেকে পাইনি। কোম্পানিতে ওঁদের দুজন বোর্ড মেম্বার আছেন, তাছাড়া বেশিরভাগই ওঁদের নমিনি। কিন্তু দেখাশোনা করার বা ম্যানেজমেন্টকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো লোক নেই। সমস্ত কাজগুলোকে প্ল্যান করা এবং সেইমতন কাজকে এগিয়ে দেওয়া এসবই খুব জরুরি। এগুলো কোনোটাই ঠিকমতন হচ্ছে না। আর সব চেয়ে দুঃখের ব্যাপার 'শ ওয়ালেস' আমার সঙ্গে কোনোরকম কথাবার্তা ও আলোচনা করছেন না। প্ল্যানিং, ফিন্যানস বা অন্য যেসব সমস্যা আছে সেগুলো নিয়ে কথা বলা দরকার অথচ কিছুই হচ্ছে না। আর এখন তো দেখতেই পাচ্ছেন 'শ ওয়ালেস'-এর কী অবস্থা, ওদের নিজেদের গোলমাল না মিটলে ওরা আমাদের জন্য কী করবে। কিন্তু সেটাও তো আমাকে স্পষ্ট করে জানানো দরকার। আমি একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। জানি না কোম্পানির ভবিষ্যৎ কী!

নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে বললে রেখা দাশগুপ্ত জানালেন, 'আগে তো সকাল দশটায় অফিসে যেতাম, দুপুরে একবার লাঞ্চ খেতে আসা, তারপর আবার পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অফিস। এখন অবশ্য লাঞ্চের পর আর অফিস যাই না। কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে একটা সংস্থা করেছি, সেটার কিছু কাজকর্ম করি। কিছু দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো বা তাদের জন্য কিছু করা – কাজগুলো সামান্য হলেও এতে আনন্দ আছে।'

স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে বিশাল বাড়িতে একদম একাই থাকেন রেখা দাশগুপ্ত। পৃথিবী থেকে কাউকে আগে কাউকে পরে যেতে হবে – এই সত্যটিকে মেনে নিয়ে স্বামীর মৃত্যুর পর ভেঙে পড়েননি।

অবসর সময় কী করে কাটান?

'আমার গার্ডেনিং-এর খুব শখ। ছাদের ওপর গাছপালা লাগিয়ে রুফ গার্ডেনিং করি। এছাড়া বইপত্র পড়ে কিছু বনসাই করেছি, এখনও করছি। আরেকটা জিনিসের শখ আমার আছে – সেটা ইন্টিরিয়ার ডেকরেশন। নানাভাবে ঘর সাজাতে আমার ভাল লাগে।' রেখা দাশগুপ্তর বাড়িঘর দেখে ওঁকে ভাল ইন্টিরিয়ার ডেকরেটরের আখ্যা দেওয়া যায়।

এত বড় একটা কোম্পানিকে স্নেহ, মমতা, ভালবাসা দিয়ে এতদিন ধরে রেখেছেন যিনি সেই রেখা দাশগুপ্ত আজ বাঙালির সামগ্রিক চেহারাটায় খানিকটা হতাশা দেখলেও কঠোর পরিশ্রমের যে কোনো বিকল্প নেই এই কথাটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। তাঁর এই বিশ্বাস সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক এই কামনা করেন।

ঝুমুর কুশারী

ছবি : অভিজিৎ রায়

সংক্ষিপ্ত পাক্ষিক রাশি ও লগ্নফল

১ – ১৫ জুলাই ১৯৮৫



মেষ।। পারিবারিক অশান্তি ও আর্থিক টানাটানি চলবে। শারীরিক শুভাশুভ মিশ্রফল আশা করা যায়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা ও সুনামহানির যোগ। অশ্বিনী নক্ষত্রাস্থিত মেষ রাশির অশান্তি চরমে উঠবে। ভরণী নক্ষত্রে জন্ম হলে অশান্তি ও দুঃখ, কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হলে কিছু শুভফল আশা করা যায়। মেষরাশির পক্ষে শুভ, সোমবার, সংখ্যা ৮, বর্ণ – সবুজ, গ্রহরত্ন – পান্না, গ্রহ মূল – অনন্ত, ধাতু – সোনা। মেষলগ্নের জাতিকার দুর্বলতাবৃদ্ধি, স্ত্রীরোগ সম্পর্কে সাবধান।



বৃষ।। স্বজনবিরোধ ও পারিবারিক অশান্তির যোগ। আর্থিক ফল শুভাশুভ মিশ্রিত। কর্মক্ষেত্রে আধিপত্য অক্ষুন্ন থাকবে। তবে শরীর সম্পর্কে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। রক্তচাপ বৃদ্ধি, পেট ও চোখের রোগে কষ্ট পাবার যোগ আছে। সচেষ্ট হলে অর্থ ও সুনাম দুই-ই বৃদ্ধি পাবে। বৃষ রাশির পক্ষে শুভ, রবিবার, সংখ্যা-৮, বর্ণ – সাদা, গ্রহরত্ন – রক্তপ্রবাল, গ্রহমূল – অনন্ত, ধাতু– ইস্পাত। বৃষলগ্নের জাতিকার আপনজন ও বান্ধবসহ সুখেই কাটবে এ পক্ষ।



মিথুন।। নিজের স্বভাবের গুণে পারিবারিক অশান্তি আয়ত্তে আসবে। কোনো গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। কোনো সৎ-ব্যক্তির সুপরামর্শ কাজে লাগতে পারে। হঠাৎ কিছু প্রাপ্তিযোগ। ভ্রমণের যোগাযোগ ফলপ্রসূ হতে পারে। মিথুন রাশির পক্ষে শুভ, মঙ্গলবার, সংখ্যা-৭, বর্ণ-ধূমল, গ্রহরত্ন – রক্তপ্রবাল, গ্রহমূল বিষতারক, ধাতু –সোনা। মিথুনলগ্নের জাতিকার শারীরিক অশুভ, গৃহশত্রু থেকে সাবধান।



কর্কট।। পারিবারিক, আর্থিক ও শারীরিক সব ক্ষেত্রে শুভাশুভ মিশ্র ফলপ্রদ। কর্ম ও ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ কাজে লাগাতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। ভ্রমণ যোগ আছে। নিকট আত্মীয় থেকে সাবধান। অন্যের পরামর্শে ক্ষতি হতে পারে। কর্কট রাশির পক্ষে শুভ, শনিবার, সংখ্যা – ১, বর্ণ – নীল, গ্রহরত্ন – মুক্তা, গ্রহমূল – ব্রহ্মযষ্টি, ধাতু– সোনা। কর্কট লগ্নের জাতিকার কোনো পুরনো রোগে দুর্ভোগ হতে পারে।



সিংহ।। পরিবার পরিজন সহ এ পক্ষটা মোটামুটি সুখেই কাটবে। পুরনো রোগে কষ্টভোগ। সচেষ্ট হলে সম্পত্তি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে। ভোগস্পৃহা বৃদ্ধি। সচেষ্ট হলে বিয়ের যোগাযোগ ফলপ্রসূ হবে। সিংহ রাশি পক্ষে শুভ শুক্রবার, সংখ্যা – ৩, বর্ণ – লাল, গ্রহরত্ন – মুক্তা, গ্রহমূল – বিল্ব, ধাতু – ইস্পাত। সিংহ লগ্নের জাতিকার স্বামী, সন্তানের জন্যে অর্থ ব্যয়।



কন্যা।। গৃহশত্রুতা চললেও বিশেষ ক্ষতি হবে না। কাজের চাপ ও মানসিক চিন্তাবৃদ্ধি। মাথা ও দাঁতের রোগ হতে পারে। শারীরিক ও মানসিক আঘাতপ্রাপ্তি। অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে সাবধান। ভোগস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে। বিয়ের যোগাযোগ আসতে পারে। কর্ম ও ব্যবসায় সুনাম ও শত্রুতা একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে। কন্যা রাশির পক্ষে শুভ, বুধবার, সংখ্যা-৬, বর্ণ-সাদা, গ্রহরত্ন-পীত পোখরাজ, গ্রহমূল – অনন্ত, ধাতু – সোনা। কন্যা লগ্নের জাতিকার মানসিক কষ্টের যোগ আছে।



তুলা।। এ পক্ষ সর্বক্ষেত্রেই মিশ্রফলের ইঙ্গিতের সূচক। মানসিক অশান্তি চলবে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা বৃদ্ধি উন্নতির পথে বাধার কারণ হতে পারে। ভোগস্পৃহা বৃদ্ধি। অবৈধ প্রেমের যোগ আছে। নিজের ভুলে শত্রুতা বৃদ্ধির যোগ। হঠাৎ প্রাপ্তি যোগ। তুলা রাশির পক্ষে শুভ – রবিবার, সংখ্যা ৯, বর্ণ সাদা, গ্রহরত্ন – বৈদুর্যমণি, গ্রহমূল – বিল্ব, ধাতু রূপা। তুলা লগ্নের জাতিকার পক্ষে অন্যকে কথা দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার বিষয় সাবধান। দায়-দায়িত্ববৃদ্ধি ও পারিবারিক জীবন আনন্দ পূর্ণ হতে পারে।



বৃশ্চিক।। অহেতুক পারিবারিক অশান্তি ও মনোমালিন্যে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। পুরনো রোগে কষ্ট ভোগ। স্বার্থান্বেষী বন্ধু থেকে সাবধান। কথার খেলাপ করে অপ্রিয় হতে পারেন। কোনো সত্যিকার শুভাকাঙ্খীকে ভুল বুঝে মানসিক আঘাত দেওয়ার বিষয় সাবধান। আর্থিক চিন্তায় বিব্রত হতে পারেন। বৃশ্চিক রাশির পক্ষে শুভ শনিবার, সংখ্যা-৪, বর্ণ হলুদ, গ্রহরত্ন – নীলা, গ্রহমূল – ক্ষীরিকা, ধাতু –সোনা। বৃশ্চিক লগ্নের জাতিকার অন্যের সাহায্য লাভ। ধৈর্য হারা হলে ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল।



ধনু।। পারিবারিক শান্তি অক্ষুন্ন থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানসিক অশান্তিবৃদ্ধি পেতে পারে। আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা এপক্ষে সম্ভব হবে না। মূলা নক্ষত্রে জন্ম হলে পরিবারের কারোর জন্যে চিন্তাবৃদ্ধির যোগ প্রবল। বহু প্রত্যাশিত যোগাযোগ নষ্ট হতে পারে। পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হলে সম্মান, অর্থ ও কর্মক্ষেত্রে বড় কোনো যোগাযোগ আসবে। ধনুরাশির পক্ষে শুভ, – মঙ্গলবার, সংখ্যা-৭, বর্ণ গাঢ়নীল, গ্রহরত্ন রক্তপ্রবাল, গ্রহমূল – শ্বেতচন্দন, ধাতু লোহা। ধনুলগ্নের জাতিকার শারীরিক ও আর্থিক চিন্তা থাকবে। নতুন ব্যবসা ও বিয়ের ব্যাপারে এ পক্ষ মোটেই শুভ নয়।



মকর।। প্রিয়-পরিজনসহ এ পক্ষটা মোটামুটি সুখেই কাটাতে পারেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজের ভুলে অশান্তি ও বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হবে। কর্ম ও ব্যবসায় উভয়ক্ষেত্রে সুনাম ও শত্রুতা একই সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে পারে। কোনোপ্রকৃত বন্ধু ও শুভাকাঙ্খীর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা আপনার চলার পথের অন্তরায় হবে। মকর রাশির পক্ষে শুভ, শনিবার, সংখ্যা-২, বর্ণ – খয়েরি, গ্রহরত্ন – গোমেদ, গ্রহমূল – ক্ষীরিকা, ধাতু-সোনা। মকর লগ্নের জাতিকা তার নিজের গুনে সমস্যা থেকে অব্যাহতি পাবেন। হঠাৎ বাক বিতন্ডা থেকে সাবধান।



কুম্ভ।। পারিবারিক ঝামেলা চলবে। কোনো নিকট আত্মীয়কে ভুল বুঝে ক্ষতি হতে পারে। স্বার্থান্বেষী থেকে সাবধান না হলে সুনাম ও অর্থ দুই ক্ষতি হতে পারে। মাথা ও চোখের রোগে কষ্টভোগ। সাবধানতা অবলম্বন না করলে মানসিক আঘাত পেতে পারেন। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জন্ম হলে সম্মানবৃদ্ধির যোগ আছে। কুম্ভ রাশির পক্ষে শুভ শুক্রবার, সংখ্যা-২, বর্ণ ঘৃতাভ, গ্রহরত্ন – চুনী, গ্রহমূল –বিল্ব, ধাতু সোনা। কুম্ভ লগ্নের জাতিকারা কোনো আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। নিঃসংগতা কেটে যাবে। ভ্রমণের যোগাযোগ এপক্ষে ফলপ্রসূ হতে পারে।



মীন।। পারিবারিক জীবন শান্তিপূর্ণ, তবে কোনো আত্মীয়ের জন্য সাময়িক অশান্তি। কোন স্বনামখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে লাভবান হতে পারেন। সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক না হলে অপমানিত হতে পারেন। সন্তানের আগুন থেকে সাবধান থাকা বাঞ্ছনীয়। মীন রাশির পক্ষে শুভ, সোমবার, সংখ্যা-৫, বর্ণ-সবুজ, গ্রহরত্ন – পীত পোখরাজ, গ্রহমূল – অনন্ত, ধাতু – ইস্পাত। মীন লগ্নের জাতিকার শুভ আর্থিক পরিবর্তন হতে পারে। কোষ্ঠিতে শুভযোগ থাকলে আর্থিক ক্ষেত্রে বিশেষ শুভফল প্রত্যাশা করতে পারেন।

শ্রীগৌতম ভক্তিসিদ্ধান্ত ভারতী

মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন ঃ ২৪-০১৯৯), থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, রেজিঃ অফিস, ৩৩ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ঃ ২৭-২১৬৯, ২৭-৯২৯২, ২৭-৯৩১১, ২৬-১৬৮০, ২৬-১৬৮১. Telex 021-5092 IPPL IN

মধুর আলো… মধুর রজনী…

আমরা দু'জনে
নিভৃত কুজনে!



এমন বিশেষ রাতে কোন বিশেষ খাবারটা দিই পাতে?

এমন বিশেষ দিনে বিশেষ খাবারটাই তো বানিয়ে দিতে হবে বিশেষ প্রিয়জনে।

তারজন্যে ভাবনা কি আর, রয়েছে বিজয়া ডেয়ারি'র রকমারি সম্ভার···মাখন, ঘি, চীজ় আর মিল্ক পাউডার। সবই রান্না খাবার এর ভুরভুরে গন্ধে হয়ে ওঠে বিশেষ আহার।

জলখাবার হোক বা পঞ্চ-ব্যঞ্জনের রান্নাই বলুন…
বিজয়া'র দৌলতে খেতে হয় দারুণ!
সবসময়ে বিজয়া রাখুন ঘরে, বলতে তো পারেন না কখন দরকার পড়ে!

অন্ধ্র প্রদেশ ডেয়ারি ডেভেলপমেণ্ট
কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিমিটেড
লালাপেঠ, হায়দ্রাবাদ ৫০০০১৭।





বিজয়া – যা না থাকলে পরে কি বানাতাম ঘরে!

APDDC/37/85/Ben/a

SUKANYA 1 JULY 1985 Regn. No. 42166/84/RNI Postal Regn. No. WB/CC-423 Rs. 3.50

